সম্মোহনের A to Z

প্রবীর ঘোষ

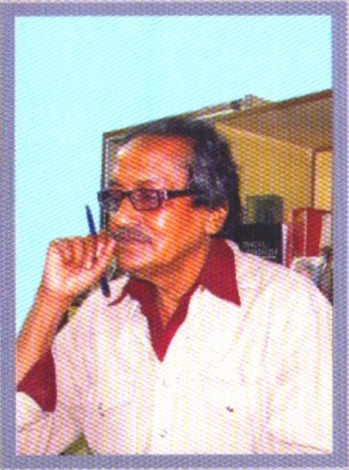

প্রবীর ঘোষ—একটি নাম, একটি আন্দোলন; এক জীবন্ত কিংবদন্তি। 'সমকালীন যুক্তিবাদ' দর্শনের স্রষ্টা এবং উপমহাদেশে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর নেতৃত্বে 'যুক্তিবাদী-চিন্তা' আজ ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে সংগঠিত আন্দোলনে রূপ নিয়েছে; আন্দোলিত হয়েছেন-যুক্তিমনস্কতার দিকে এগিয়ে গেছেন এপার বাংলা-ওপার বাংলার লক্ষ-লক্ষ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্যক্লাব, বিজ্ঞানক্লাবসহ বহু সংগঠন। প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, অলৌকিকতার কারিগরদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াই, সাম্যের সমাজ সৃষ্টির আন্দোলনে জনগণকে শামিল করার দক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও মনীষাপূর্ণ সহজবোধ্য ভাষার বলিষ্ঠ লেখনী, চ্যালেঞ্জ, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও নিরবচ্ছিন্ন জয়—এসবই তাঁকে করেছে 'হি-ম্যান' এবং যুক্তিবাদীদের করেছে আরো আত্মবিশ্বাসী, নিবেদিতপ্রাণ, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পথিক।

প্রবীর ঘোষের গভীর পাণ্ডিত্য ও মনীষা কখনই সাধারণ পাঠকদের কাছে বাধার পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায় নি। বরং বলা যায়, সহজবোধ্যতাই তাঁকে জনপ্রিয়তম ও বিশিষ্ট গল্পকার-প্রাবন্ধিক করেছে। তাঁর লেখায় বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির কথা সাবলীলভাবে এসে পড়ে। ভিন্ন চোখে দেখায়। আলাদা করে চিনিয়ে দেয় প্রবীর ঘোষকে।

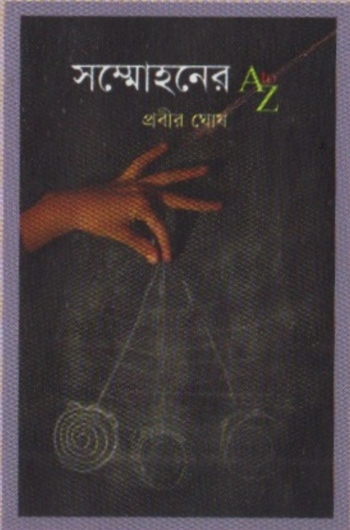

'সম্মোহন' নামেই রয়েছে রহস্যময়তা। গ্রন্থটিতে রয়েছে সম্মোহন নিয়ে উঠে আসা নানা প্রশ্ন—সম্মোহনের সাহায্যে মানুষ থেকে পশু সবাইকে কি বশ করা যায়? ট্রেন ভ্যানিশ কি গণসম্মোহনের সাহায্যে হয়েছিল? সম্মোহন করে সত্যি বলানো যায়? পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়া যায়? সম্মোহনের বিজ্ঞান হয়ে ওঠার ইতিহাস। রোগের রকমফের। পরীক্ষার সময় স্মৃতি হারানো ও স্মৃতি ফেরাবার বহু কেস-হিস্ট্রি। ফোবিয়া, উৎকণ্ঠা, হতাশা, বাতিক নানা রোগ ও নিরাময়ের উপায়। মনোবিদ ও মনোরোগ চিকিৎসকদের বিভিন্ন থেরাপি ও বিচিত্র সব কেস-হিস্ট্রি। বাড়তি স্নায়ুচাপ হটাতে সেরা পদ্ধতি রিল্যাকসেশান। নানা বিচিত্র যৌন-সমস্যা এবং উত্তরণের উপায়। বিভিন্ন মনোরোগে সম্মোহনের পর সাজেশন দেবার পদ্ধতি। এই গ্রন্থে আছে উচ্চ রক্তচাপ-হাঁপানি-তোতলামিসহ বহু রোগের আরোগ্য পদ্ধতি। গ্রন্থটি আপনার জীবনকে সুন্দর করে তুলবে।

সম্মোহনের A to Z

প্রবীর ঘোষ

অবসর

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
আবু তৈয়ব আজাদ রানা

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8796-13-9

Sammhoner A to Z (The A to Z of Hypnotism) by Prabir Gosh
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Edition : February 2012. Price : Taka 225.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

উৎসর্গ

প্রবীর নাগ
মধুসূদন মাহাত
অনিমা চক্রবর্তী

সূচিপত্র

পর্ব : এক
উঠে আসা নানা প্রশ্ন [১১ - ৫২]

অধ্যায় : এক
সম্মোহন ১৩

অধ্যায় : দুই
জন্তুদের সম্মোহন করা ব্যাপারটা কী? ১৬

অধ্যায় : তিন
ফোটা-সম্মোহন কি সম্ভব? ১৮

অধ্যায় : চার
গণ-সম্মোহনের সাহায্যে কি ট্রেন ভ্যানিশ করা যায়? ২৩

অধ্যায় : পাঁচ
সম্মোহন করে পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়া যায়? ২৮

অধ্যায় : ছয়
জন্মান্তর ও সম্মোহন ৩১

অধ্যায় : সাত
সম্মোহন ও নার্কো টেস্ট ৩৫

অধ্যায় : আট
সম্মোহন করে কথা বলানো যায়? ৩৯

অধ্যায় : নয়
প্ল্যানচেটে যে আত্মা আনা হয়, তা কি স্বসম্মোহন
বা সম্মোহনের প্রতিক্রিয়া? ৪৯

পর্ব : দুই
সম্মোহনের ইতিহাস ও নানা মানসিক রোগ [৫৩ - ১০৬]

অধ্যায় : এক
সম্মোহনের বিজ্ঞান হয়ে ওঠার ইতিহাস ৫৫

অধ্যায় : দুই
মনোরোগ, সম্মোহন জানতে মগজের কাজ জানা জরুরি ৭০

অধ্যায় : তিন
মানসিক রোগের রকমফের ৭৯

অধ্যায় : চার
Hysterical neurosis-Conversion type ৯৩

অধ্যায় : পাঁচ
সাইকোসিস (Psychosis) উন্মাদ ৯৭

অধ্যায় : ছয়
দেহ্‌-মনজনিত অসুখ (Psycho-somatic disorder) ১০০

পর্ব : তিন
মনোবিদ ও মনোরোগ চিকিৎসকদের বিভিন্ন থেরাপি [১০৭ – ১৪২]

অধ্যায় : এক
মনোবিদ (Psychologist) ও মনোরোগ চিকিৎসক (Psychiatrist) ১০৯

অধ্যায় : দুই
প্রধান কয়েকটি সাইকোথেরাপি নিয়ে আলোচনায় যাব ১১৬

অধ্যায় : তিন
টেনশন ১১৯

অধ্যায় : চার
রিল্যাকসেশান পদ্ধতি ১২৫

অধ্যায় : পাঁচ
যৌনতা এবং যৌন-সমস্যা ১২৯

অধ্যায় : ছয়
'যোগ' মস্তিষ্ক-চর্চা বিরোধী এক স্থবির তত্ত্ব ১৩৮

পর্ব : চার
বিভিন্ন রোগের সম্মোহনের সাজেশন পদ্ধতি [১৪৩ – ১৫৯]

অধ্যায় : এক
সম্মোহন চিকিৎসা এবং... ১৪৫

অধ্যায় : দুই
রোগীকে সাজেশন দেওয়ার পদ্ধতি ১৪৯

অধ্যায় : তিন
রকমারি রোগ, রকমারি সাজেশন ১৫১

অধ্যায় : চার
প্রাচীন আমল থেকেই মানসিক রোগ মানেই অশুভ শক্তির কালো হাত ১৫৮

সম্মোহনের A to Z

পর্ব : এক

উঠে আসা নানা প্রশ্ন

অধ্যায় : এক

সম্মোহন

জাদুকরেরা মঞ্চে যে সম্মোহন দেখান, তা কতটা সত্যি?

জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশনী সংস্থা 'মিত্র ঘোষ'–এ। এক সময়ে এলো সম্মোহনের প্রসঙ্গ। প্রকাশনী সংস্থার অন্যতম মালিক প্রবীণ বিখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রনাথ মিত্র সম্মোহন নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখতে গেছি নিউ এম্পায়ারে। মানে এখনকার পি. সি. সরকারের বাবা আর কী। ছ'টায় শো শুরু হওয়ার কথা। ছ'টা দশ, ছ'টা পনের, ছ'টা তিরিশ—পর্দা ওঠার নাম নেই। দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠছে। চিৎকার, চেঁচামেচি সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। যখন পর্দা উঠল তখন অনেকের মতোই আমিও ঘড়িতে একবার চোখ রাখলাম। সাতটা। পাক্কা এক ঘণ্টা দেরি। বেশ কিছু ক্ষুব্ধ দর্শক দেরির জন্য কৈফিয়ত তলব করতে শ্রীসরকার তাঁর বিচিত্র হাসিটি বজায় রেখেই নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন—কই, এক মিনিটও দেরি করিনি তো!

কী বলে? নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে অবাক! ঠিক দেখছি তো? এতো সত্যিই ছ'টা! তা হলে? এতক্ষণ যে সাতটা দেখছিলাম। আর সে তো শুধু আমি নই। হলঘর ভর্তি সকলেই যে ছ'টাকে এতক্ষণ সাতটাই দেখেছিলেন! বিপুল হাততালি দিয়ে সেদিন দর্শকরা শ্রীসরকারের গণসম্মোহনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

গল্পটা বলে গজেনদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তো সম্মোহন বিশেষজ্ঞ, ব্যাপারটি কীভাবে পি. সি. সরকার করেছিলেন বল তো? তুমি পারবে এমন ঘটাতে?"

স্বীকার করে নিলাম, "না পারব না। আমি কেন পৃথিবীর কোনও জাদুকরই এমনটা ঘটাতে পারবেন না। অতীতেও কেউ এমনটা ঘটাতে পারেননি। এ'ধরনের গণসম্মোহন কোনো দিনই দেখানো সম্ভব নয়।"

"তা হলে আমি কি মিথ্যে বললাম?" সরাসরি ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করলেন গজেনদা।

কঠিন সত্যি বলতে গেলে মাঝে–মধ্যে এমন অবস্থায় পড়তেই হয়। একটা ভুল ধারণা যাতে অনেকের মনের ভিতর ঢুকে না পড়ে, সেটা দেখতে গিয়ে অনেক সময় অপ্রিয় সত্যি–কথা বলতেই হয়। এখানেও হল। কথাগুলোকে একটু মোলায়েম করে বললাম, "আপনি

মিথ্যে বলছেন, বলছি না। হয়তো আপনার স্মৃতি আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছে। অনেক সময় এমনটা হয়। একটা শোনা গল্প যদি কারো মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় তবে অনেক সময় গল্পটা অনেকের কাছে বলতে বলতে একসময় সে বিশ্বাস করে ফেলে, ঘটনাটা সে নিজেই দেখেছে। অনেক সময় বহুকথিত হওয়ার ফলে আমরা বিশ্বাসও করে ফেলি। আমি বিশ্বাস করি, আপনার স্মৃতি একটু গোলমাল পাকিয়েছে।

পি. সি. সরকারের আগেও এমনি ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার গণসম্মোহনের আষাঢ়ে গল্প আরো অনেক জাদুরককে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে চালু ছিল। এইসব জাদুকররা হলেন রাজা বোস, জাদুকর গণপতি, রয়-দি-মিসটিক। পৃথিবীতে যাঁকে নিয়ে আষাঢ়ে গল্পটির শুরু, তিনি হলেন এক মার্কিন জাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন।

জাদুকররা মাঝে-মধ্যে কেন, কোনো সময়ই সম্মোহনের সাহায্যে জাদু দেখান না। শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে রাখতে, একটা ডাণ্ডার উপর মানুষকে ঝুলিয়ে রাখতে, করাতে দেহ দু'টুকরো করার খেলা দেখাতে বা অন্য কোনো খেলায় জাদুকর সম্মোহন করেন না। কৌশলের সাহায্যে করেন। জাদুকর চোখ বড় বড় করে দু'হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে, যে 'সম্মোহন' (?) করেন, সেটা আদৌ সম্মোহন নয়। অভিনয়। জাদুকরের সঙ্গিনী বা সঙ্গী সম্মোহিত হওয়ার অভিনয় করেন। তারপর যা দেখানো হয়, তা সম্পূর্ণই কৌশলে দেখান। জাদুকরদের এই অভিনয় বা প্রতারণামূলক সম্মোহন কয়েক প্রজন্ম ধরে দেখতে দেখতে দর্শকরা 'সম্মোহন' সম্বন্ধে ভুল ধারণা একটু একটু করে নিজের মনের মধ্যে গড়ে তুলেছেন।

কোনো জাদুকর যখন জাদু দেখান, তখন সে'সবই দেখান নিছক কৌশলে, কোনো অলৌকিক ক্ষমতায় নয়। প্রতিটি জাদুকরই সে'কথা মঞ্চে ও মঞ্চের বাইরে স্বীকারও করেন। কিন্তু কেউ যদি তেমনটা না করে কোনো জাদু দেখাতে গিয়ে দাবি করেন—এটা এবার দেখাচ্ছেন মন্ত্রশক্তিতে, ঈশ্বরের কৃপায় বা ভূতকে কাজে লাগিয়ে, তবে তা হবে সত্য-লঙ্ঘন, প্রতারণা। এবং এক্ষেত্রে যুক্তিবাদী প্রতিটি মানুষের উচিত এমন এক ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা। ঠিক একইভাবে অভিনয়কে সম্মোহন বলে মানুষকে প্রতারণার যে ঘটনা সুদীর্ঘকাল ধরে ঘটেই চলেছে, তাকে বন্ধ করা। সম্মোহন বা মস্তিষ্কে ধারণা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে বাস্তবিকই যা হয় তারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতাকে, সেই সত্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই এইসব 'না-সম্মোহন'কে 'সম্মোহন' বলে চালানোর বুজরুকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

পি. সি. সরকার (জুনিয়র)-এর অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ কি আদৌ কোনো কৌশলে দেখানো সম্ভব? ওই ব্যাপারটার পিছনে কি গণসম্মোহন কাজ করেনি? এ'জাতীয় অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে। উত্তরে প্রত্যেককেই যা জানিয়েছি, তা আবারো জানাচ্ছি—ট্রেন ভ্যানিশের ম্যাজিকে না ছিল অমৃতসর এক্সপ্রেস, না একজন দর্শকও ট্রেনটাকে ভ্যানিশ হতে দেখেননি। ম্যাজিকটা আদৌ দেখানোই হয়নি। কেউ দেখেনি। গোটা ম্যাজিকটার ভিত্তি ছিল মিথ্যে প্রচার। পুরো ঘটনাটা বিস্তৃতভাবে জানাব এই গ্রন্থেই।

জাদুকর ম্যানড্রেকের কাহিনিতে যেসব সম্মোহন শক্তির কথা আপনারা কমিক্সের বইতে পড়েন, সে'সব নেহাতই 'গুল-গপ্পো'। অথচ অনবরত ওসব কাহিনি পড়তে পড়তে অনেকেই ভাবেন, সম্মোহনের সাহায্যে সত্যিই বোধহয় এমনটাও ঘটানো সম্ভব। মজার কথা কী জানেন, বছর কয়েক আগে 'আনন্দমেলা'র পুজো সংখ্যায় আমার প্রিয় লেখক সমরেশ মজুমদার ম্যানড্রেকের গল্পে প্রভাবিত হয়ে তাঁর উপন্যাসে ম্যানড্রেকি সম্মোহন হাজির করেছিলেন। এমনকি 'সন্দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৪০২ (ডিসেম্বর, ১৯৯৫) সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের অপ্রকাশিত নতুন যে ফেলুদা-উপন্যাস 'ইন্দ্রজাল রহস্য' প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও দেখা যাচ্ছে সূর্যকুমার নামে এক জাদুকর লালমোহনবাবুকে মঞ্চে ডেকে এনে তাঁকে সম্মোহন করে পেন্সিল খাওয়াচ্ছেন অথচ সম্মোহিত লালমোহনবাবু ভাবছেন তিনি চকোলেট খাচ্ছেন। বাস্তবে এমনটি ঘটে না, এবং এ-সবই হল ম্যানড্রেকি গল্পের প্রভাবের ফল মিথ্যে সম্মোহনের ফল।

অধ্যায় : দুই

জন্তুদের সম্মোহন করা ব্যাপারটা কী?

১৯৯৬-এর নববর্ষের সকালে কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাঘকে সম্মোহিত করে গলায় মালা পরাতে গিয়ে বাঘের থাবার আঘাতে প্রাণ দিলেন তরতাজা তরুণ জয়প্রকাশ তিওয়ারি। মারাত্মক রকম আহত হন আর এক তরুণ, সুরেশ রাই।

ঘটনার শুরু সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ চিড়িয়াখানার 'ওপেন এয়ার' বাঘের আবাসে। নতুন বছরের প্রথম দিনের সকাল। চিড়িয়াখানায় বেজায় ভিড়। ভিড় বাঘের মুক্ত আবাসের কাছেও। হঠাৎই সেখানে জয়প্রকাশ ও সুরেশের আগমন। দু'জনে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে চিৎকার করে হিন্দিতে ঘোষণা করেন যে, তারা 'জাদুটোনা' জানেন। জানেন জন্তু-জানোয়ারকে সম্মোহিত করতে। আজ সকলের সামনে বাঘকে সম্মোহিত করে তার গলায় মালা পরিয়ে তারা ফিরে আসবেন। উপস্থিত দর্শকদের কেউ কেউ দুই তরুণকে বিরত করার চেষ্টা করলেও অনেকেই তাদের উৎসাহিত করেন। দুই তরুণ জনতার সামনেই কংক্রিটের পাঁচিল টপকে পরিখায় নামেন। সাঁতরে পরিখা ঘেরা বাঘের ডেরায় গিয়ে ওঠেন। এরপর একটিই বাধা ছিল ওঁদের ও বাঘের মাঝখানে—লোহার জাল। জালও টপকালেন দুই তরুণ। শত শত অবাক দৃষ্টির সামনে সুরেশ, জয়প্রকাশ এগুলেন বিশ্রামরত বাঘ 'শিবা'র কাছে। সম্মোহন করতে চোখে চোখ রাখতে হবে। কিন্তু দুটি আগন্তুকের আবির্ভাবকে পাত্তা না দিয়ে শিবা শীতের রোদ গায়ে মেখে বিশ্রাম নিতে লাগল। সুরেশ শিবার দৃষ্টি ফেরাতে খোঁচালেন। বিরক্ত শিবা পরিবর্তে সুরেশের গায়ে একটি চাপড় মারল। বাঘের চাপড়ে আহত সুরেশ কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন। জয়প্রকাশ এতে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে মিতা নামের বাগিনীকে সম্মোহিত করতে চেষ্টা করলেন। শিবা ঘুরে জয়প্রকাশের গলায় কামড় বসিয়ে এক ঝটকা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে খাঁচার দিকে।

তারপর জনতার চিৎকার, রক্ষীদের ছোটাছুটি, ঘুম পাড়ানো গুলি, জনতার বিক্ষোভ, ভাঙচুর সবকিছুই চূড়ান্ত হল। ফলে অবস্থা সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সকে (র‍্যাফ) নামানো হল।

সুরেশ ও জয়প্রকাশ পাগল ছিলেন, এমন কোনো তথ্যই আমাদের হাতে নেই। বরং সুরেশ এবং জয়প্রকাশের আপনজনদের কথামতো দু'জনেই ছিলেন পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ। তবে

দু'জনই যে সম্মোহন বিষয়ে এবং 'ব্ল্যাকম্যাজিক' বা তুকতাক বিষয়ে জানার জন্য অনেক সময় ও শ্রম দিতেন, তাও তাদের আপনজনেরা জানাতে ভোলেননি। তারা পশুকে সম্মোহন করার জাদুটোনা শিখেছিলেন এক তান্ত্রিকের কাছ থেকে।

কমিক্স বইয়ের ম্যানড্রেককে আমরা অবশ্য বহুবারই দেখেছি পশুদের সম্মোহন করতে। কিন্তু সে'সবই গল্প কথা। গুপী-বাঘার বাঘকে সম্মোহন করার গল্পও নেহাতই গল্প। কিন্তু এইসব গল্প কমিক্সের বইতে পড়ার বা সিনেমায় দেখার প্রভাব যে মোটেই শূন্য নয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পাই।

সম্মোহন শিখতে চাওয়া গাদা গাদা চিঠি হরদম পাই। এইসব চিঠি আসে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে ছাত্র থেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-অধ্যাপক সবাই আছেন। সম্মোহন সম্বন্ধে এঁদের ধারণাও বিচিত্র। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন সম্মোহন করে মানুষকে হুকুমের চাকর বানানো যায়। শরীরে হারকিউলিসের মতো শক্তি আনা যায়। বাঘ-সিংহের মতো হিংস্র প্রাণীদেরও মেনি বেড়াল বানিয়ে রাখা যায়।

এমন ভুল ভাবার মতো হরেক রকম ফাঁদ পাতা রয়েছে এই দুনিয়ায়। এমন কিছু কিছু জাদুকরকে আমি দেখেছি, যাঁরা দাবি করেন পশু-পাখি প্রত্যেককেই সম্মোহন করার বিদ্যে তাঁদের করায়ত্ত। প্রমাণ দিতে তাঁরা সব সময়ই বেছে নেন মুরগি। তারপর মুরগির মাথাটা মেঝেতে বা মঞ্চের প্ল্যাটফর্মে চেপে ধরে ঠোঁটের কাছ থেকে সাদা খড়ির লম্বা দাগ টেনে ছেড়ে দেন। অবশ্য এই সময় চলতে থাকে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ বা জাদুকরদের সম্মোহনের কায়দায় হাত নাড়া। ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা যায় মুরগিটি বাস্তবিকই স্বভাব সুলভভাবে ছটফট করছে না। ছাড়া পেয়েও পালাবার চেষ্টা করছে না। সম্মোহিত হয়ে চুপটি করে বসে রয়েছে।

এঁদের এমন কর্মকাণ্ড দেখে অনেকেই জন্তুকে সম্মোহন করার বিদ্যে শিখতে দস্তুরমতো খরচাপাতি করে, জাদুকরের খিদমদ খাটে। তারপর ওরা যা শেখে, সে বিদ্যে বাঘটাঘের কাছে ফলাতে গেলে পরিণতি হয় জয়প্রকাশ, সুরেশের মতোই।

মুরগির এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ কী, নিশ্চয়ই আপনাদের জানতে ইচ্ছে হচ্ছে? শিখিয়ে দিচ্ছি। আপনারাও যে কোনো মুরগিকে এমনি করে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন, প্রতারক জাদুকরের মতো আপনারাও আবার এটাকে সম্মোহন বলে প্রচার করবেন না।

একটি মুরগিকে ধরে তার মাথাটা মোঝেতে চেপে মুরগির ঠোঁটের কাছ থেকে সাদা খড়ির একটা সোজা দাগ টেনে মুরগিকে ছেড়ে দিলেই দেখবেন ও চুপটি করে বসে আছে।

এমনটা আচরণের কারণ মুরগির দুটি চোখের দৃষ্টিরেখা ঠোঁটের শেষপ্রান্তে একই বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই মুরগির ঠোঁটের কাছ থেকে সাদা খড়ির রেখা টানলে মুরগি ভাবে তার ঠোঁটে দড়ি জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাই ব্যথা পাওয়ার ভয়ে ঠোঁট নাড়তে চায় না। এমনকি নড়তেই চায় না।

এই অবস্থা থেকে মুরগিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে একবার জোরে আওয়াজ করলেই হল। আর দর্শকরা ভাবে—এভাবে বুঝি সম্মোহন থেকে মুরগিটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

অধ্যায় : তিন

ফোটো–সম্মোহন কি সম্ভব?

আজকাল পঞ্জিকার ব্যবহার কিছুটা কমে গেছে। আমাদের ছোটবেলায় পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে বেশ মজা পেতাম। তাতে কত যে অদ্ভুত সব বিজ্ঞাপন থাকত তার ইয়ত্তা নেই। এখনো থাকে। ফোটো–সম্মোহনের বিজ্ঞাপন এখনো পঞ্জিকা খুললে চোখে পড়বে। সে'সব বিজ্ঞাপনের ভাষাও বিচিত্র—"আপনি কি ভালবাসায় ব্যর্থ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ হারিয়েছেন? ফোটো সম্মোহনের সাহায্য নিন। দেখবেন, যিনি আপনাকে দূর দূর করেছেন, তিনিই আপনার হুকুমের চাকর হয়ে গেছেন, আপনার বিরহে ছট্‌ফট্ করছেন?"

ফোটো–সম্মোহন করার ব্যাপারটা কী? আপনি যাকে সম্মোহিত করে হুকুমের চাকর করতে চান, তার একটা ছবি আর মোটা টাকা দক্ষিণা তুলে দিন যে সম্মোহন করবেন, তাঁর হাতে। তা হলেই নাকি, যার ছবি সে আপনার হুকুমের দাস, আপনার ভালবাসায় পাগল হয়ে যাবে।

ফোটো–সম্মোহন করতে পারেন, এমন দাবি যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতি বা কুখ্যাতির শীর্ষে আছেন হাওড়ার জানবাড়ির পাগলবাবা, লেকটাউন নিবাসী গৌতম ভারতী।

ফোটো–সম্মোহন একটি আগাপাছতলা প্রতারণা ছাড়া কিচ্ছু নয়। গৌতম ভারতীয় ফোটো সম্মোহনের বুজরুকি ফাঁস করেছিলাম। তারপর সে এক বিশাল ব্যাপার। গৌতমের মিথ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার, বিজ্ঞাপনের মিথ্যেচারিতা ফাঁস, সাময়িক ভারসাম্য হারিয়ে গৌতমের আত্মহত্যার চেষ্টা গোটা ঘটনাটাই লিখেছি *'অলৌকিক নয়, লৌকিক'* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

ফোটো–সম্মোহনের বুজরুকি নিয়ে সে সময়কার জনপ্রিয় 'আলোকপাত' বাংলা মাসিক পত্রিকায় আমার কিছু চাঁচাছোলা বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর একজন আমাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। চ্যালেঞ্জারের নাম : কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী। নিবাস : বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া। 'আলোকপাত' এর ১৯৮৮–র জানুয়ারি সংখ্যায় কাজী সাহেব ঘোষণা করলেন— "প্রবীরবাবু যদি তাঁর পরিচিত কোনো নারীকে প্রকৃতই বিয়ে করার ইচ্ছে থাকে তা হলে কোনো ছবি–টবি নয়, শুধুমাত্র কয়েকটি প্রকৃত তথ্য দিলেই হবে। তথ্যগুলো অবশ্যই অপার্থিব নয়। যদিও তিনি ফোটো–সম্মোহন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন তবুও তিনি আগ্রহী হলে তাঁর এ প্রক্রিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।"

চ্যালেঞ্জের অর্থ মূল্য আমার তরফ থেকে তখন ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে চিঠি দিলাম। জানালাম, আমি বিবাহিত। আমার চিকিৎসক বন্ধু অনিরুদ্ধ কর অবিবাহিত। তাঁর মনের মতো মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনী করে দিলে হার মেনে নেব। মেয়েটির বিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং জানা সম্ভব, এমন সব তথ্যই দেব, এমনকি বাড়তি দেব মেয়েটির ছবি।

অনিরুদ্ধ আমাকে বলেছিলেন, "মেয়েটিকে পছন্দ করার পর কাজী সাহেব যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওর হাতে পায়ে ধরে আমার সঙ্গে বিয়ে ঘটিয়ে দেয়?"

বলেছিলাম, "আপনার শ্রীদেবী, রেখা অথবা এদের চেয়েও দুর্লভ মেয়েকে বিয়ে করতে কোনো আপত্তি নেই তো?"

অনিরুদ্ধ প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেছিলেন, "কাজী সাহেব আপনার চিন্তার হদিশ পেলে চ্যালেঞ্জ জানাবার দুঃসাহস দেখাতেন না।"

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি—সম্মোহন করে হুকুমের দাস বানানো বাস্তবে সম্ভব নয়! ওসব বিজ্ঞাপনে আর গল্পে হয়।

ফটো সম্মোহনই একালে

বিষয়টা একই। যাকে সম্মোহন বা বশীকরণ করতে চান, তার ছবি নিয়ে দেখা করুন

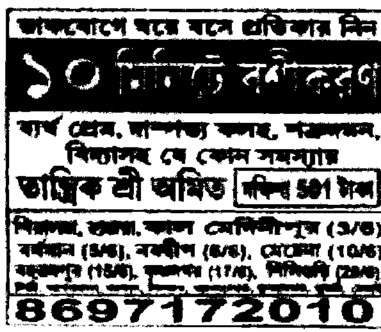

শ্রীগৌতম (এও গৌতম), শ্রী উজ্জ্বল শাস্ত্রী, শ্রী অমিত শাস্ত্রী, আচার্য্য সুব্রত শাস্ত্রী, শ্রী কমল শাস্ত্রী, টি. শাস্ত্রী প্রমুখদের সঙ্গে। ছবি ও মোটা টাকা খরচ করে পাবেন জমার ঘরে শূন্য।

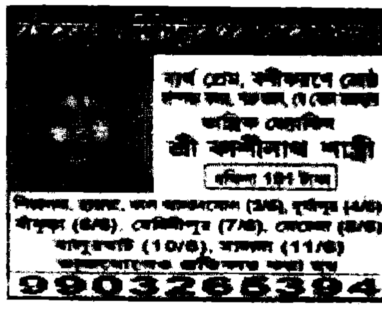

এইসব বুজরুকদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় প্রধানত বড় বড় দৈনিক পত্রিকায়। মফস্‌সলের কিছু পত্রিকাও টিকে আছে এইসব বুজরুক জ্যোতিষীদের অর্থে। কলকাতার কিছু টিভি চ্যানেলও জ্যোতিষীদের 'টাইম-স্লট' বিক্রি করে লাভ করে। এরা প্রত্যেকেই প্রতারকদের সহযোগী। এই ধরনের বুজরুকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০ অ্যামেন্ড করে। ১৯ মার্চ ২০০৯ প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ জারি করেছে। এতে শাস্তির পরিমাণ হয়েছে আজীবন কারাদণ্ড।

এখুনি কেউ কেউ বলতে পারেন—"আপনারা কিছু করছেন না কেন?" আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের, পুলিশ ও প্রশাসনের।

আমরা এই বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করার কাজ করে চলেছি। আপনারা সবাই আওয়াজ তুললে সরকার আইনের শাসন চালু করতে বাধ্য হবে।

এই প্রসঙ্গে জানাই—প্রচার মাধ্যমগুলোর এমন বে-আইনি বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে শাস্তিও অতি কঠোর, প্রচার মাধ্যমগুলোর সঙ্গে সরকার ও রাজনীতিকদের সম্পর্ক অবৈধ প্রেমিকার মতো। মিডিয়াগুলো তাইতেই এতটা বেপরোয়া।

এইসব জ্যোতিষীরা মানুষদের দেখেই ভাগ্য বলে দেয়, শত্রু বিনাশ করে, বশ করে ফেলে—এমনটাই ওরা দাবি করে। বাস্তব অবস্থা জানাতে এখানে আনন্দবাজারের একটা খবর তুলে দিচ্ছি। এই নমুনা খবর থেকেই বুঝতে পারবেন ওদের ক্ষমতার দৌড়।

আনন্দবাজার পত্রিকা

বৃহস্পতিবার, ২৬ জুন ২০০৮

ই-মেলে ডলারের টোপে প্রতারিত জ্যোতিষী

ঋজু বসু

তাঁর নিজের ও পুত্রের ভাগ্যে কী আছে তা বুঝতে সম্ভবত ভুল হয়েছিল তাঁর। তাই সাইবার লটারিতে রাতারাতি দেড় লক্ষ ডলার জয়ের খোয়াব দেখে এখন হাত কামড়াচ্ছেন জ্যোতিষী শ্রী গৌতম। উল্টে, প্রায় সাত লক্ষ টাকা মাসুল দিয়ে তাঁর এখন নিতান্তই করুণ অবস্থা।

দমদমের বাসিন্দা গৌতম ঘোষ ওরফে শ্রী গৌতম কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের নানা বিপদের সমাধানে কবচ-রত্ন দিয়ে থাকেন। একটি ভুয়ো লটারি কর্তৃপক্ষের ই-মেলে সাড়া দিয়ে তাঁর ছেলে গৌরব দফায় দফায় চেকে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন। জ্যোতিষী নিজেও ওই মারাত্মক লটারির স্বরূপ বুঝতে পারেননি। ই-মেলের নির্দেশ অনুযায়ী হাতে-হাতে ডলারের 'প্রাইজ মানি' নিতে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে গৌতমবাবু বিমানে সটান দিল্লিতে হাজির হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝে প্রথমে দিল্লি পুলিশ ও পরে রাজ্য গোয়েন্দা

পুলিশের শরণাপন্ন হন জ্যোতিষী। গত এপ্রিলে দমদম থানায় তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে একটি তদন্তকারী দল শীঘ্রই দিল্লি যাচ্ছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।

দিল্লিতে গিয়ে কী পেয়েছিলেন শ্রী গৌতম? সিআইডি সূত্রের খবর, গৌতমবাবু তদন্তকারী অফিসারদের জানিয়েছেন, দিল্লিতে এক ব্যক্তি তাঁদের হাতে একটি ভারী সুটকেস তুলে দেন। বলেন, 'এ হল ব্ল্যাক ডলার। এক ধরনের রাসায়নিক মেশালে এই পদার্থটি আসল ডলার হয়ে উঠবে।' গৌতমবাবু এ-ও দাবি করেন যে, তাঁর সামনেই একটি ভেঙে যাওয়া বোতল থেকে খানিকটা তরল মাখিয়ে ওই লোকটি ১০০ ডলারের দু'টি কালো নোটে মাখালে তা 'আসল' হয়ে ওঠে। তাঁদের বোঝানো হয়, ওই রাসায়নিকের বোতলটি বাক্সের মধ্যে গরমে ফেটে গিয়েছে। আর এক বোতল রাসায়নিক সুইজারল্যান্ড থেকে আসবে। তবে তার জন্য আরো লাখ চারেক টাকা দিতে হবে। সিআইডি-র এক কর্তার কথায়, "ডলারের দু'টি নোট হতে কোনো কারসাজি দেখিয়ে এই প্রতারকেরা জ্যোতিষী ও তাঁর পুত্রের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করে। গৌতমবাবুরা বাড়তি টাকা দিতেও রাজি হয়ে যান।" 'ব্ল্যাক ডলার'-এর এই বাক্স বন্ধ অবস্থায় সিআইডি উদ্ধার করেছে। সেটি আদালতে পেশ করা হবে।

সিআইডি কর্তারা এই ধরনের সাইবার প্রতারণার ঘটনায় উদ্বিগ্ন। স্পেশ্যাল আইজি (অপারেশনস) রাজীব কুমারের কথায়, "ই-মেল লটারির ব্যাপারটাই ফালতু। এই ধরনের লোভ মারাত্মক ক্ষতিকর। এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে অনেকের প্রতারিত হওয়ার নানা দৃষ্টান্ত আমরা সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরছি। কিন্তু এখনো কিছু লোক এর ফাঁদে পা দিচ্ছেন।"

সিআইডি-র এক কর্তা বলছেন, "লোকে সাধারণত দু-একবার বোকা বনে টাকা দেয়। কিন্তু গৌতমবাবুর ছেলে বার সাতেক টাকা দিয়েছেন। তা ছাড়া, এভাবে ডলার নেওয়াটা তো বেআইনি কাজ।"

গৌরব দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাক্তারি পড়ছেন। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। গৌতমবাবু টেলিফোনে বলেন, "আমি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।"

সিআইডি সূত্রের খবর, গত বছর জুলাই মাস থেকে এই ভুয়ো লটারির ই-মেল পাচ্ছেন গৌরব। এমএম ওয়ার্ড লোটো লটারি-এর তরফে ই-মেল আসছিল।

তাঁকে বলা হয়, এশিয়ার পাঁচজন এই দামি পুরস্কার জিতেছেন। বিভিন্ন দেশ ঘুরে 'প্রাইজ মানি' আসার কথা বলে তাঁর কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়। সিআইডি-র ডিএসপি রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ও এসআই জয়ন্ত চন্দ ওইসব ই-মেলের আইপি অ্যাড্রেস যাচাই করে জেনেছে, নাইজিরিয়ায় বসে এই জালিয়াতেরা টোপ দিচ্ছিল। গৌতমবাবুদের সঙ্গে তারা কয়েকবার ফোনেও কথা বলেছে। গৌরব টাকার লোভে ১০০টিরও বেশি ই-মেল পাঠিয়েছিলেন বলে সিআইডি জানতে পেরেছে।

অধ্যায় : চার

গণ-সম্মোহনের সাহায্যে কি ট্রেন ভ্যানিশ করা যায়?

আপনারা অনেকেই শুনেছেন জাদুকর পি.সি. সরকার (জুনিয়র)-এর যাত্রী বোঝাই অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশের কথা। জেনেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে অথবা অন্য কারো মুখ থেকে। ঘটনাটা দেখেছেনও অনেকে, দূরদর্শনের পর্দায়। কিন্তু অল্পজনই জেনেছেন, এই ট্রেন ভ্যানিশের প্রচারটা ছিল চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা, ইয়লো-জার্নালিজিমের এক ক্লাসিক প্যাটার্ন।

যাত্রীবোঝাই গোটা একটা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশের সুবাদে জাদুকর সরকার আজ কিংবদন্তি মানুষ। কিন্তু ওই জাদুর খেলায় না ছিল অমৃতসর এক্সপ্রেস, না হয়েছিল ভ্যানিশ। আসলে আদপেই ওটা ম্যাজিক ছিল না। কারণ, ম্যাজিকটা কেউই দেখেননি।

দেখানো হয়নি বলেই দেখেননি। দূরদর্শনে ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে যে গ্রামবাসীদের দেখা গিয়েছিল, তাঁদের বলা হয়েছিল—সিনেমার শুটিং হবে। ওঁরা শুটিং দেখার দর্শক হতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। কারণ, ওঁদের একজনও অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ হতে দেখেননি। অথচ ওঁদের যাত্রী বোঝাই ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে দূরদর্শনের পর্দায় হাজির করা হয়েছিল। কোনো বিশিষ্ট দর্শকও সেদিন প্যাসেঞ্জার ঠাসা অমৃতসর এক্সপ্রেস ভ্যানিশ হতে দেখেননি। দূরদর্শনের পর্দায় যা দেখানো হয়েছিল সেটা ছিল দর্শকদের প্রতারিত করার এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত।

এটা জাদুর ক্ষেত্রেও এক ঐতিহাসিক অনৈতিক ঘটনা। যে জাদু কেউ দেখল না, **সে জাদু দেখানো হয়েছে বলে প্রচার করাটা একটা বড় মাপের সংগঠিত প্রতারণার দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছু নয়।**

এসব শোনার পরও আমার পরিচিত এক সাংবাদিক বলেছিলেন, "জাদুর ব্যাপারটাই তো কৌশল"। বলেছিলাম, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই কৌশল কিন্তু তারও একটা নির্দিষ্ট নীতি আছে। জাদুকর যখন দেখান একটা মানুষ শূন্যে ভাসছে, তখন তা দেখানোর পিছনে যে কৌশলই থাকুক, দর্শকরা কিন্তু তাদের চোখের সামনে দেখতে পায়, একজন শূন্যে ভাসছে। আমরা

এই শূন্যে ভাসার দৃশ্য না দেখে কখনই বলব না, জাদুকর আমাদের সামনে একটা মানুষকে শূন্যে ভাসালেন। ট্রেন ভ্যানিশের ঘটনার যে প্রচার হয়েছে, সেখানে কোনো দর্শকই ট্রেন ভ্যানিশ হতেই দেখলেন না, তখন এটাকে শুধু জাদুর নীতি কেন, কোনো নীতিতেই 'দেখানো হয়েছে' বলে প্রচার করা যায় না।"

"আবার দেখুন, দেখা এবং দেখানোরও একটা নীতি আছে। যে খানা জংশনের কাছে তথাকথিত জাদুটি দেখানো হয়েছিল, সেখানকার অবস্থানগত কারণে প্রতিটি ট্রেনই ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়ার কারণে একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। কেউ কোনো ফেস্টুন দিয়ে দৃষ্টি আড়াল করে ট্রেনকে চলে যেতে দিলে যদি সেটা ট্রেন ভ্যানিশ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়, তা হলে আগামী যে কোনো দিন একই পদ্ধতিতে শিয়ালদা স্টেশনে আপনার চোখের সামনে দশ ঘণ্টায় শ'খানেক ট্রেন ভ্যানিশ করে দেখাতে পারি। আর সেজন্য আমাকে এমন কিছু করতে হবে না, একটা করে ট্রেন ছাড়বে, আপনার দৃষ্টির সামনে মেলে ধরব একটি রুমাল। মিনিট খানেকের মধ্যে বাঁক নিয়ে ট্রেনগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে থাকবে। তখন রুমাল সরিয়ে নেব আর আপনি ভ্যানিশ হওয়া ট্রেনের সংখ্যা গুনতে থাকবেন, পরের দিন আপনার কাগজের প্রথম পাতায় খবরটা ছাপাবেন বলে।"

সব শুনে সাংবাদিক বন্ধুটি বললেন, "ও এই ব্যাপার। কিন্তু এই করেও তো উনি দিব্যি কিংবদন্তি বনে গেলেন।"

হ্যাঁ কিংবদন্তি বনে গেলেন, সংবাদ মাধ্যমের মিথ্যাচারিতাতেই বনে গেলেন। আসল ঘটনা কী? আসুন সেদিকে আমরা ফিরে তাকাই।

এই না দেখা, না ঘটা ঘটনার খবর প্রচারিত হল দূরদর্শনে ১২ জুলাই, ১৯৯২। খবরের সঙ্গে দূরদর্শন দেখাল সেই না ঘটা ঘটনার ছবি। পরের দিন একটিমাত্র পত্রিকা 'আনন্দবাজার'–এ প্রকাশিত হল খবরটি। তারপর পি সি সরকার (জুনিয়র) খবর থেকে কিংবদন্তি।

ঘটনাটা খুবই সাদামাটা। সরকার ইস্টার্ন রেলের কাছ থেকে ভাড়া করেছিলেন একটা ইঞ্জিন ও ছ'টা কোচ। ইঞ্জিনটা ডিজেল চালিত, ইঞ্জিনের নম্বর ১/৪০৫। ছ'টা কোচের পাঁচটা সাধারণ, একটা A.C.। ইঞ্জিন এলো আন্দুল লোকোশেড থেকে। ছ'টা কোচ নিয়ে নকল 'অমৃতসর এক্সপ্রেস' এসে দাঁড়াল খানা জংশনের অনতিদূরে, খানা লিংক কেবিনের কাছে। ড্রাইভার ছিলেন অনিলবরণ দত্ত। কোনো গার্ড বা টিকিটচেকার ছিলেন না। দর্শকরা জানতেন, ওই ছ'কোচের ট্রেনটি 'অমৃতসর এক্সপ্রেস' নয়, শুটিং–এর জন্য ভাড়া করা। ট্রেনে যাঁরা যাত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা শ্রী সরকারের কর্মী ও রেলকর্মী। দর্শকদের বসানো হয়েছিল নিচু খেতে ও তার কাছাকাছি। কোচ নিয়ে ইঞ্জিন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে চার জোড়া লাইন চলে গেছে। চার জোড়ার দু'জোড়া লাইন হঠাৎ গেছে নিচের দিকে নেমে। এই লাইন দিয়ে ট্রেন একটু এগোলেই উঁচু মাটির আড়ালে চলে যায়।

ওই অনুষ্ঠান দেখতে একটিমাত্র পত্রিকার সাংবাদিক আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন, আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপের শংকরলাল ভট্টাচার্য। ভিডিও রেকর্ডিং–এর জন্য উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শনের সংবাদ পাঠিকা ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। ইন্দ্রাণী শংকরলালের জীবনসঙ্গিনীও।

ট্রেন চলার পূর্বমুহূর্তে ট্রেনকে আড়াল করতে তুলে ধরা হল ব্যানার। দর্শকদের সামনে ব্যানার, কানে জেনারেটরের বিশাল শব্দ। সঙ্গে বাজি–পটকার ঘন–ঘন শব্দ ও ঘন ধোঁয়া। ছবি রেকর্ডিং–এর দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রাণী। ইশারা পেয়ে ইঞ্জিন চালু করলেন অনিলবরণ। নিচে নেমে যাওয়া লাইন ধরে এগোলো তাঁর ট্রেন। রেকর্ডিং–এ ভ্যানিশ ট্রেনের চলার আওয়াজ যাতে ধরা না পড়ে তারই জন্য জেনারেটরটাকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। উত্তেজনাহীনভাবে ট্রেনটি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই ব্যানার সরিয়ে দেওয়া হল। শেষ হল 'ট্রেন ভ্যানিশ'–এর খেলা।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু হয়নি। ট্রেন ভ্যানিশের নেপথ্য দুর্নীতি জানাতে গিয়ে আমাদের সমিতিসহ বহু বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় জাদুকরদের অভিজ্ঞতাই খুব তিক্ত। বহু সংবাদপত্রের সাংবাদিকরাই আমাদের ও জাদুকরদের কাছ থেকে সবকিছু শুনেছেন, জেনেছেন, তথ্যপ্রমাণ নিয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবরটির উপর প্রতিবারই নেমে এসেছে ব্ল্যাক–আউটের থাবা। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় 'যুক্তিবাদী' ও 'কিশোর যুক্তিবাদী' পত্রিকায় ট্রেন ভ্যানিশ নামক শতাব্দীর সেরা সাংস্কৃতিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ করেছি। এই জাদুর নামে প্রতারণা বিষয়ে লিখেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট জাদুকর। কলকাতার অতি শ্রদ্ধেয় জাদু সরঞ্জামের নির্মাতা ও পরিবেশক শ্যাম দালাল লিখেছেন একটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত জাদু পত্রিকায়। লিখেছেন বিশিষ্ট জাদুকর সুবীর সরকার ও ভারতের অসাধারণ জাদুশিল্পী কে. লাল। কিন্তু এসব লেখা বাংলা ভাষার বৃহৎ পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায়, প্রতারক হিসেবে যাঁর ঘৃণা কুড়োবার কথা, তিনি কুড়িয়েছেন কিংবদন্তির সম্মান।

'সানন্দা' একটি জনপ্রিয় পাক্ষিক। প্রকাশ করেন আনন্দবাজার গ্রুপ। 'সানন্দা'র ৫ আগস্ট ১৯৯৪ সংখ্যায় চিঠিপত্তর বিভাগে ট্রেন–ভ্যানিশের নেপথ্য কাহিনি দু–চার লাইনে লেখার একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার প্রকাশিত চিঠিটার তলায় লেখা ছিল : "চিঠিটির উত্তর দিচ্ছেন পি. সি. সরকার, আগামী সংখ্যায়"। পত্রিকার তরফ থেকে এই ধরনের ঘোষণা, অবশ্যই ব্যতিক্রম।

যাই হোক, ১৯ আগস্ট ১৯৯৪, সংখ্যার সানন্দায় মি. সরকারের উত্তর প্রকাশিত হল। সরকার লিখলেন, "ট্রেন ভ্যানিশের ম্যাজিকটা আমি একটা বিশেষ এবং বিশাল কমিটির সামনে দেখিয়েছিলাম..."

সেই কমিটির এক নম্বর নাম হিসেবে সরকার যাঁর উল্লেখ করেছিলেন, তিনি হলেন কলকাতার হাইকোর্টের বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ভি.আই.পি.–দের তালিকায় ছিলেন, "সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ইউ. এন. আই., এ–পি'র প্রতিনিধি। ছিলেন আনন্দবাজার গ্রুপ, আজকাল, গণশক্তি, ওভারল্যান্ড পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রতিনিধি। দূরদর্শনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টরসহ ছিলেন দূরদর্শনের সাংবাদিক ক্যামেরাম্যানদের বিরাট টিম তো বটেই... আপামর জনসাধারণকে দেখাবার জন্য দূরদর্শন নিউজ কভার করেছে।" "কুচুটে মনোবৃত্তির লোকেরা যত কুৎসাই রটাক না কেন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ইজ্জত বেড়েছে।"

উত্তর পাঠিয়েছি 'সানন্দা'র দপ্তরে, কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে। পাঠাবার তারিখ : ৮.১০.১৯৯৪। রেজিস্ট্রেশন নম্বর জি–৩৩৪৪। ওরা যে চিঠি পেয়েছেন, তার প্রাপ্তিস্বীকারের কার্ডও পেয়ে গেছি। এই প্রসঙ্গে সানন্দার সম্পাদকীয় দপ্তরের

সঙ্গে কথাও হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৪ পেরিয়ে এখন ২০১১ নভেম্বর এখনো পর্যন্ত সানন্দা আমার চিঠিটি প্রকাশ করেননি। মানছি, আমার চিঠি ছাপার বা না ছাপার পূর্ণ স্বাধীনতা সানন্দার আছে। কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে—দেখার দায় সানন্দার নয়। চিঠিটিতে লিখেছিলাম :

"কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩ সেপ্টেম্বর '৯৪ প্রকাশ্য সভায় দ্বিধাহীন জানালেন—পি.সি. সরকার (জুনিয়র)-এর ট্রেন ভ্যানিশের আমি একজন দর্শক ছিলাম। সেদিন অমৃতসর এক্সপ্রেসকে ভ্যানিশ করা হয়নি। একটা ইঞ্জিন ও কয়েকটা কম্পার্টমেন্ট ভাড়া করে আনা হয়েছিল, সেগুলো রেললাইন ধরেই চলে গিয়েছিল। দূরদর্শনের তরফে ছবি তুলেছিলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। পি.সি. সরকার (জুনিয়র) এ বিষয়ে আমাকে মুখ না খুলতে অনুরোধ করেছিলেন।

প্রকাশ্য সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ৮ নম্বর কোর্টে, দুপুর ২টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত। সভার শিরোনাম ছিল 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'। ব্যবস্থাপক : হাইকোর্ট লেডিজ ওয়েলফেয়ার কমিটি। সহযোগিতায় হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতি। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। মূল বক্তা প্রবীর ঘোষ। হল উপচে পড়া ভিড়ে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার শ্রী এস. এস. পান্ডে, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার শ্রী মলয় সেনগুপ্ত ও শ্রী পি. কে. সেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার শ্রীনিরোদবরণ হালদার, স্টেট কোঅর্ডিনেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীচুনিলাল চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীসিদ্ধেশ্বর শূর এবং হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

৮ মে ১৯৯৪ বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দাবিসহ দূরদর্শনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন কলকাতা দূরদর্শনের ডিরেক্টর শ্রীঅরুণ বিশ্বাসের কাছে। তাতে দুর্নীতির একটি অভিযোগ ছিল 'ট্রেন ভ্যানিশ' দেখিয়ে কলকাতা দূরদর্শন ১২ জুলাই '৯৪ যে সংবাদ প্রচার করেছিল, সেই ট্রেন আদৌ কোনো কৌশলেই ভ্যানিশ করা হয়নি। গোটাটাই করা হয়েছিল ক্যামেরার কৌশলে। এমন একটি মিথ্যে খবর প্রচার করে একদিকে একজনকে রাতারাতি কিংবদন্তি বানানো হয়েছে। অন্যদিকে কোটি কোটি দর্শককে প্রতারিত করা হয়েছে।

ডিরেক্টর শ্রীবিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রীঅমলেন্দু সিনহার ওপর।

শ্রীসিনহা তদন্ত রিপোর্টে জানান, দূরদর্শন কেন্দ্রের কোনো কর্মী বা টিম জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)-এর অমৃতসর এক্সপ্রেসের ছবি তুলতে যাননি। খবরে যে ছবিটি দেখানো হয়েছিল তা তুলে এনেছিলেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। শ্রীসিনহা আরো জানান, শ্রীমতী ভট্টাচার্য দূরদর্শন কেন্দ্রের কর্মী নন। ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে মাঝে-মধ্যে তিনি খবর পড়ে থাকেন মাত্র।

'অল ইন্ডিয়া ম্যাজিক সোসাইটি'-এর সভাপতি ভারতের বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা গ্লোব-ডিটেকটিভ সার্ভিসেসকে দিয়ে এ ব্যাপারে একটি তদন্ত করান। ওই সংস্থার ডিরেক্টরের স্বাক্ষর-সংবলিত (রেফারেন্স নং-জি ডি এস/২৫৪০/৯২, তারিখ ১৮/৮/৯২) দীর্ঘ তদন্ত রিপোর্টে দ্বিধাহীনভাবে জানানো হয়েছে।

(১) অমৃতসর এক্সপ্রেস আদৌ ভ্যানিশ করা হয়নি। (২) তথাকথিত ট্রেন ভ্যানিশের জন্য একটি বিশেষ ট্রেন ভাড়া করা হয়েছিল, যার ডিজেল ইঞ্জিন নং–১/৪০৫। ড্রাইভারের নাম অনিলবরণ দত্ত। (৩) গ্রামবাসীদের বলা হয়েছিল সিনেমার শুটিং হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের ট্রেন ভ্যানিশের দর্শক হিসেবে দেখিয়ে প্রতারিত করা হয়েছে। (৪) ভাড়া করা ট্রেনটি লুপ লাইন দিয়ে তার নিজের মতোই চলে গেছে। (৫) ম্যাজিকের নামে ট্রেন ভ্যানিশের ঘটনাটি ছিল নিছকই একটি ক্যামেরা ট্রিক। (৬) আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ ছাড়া আর কোনো পত্রিকা প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সাংবাদিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র দু'জন—একজন আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য এবং অপরজন দূরদর্শনের ক্যাজুয়াল নিউজ রিডার শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য যিনি শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের স্ত্রী। প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে 'গ্লোব ডিটেকটিভ সার্ভিসেস'–এর তদন্ত রিপোর্টের জেরক্স কপি পাঠালাম। প্রয়োজনে আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিতে পারব, আর কোনো পত্রিকাগোষ্ঠীই যায়নি এবং মাননীয় বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় ও দূরদর্শনের ডিরেক্টর প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছি তাও কাঁটায় কাঁটায় সত্যি।

সানন্দার মতো জনপ্রিয় পত্রিকায় জাদুকর জুনিয়র সরকারের এই চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতার নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ায় আমার ও আমাদের সমিতির সম্মান ও মর্যাদা বিশালভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। যতদিন না এই চিঠির মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হচ্ছে, ততদিন এই মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে বয়ে বেড়াতে হবে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের ওপর এই ষড়যন্ত্রমূলক আঘাত ইতিহাস কোনো দিনই ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করবে না 'মথি' হতে শ্রীসরকারের মিথ্যাচারিতাকে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠি প্রকাশ করুন—অনুরোধ"।

চিঠির সঙ্গে গ্লোব ডিটেকটিভ সার্ভিসেস–এর তদন্ত সম্পূর্ণ প্রতিলিপিও পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু তারপর? প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, একবার ভাবুন, ১৯৯২-এর ১২ জুলাই কী ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)? সংস্কৃতির জগতে দুর্নীতির ইতিহাস? প্রচার-মাধ্যমের অকুণ্ঠ সহায়তায় ট্রেন ভ্যানিশের নামে প্রতারকের কিংবদন্তি হয়ে ওঠার ইতিহাস? নাকি প্রচার মাধ্যমের হলদে সাংবাদিকতার অনন্য নজির স্থাপনের ইতিহাস?

অধ্যায় : পাঁচ

সম্মোহন করে পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়া যায়?

এমন প্রশ্নের সুনামি দেখলাম ২০০৯-এর ডিসেম্বরে। সেজন্যে : 'এন ডি টিভি ইমাজিন' চ্যানেলের একটা অনুষ্ঠান 'রাজ পিছলে জনম কা'।

শুরু হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে। তার মাসখানেক আগে থেকে বিভিন্ন চ্যানেলে 'রাজ পিছলে জনম কা'-র ব্যাপক বিজ্ঞাপন।

অনুষ্ঠানটিতে কী দেখান হবে? বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের সম্মোহন করে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে গত জন্মে। এক গতজন্মেই শেষ নয়। একাধিক জন্মেও নিয়ে যাওয়া হবে কাউকে কাউকে। বিশাল প্রচারের দৌলতে সেই সময়কার ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল 'রাজ...'। আর আমাদের সমিতির কাছে এস এম এস ও ফোন বন্যার মতো আছড়ে পড়তে লাগল। প্রায় প্রত্যেকেরই মোটামুটি বক্তব্য—হয় এই অনুষ্ঠানটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন, নতুবা স্বীকার করে নিন যে, জন্মান্তর আছে, আত্মা অবিনশ্বর।

রাত ন'টা থেকে অনুষ্ঠানটির কয়েকটা এপিসোড আমাদের সমিতির পদাধিকারীরা প্রায় সকলেই দেখে ফেললাম। অবাক হলাম! এমন একটা মোটা দাগের বোকা-বোকা অনুষ্ঠান দেখতে হামলে পড়েছে গোটা দেশ! প্রচারে হুজুগ তুলতে সমর্থ হয়েছে, এটা স্বীকার করতেই হয়। তবে এটাও বুঝলাম—অনুষ্ঠানটি বলিউডি সেলিব্রেটিদের মতো অর্ধশিক্ষিতরা বোকা বনলেও একজন বিদ্বান, যুক্তিমনস্ক মানুষকে প্রভাবিত করার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই।

খুব সাজগোজ করা এক মধ্যবয়স্কা মহিলা 'সম্মোহন' করছিলেন। যাঁরা সম্মোহিত হচ্ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই অভিনয় খুব কাঁচা। সম্মোহনের ঘুমে যে রিল্যাক্স মুডে থাকাটাই স্বাভাবিক, সেই মুডে কাউকে দেখা গেল না। প্রশান্তির সম্মোহিত ঘুমের বদলে প্রত্যেকেই চোখ পিট্‌পিট্ করছিলেন। অর্থাৎ ঘুমের নাটক করেছিলেন। আর তারপর যা হচ্ছে, পুরো নাটক। কাল্পনিক ঘটনা রিক্রিয়েট করে দেখান হচ্ছে।

যিনি 'সম্মোহন' করছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গত জন্মের ঘটনা কী দেখতে পাচ্ছেন?

'সম্মোহিত' বললেন, দেখতে পাচ্ছি একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি, আমার বডিটা পড়ে আছে।

ওমনি দর্শকরা দেখতে পেলেন একটা প্লেন উড়তে উড়তে ক্র্যাশ করল। প্লেনের ভগ্নাবশেষ ও কিছু মৃতদেহের ছবি দেখান হল।

না, এগুলো 'সম্মোহিত' মানুষটির চিন্তার ধরা পড়া ছবি নয়। এসবই ইমাজিন টিভির কেনা স্টক-সর্ট।

এটা দেখে যাঁরা সম্মোহনের সাহায্যে আগের জন্মে নিয়ে যাওয়ার ছবিকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রইল।

যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি সুমিত্রা পদ্মনাভন বললেন, *আমাদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে যে মেয়েটি, কাকলি, সে খুব উৎসাহ নিয়ে দেখে বেশ ধন্দে ছিল। আমার সঙ্গে আলোচনা করে বলল—'সত্যি তো—মরে গেলে তো চিন্তাই থাকবে না। কী দিয়ে ভাববে?' তাকে বোঝালাম—স্মৃতি তো থাকে মস্তিষ্ক কোষে, আর এটা মরার পর আর থাকে না। কী করে থাকবে? পুড়ে, পচে শেষ হয়ে যায়। আমরা যা ভাবি, সব এই জীবনেরই চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, সুপ্ত ইচ্ছা, শখ—এই সব। জেগে, ঘুমিয়ে, স্বপ্নে, সম্মোহনের আধা ঘুমে—যা যা ভাবি, দেখি সব এই জীবনেরই।*

'আত্মা' বলে একটা কিছু শূন্যে ভেসে বেড়ায়—আমাদের স্মৃতিটাকে সঙ্গে নিয়ে—এটা কল্পনাই। এর কোনো সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, বরং অসত্যতাই যুক্তিসঙ্গত। আমরা জন্মাবার আগেও কোথাও ছিলাম না, আর পরেও কোথাও থাকব না। তাই তো জীবনটা এত সুন্দর, এত মূল্যবান। থাকবে শুধু আমাদের কাজকর্মের প্রভাব, আমাদের অবদান। প্রিয়জনের মনে আমাদের স্মৃতি।

কাকলি রান্না করতে করতে বলে উঠল—"এটা কী অন্যায় কথা বল—আগের জন্মে একজন অপরাধ করেছিল, আর তাই এ জন্মে তার ভোগান্তি হচ্ছে, এটা কাউকে বলাও তো উচিত না। সে কী বা করতে পারে? এরকম বিশ্বাস লোকের মনে ঢোকানোও তো ঠিক না, কি বল?"

আমি নিশ্চিত হলাম। যাক, ক্লাস এইট পড়া কাকলি যখন বুঝেছে, তখন আর চিন্তা নেই।

১ জানুয়ারি ২০১০-এ আমাদের সমিতির ওয়েবসাইট www.srai.org-তে এই অনুষ্ঠানের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চ্যানেলের উদ্দেশ্যে লেখা হয়, আপনাদের প্রমাণ করতে হবে আপনাদের অনুষ্ঠানের সত্যতা, নতুবা এই ক্ষতিকারক মিথ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে।

এরপর প্রচণ্ড ঝড় তোলা বিতর্ক শুরু হল। পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স থেকে প্যারানর্মালের ভাণ্ডাফোড় করা পৃথিবী কাঁপানো চরিত্র জেমস্ র‍্যান্ডি এই লড়াইতে আমাদের পক্ষে সামিল হলেন। তাঁরাও জানালেন—জন্মান্তর ব্যাপারটাই পুরোপুরি বিশ্বাস নির্ভর এক মিথ্যে। এটাকে সত্যি বলে চালাতে চাইলে র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জি এস প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে।

৯ জানুয়ারি দুপুর। তখন আমাদের ক্লাস চলছে ৩৩এ, ক্রিক রো-তে। ফোন এল আমার মোবাইলে, স্ক্রিনে লেখা NDTV-র প্রোডিউসর নগেন্দ্রজীর নাম। নগেন্দ্রজী যা

বললেন তার সংক্ষিপ্তসার হল— ঘোষদা, প্রোগ্রামটা বন্ধ করতে হলে বিশাল ক্ষতি হবে। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি প্রস্তাব দিলেন, ঘোষদা, 'রাজ পিছলে জনম কা' অনুষ্ঠানে আপনিও অংশ নেন। যা বলার বলুন।

বললাম, হ্যাঁ রাজি, তবে লাইভ অনুষ্ঠান হতে হবে। রেকর্ডেড অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্যতে যাতে কাঁচি চালাতে না পারেন, তাই এই প্রস্তাব। আপনার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?

এমন লাইভ অনুষ্ঠানে ওঁদের আপত্তি আছে। অতএব ওয়েবসাইট লড়াই জারি রইল। শেষ পর্যন্ত আমরা জিতলাম।

১৫ জানুয়ারি ২০১০ তাড়াহুড়ো করে শেষ অনুষ্ঠানটি দেখালেন প্রোডিউসর। ওঁরা জানালেন, এই অনুষ্ঠানটি বহু মানুষের ভালো লাগলেও কিছু মানুষের প্রতিবাদে তাঁরা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

ভারতের জন-সমষ্টির একটা বড় অংশই হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে একটা বড় অংশই পূর্বজন্ম-পরজন্মে বিশ্বাস করেন। তাঁদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই অনুষ্ঠানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদী সমিতির উদ্যোগে বিশ্বজুড়ে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ একজোট হওয়ায় উদ্যোক্তারা পিছু হটতে বাধ্য হন।

অধ্যায় : ছয়

জন্মান্তর ও সম্মোহন

'জন্মান্তর' আছে। প্যারাসাইকোলজিস্টরা তা বারবার প্রমাণ করেছেন। এই সত্যকে কি অস্বীকার করবেন?

'প্যারাসাইকোলজি' শব্দের সঙ্গে 'সাইকোলজি' শব্দের ধ্বনিগত অর্থাৎ উচ্চারণগত মিল আছে; যেমন আছে 'অ্যাস্ট্রোলজি' ও 'অ্যাস্ট্রোনমি' শব্দের উচ্চারণগত মিল। সত্যটা হল 'প্যারাসাইকোলজি' আদপেই 'সাইকোলজি'র শাখা নয়। বরং সত্যি বলতে কী **সাইকোলজির বিষয় 'মন' এবং প্যারাসাইকোলজির বিষয় ভূত, জাতিস্মর, তন্ত্র, প্ল্যানচেট, অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদি বিজ্ঞানবিরোধী বিষয়।**

এক ধরনের লেখক আছেন যাঁরা বিজ্ঞান লেখকের মুখোশের আড়ালে বিজ্ঞান বিরোধী লেখা লেখেন। এইসব লেখাকে বলা হয় 'পপ-সায়েন্স'। পপ-সায়েন্স অর্থাৎ পপুলার সায়েন্সকে বিজ্ঞান লেখকরা 'অ্যান্টি-সায়েন্স' বলে চিহ্নিত করেন।

এইসব অ্যান্টি-সায়েন্স লেখকরা প্যারাসাইকোলজি মার্কা লেখাও লিখে থাকেন। বিভ্রান্তি সৃষ্টির অস্ত্রগুলোকে চিহ্নিত করে এবার ফিরতে চাই 'আত্মা' নিয়ে আলোচনায়।

বাংলা অভিধানগুলোতে 'আধ্যাত্মবাদ' শব্দের অর্থ লেখা আছে—আত্মা বিষয়ক মতবাদ।

আধ্যাত্মবাদীদের দেওয়া 'আত্মা'র সংজ্ঞা থেকে আমরা যদি নির্যাস তুলে নিই, দেখব উঠে এসেছে প্রধান দুটি মত। **এক :** চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মনই আত্মা। **দুই :** আত্মার কাজকর্মের ফলই মন।

আগে প্রথম মতটিকে নিয়েই আলোচনা শেষ করে নিই।

এক : মনের অস্তিত্বকে বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান কখনই অস্বীকার করে না। 'মন'কে মেলে নেওয়া মানে আত্মাকেও মেনে নেওয়া, আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া—এমন অর্থ যদি কেউ করেন, করতে পারেন। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন, কাল কেউ যদি এসে আপনাকে বলেন, "আপনি কি স্বীকার করেন, মানুষের নাক আছে?" আপনি তখন কী

বলবেন? নিশ্চয়ই বলবেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই স্বীকার করি।" তখন প্রশ্নকর্তা যদি বলেন, "আমি এবং আমার ভক্তরা নাককেই আত্মা বলি। এবার আপনি কি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারছেন?" তখন আপনি বলতেই পারেন, "আপনি যদি নাককে 'আত্মা' বলতে চান, বলতেই পারেন। সে বাক-স্বাধীনতা আপনার আছে। আমার নাকের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াকে আত্মার অস্তিত্ব নেওয়া বলে আপনি প্রচার করতে পারেন, আপত্তি করব না। কিন্তু আপনি যদি এর পরের ধাপে বলে বসেন, 'আত্মা অমর' এবং আমি আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছি অর্থাৎ আত্মার অমরতাকেও মেনে নিয়েছি, তবে এমন উদ্ভট কথার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব। 'মানুষের নাকগুলো অমর', একজন সুস্থ স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমি কখনই এমন পাগলামো মেনে নিতে পারি না। এটা স্পষ্ট করে বলি, 'নাক'-এর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কখনই 'নাক'-এর অমরতাকে মেনে নেওয়া নয়।"

ঠিক এই একই ধরনের যুক্তিতে, মনরূপী আত্মাকে অমর বলে কেউ দাবি করলে আমরা তাকে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পারি না।

যাঁরা প্রচার করেন—'বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে', তাঁরা আসলে এই ধরনের প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মাথায় ঢোকাতে চান, বিজ্ঞান আত্মার অমরত্বকেই মেনে নিয়েছে।

বিজ্ঞান পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—মন, চিন্তা বা চৈতন্য মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেরই ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা কাজ-কর্মের ফল, মস্তিষ্ক বহির্ভূত কোনো বস্তু বা পদার্থ নয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ছাড়া চিন্তা বা মনের অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবাস্তব। শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, পোকা-মাকড়দের চিন্তার ক্ষেত্রেও রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। প্রাণীদের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ সবচেয়ে উন্নত, তাই তার চিন্তাক্ষমতাও সবচেয়ে বেশি, এই যা। মানুষের মৃত্যু ঘটলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বাস্তব অস্তিত্বই বিলীন হতে বাধ্য। কারণ মৃত্যুর পর সাধারণভাবে দেহও বিলীন হয় পুড়ে ছাই হয়ে, কবরের মাটিতে মিশে গিয়ে, অথবা বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে পচে-গলে-জন্তুর পেটে গিয়ে। দেহ বিলীনের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেও বিলীন হয়। এরপর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নেই কিন্তু তার কাজ-কর্ম আছে এবং কাজ-কর্মের ফল হিসেবে মনও আছে—এমনটা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। এমনকি ফরমালিনে সম্পূর্ণ দেহটিতে সংরক্ষণ করে রাখলেও চুল, নখ বাড়বে না বা মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ সচল থাকবে না। 'মন' মরণশীল মানে 'আত্মা' মরণশীল।

দুই : এবার আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় মতটি নিয়ে। এই মতটি হল—চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মন হল আত্মারই কাজ-কর্মের ফল। অর্থাৎ আত্মার ক্রিয়া হিসেবেই মন বা চিন্তার উৎপত্তি।

শরীর-বিজ্ঞানের ও মনোবিজ্ঞানের চিত্রটা এখন আমাদের কাছে খুবই পরিষ্কার। এখন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই আমরা বলতে পারি—এই দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা মনকে 'আত্মা' না বলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকেই 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, যার ক্রিয়া থেকে চিন্তা, চেতনা, চৈতন্য বা মনের উৎপত্তি, বিজ্ঞান তাকে বলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ; যদিও কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস ও কিছু ধর্মগুরু তাকে 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন।

মানুষ মরণশীল। গোটা মানুষটাই যখন মরণশীল, তখন তার দেহাংশও যুক্তিগতভাবে মরণশীল হতে বাধ্য। অতএব আমরা খুব সহজেই এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি— মানুষের দেহাংশ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও মরণশীল। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ মরণশীল হলে তাকে 'আত্মা' 'চৈতন্য' বা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তা মরণশীলই থাকবে, অমরত্ব লাভ করবে না।

'মন' বা 'মনের কারণ'–কে একসময় আধ্যাত্মবাদীরা অমর বলে মনে করেছিলেন। শুরুতে কোনো গভীর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে এমনটা প্রচার করেনি। শোষকদের সুবিধে করে দেবার জন্যেও এমনটা প্রচার করেননি। শুরুর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল তাঁদের শারীর বিজ্ঞানকে না জানার অক্ষমতা। অধ্যাত্মবাদীরা সে–সময় 'মন'কে মনে করতেন দেহাতীত বা দেহ–বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত কিছু, যা দেহকে ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন করলেও দেখা যায় না, যা স্পর্শ করা যায় না, অথচ জীবিত অবস্থায় যাকে সব সময়ই অনুভব করছি। 'মন' আছে কি নেই, এই প্রশ্ন যে করাচ্ছে, সেই 'মন'। অর্থাৎ 'মন' এমনই একটা কিছু, যাকে অনুভব করা যায়, যা মুহূর্তে লক্ষ–কোটি মাইল ঘুরে আসে, যাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না।

মনকে 'আত্মা' বলে, বা মনের কারণ–কে 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করে একে এক রহস্যময় বিষয় করে তুলেছে আধ্যাত্মবাদীরা। অজ্ঞানতার অন্ধকারই 'মন'–এর এই রহস্যময়তা সৃষ্টির কারণ।

আধ্যাত্মবাদীরা একসময় মানুষের মৃতদেহ দেখে গভীরভাবে চিন্তা করেছে, জীবিত ও মৃত মানুষের দেহের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তাঁদের মনে হয়েছে, দুটি ক্ষেত্রেই দেহ তো উপস্থিত, অনুপস্থিত শুধু 'চৈতন্য' বা 'মন'। এই 'চৈতন্য' বা 'মন'–এর অনুপস্থিতির জন্য একটি দেহ মৃত এবং তারপর এই দেহকে সংরক্ষণের চেষ্টা করলে তাতে পচন ধরবেই। এই অবস্থাই তাদের চোখে একসময় আত্মা যে দেহাতিরিক্ত বিষয়, তারই প্রমাণ হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'চিন্তা' বা 'মন'–এর উৎপত্তি কোথা থেকে এটা তো মানুষ একদিনে জানেনি। শারীর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ধাপে ধাপে মানুষ পরিচিত হয়েছে মস্তিষ্ক, স্নায়ুকোষ ও তার কাজ–কর্মের সঙ্গে। আর তারপর যত বেশি বেশি করে মানুষ এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ–কর্ম ও আত্মার সংজ্ঞা, উভয়ের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছে, ততই আত্মা তার অমরত্ব হারিয়েছে।

শিক্ষিত এমনকি চিকিৎসকরাও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা থাকার জন্য 'মন' বা 'চেতনা'র কারণ যে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ, এ কথা জানেন। কিন্তু জানেন না 'আত্মা'র সংজ্ঞা। ফলে ছোটবেলা থেকে জেনে আসা কথা, 'আত্মা অমর', তাতেই বিশ্বাস করে বসে আছেন।

তাঁরা যদি একবারের জন্যেও জানতে পারতেন আধ্যাত্মবাদীরা কেউ 'মন'কে কেউ বা 'মনের কারণ' মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে 'আত্মা' বলে চিহ্নিত করেছেন, তা হলে এইসব শারীরবিজ্ঞান জেনেও আত্মায় বিশ্বাসীদের বিশ্বাস যেত চটকে।

বর্তমানে মানুষ যখন বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে জীবনের সর্বস্তরের ব্যবহার করছে, শারীরবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ স্কুল গণ্ডিতেই হয়ে যাচ্ছে, তখন আধ্যাত্মবাদীরা তাদের টিকে

থাকার প্রয়োজন আধ্যাত্মবাদকে রহস্যের ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখতে চাইছে। এজন্য অধুনা আধ্যাত্মবাদীরা একইসঙ্গে মিথ্যাচারিতা, অস্বচ্ছ ভাসাভাসা কথা ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা 'মৃত্যু ও পরলোক' 'আত্মার কথা' ইত্যাদি জাতীয় বই প্রকাশ করেছে। নিজ আত্মার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমার নানা গল্প পর্যন্ত ফাঁদছে। আত্মাকে পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়ার সিরিয়াল তৈরি করছে। 'আত্মা'র সংজ্ঞা বিষয়ে অদ্ভুত রকম ধোঁয়াশা তৈরি করছে। কারণ এইসব আধ্যাত্মবাদীরা খুব ভালো মতোই নিজেদের বাস্তব অবস্থান ও দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাঁরা জানেন সাধারণের কাছে আত্মার সংজ্ঞা, আত্মার ধর্মীয় ধারণাগুলোর বিস্তৃত আলোচনাই আত্মার মরণ ডেকে আনবে।

কিছু কিছু আধ্যাত্মবাদী নেতা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করে বসে আছেন শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে, একথা সত্যি। তারই সঙ্গে এও সত্যি, এযুগে আধ্যাত্মবাদের নেতৃত্ব রয়েছে জানা, বোঝা শিক্ষিতদের হাতেই। এঁরা জানেন ও বোঝেন একরকম। জানান ও বোঝান আর একরকম। এমনটা হওয়ার কারণ, আজো আমাদের সমাজে আধ্যাত্মবাদীরা পূজিত হন, অর্থ ও ক্ষমতা দুইই পোষা কুকুরের মতোই তাঁদের পাশে পাশে ঘোরে।

এরই পাশাপাশি আমাদের অসাম্যের সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক শক্তি তাদের টিকে থাকার স্বার্থেই আধ্যাত্মবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়, আধ্যাত্মবাদকে পুষ্ট করতে চায়।

অসম বিকাশের এই দেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও অনেকে সাধু–সন্তদের কাছে নতজানু হওয়ার মধ্যে কিছুটা 'গাঁইয়াপনা' খুঁজে পান। এই শ্রেণির মানুষদের জন্য সমাজ নিয়ন্ত্রক শক্তি হাজির করে 'প্যারাসাইকোলজিস্ট' নামধারী বিজ্ঞানের মুখোশ আঁটা আধ্যাত্মবাদীদের।

আধ্যাত্মবাদীদের দু'টি শিবিরের দেওয়া আত্মার সংজ্ঞা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করলে আমরা একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে বাধ্য—আত্মা মরণশীল।

আত্মা মরণশীল প্রমাণিত হওয়ার পর ভূত-প্রেত-প্ল্যানচেট-পূর্বজন্ম পরলোক-পরলোকের বিচারক ঈশ্বর-স্বর্গ-নরক ইত্যাদি প্রতিটি বিশ্বাসই অলীক হয়ে যায়।

আর শেষ কথা—প্যারাসাইকোলজিস্টরা আজ পর্যন্ত একজনও খাঁটি জাতিস্মর হাজির করতে পারেননি। ডজন দুয়েক জাতিস্মর ওঁরা হাজির করেছেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে আমি সব বুজরুকি–ই ফাঁস করেছি। তার প্রতিটি কাহিনী পাবেন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক (৪র্থ খণ্ড)'–তে।

অধ্যায় : সাত

সম্মোহন ও নার্কো টেস্ট

'নার্কো টেস্ট' কথাটা যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে স্ট্যাম্প পেপার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তেলগির 'নার্কো টেস্ট' হওয়া নিয়ে মিডিয়ার হৈ হৈ থেকে। 'নার্কো টেস্ট'-কি সম্মোহন করে কথা বলানোর মতো?

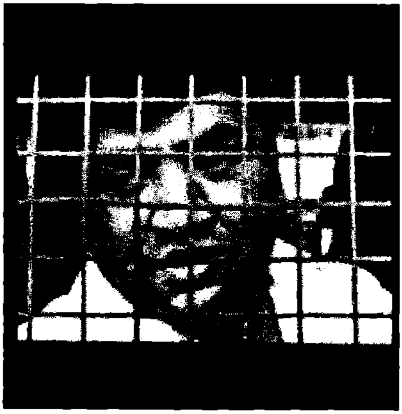

হ্যাঁ তা–ই। 'নার্কো টেস্ট' হল 'সম্মোহন ঘুম' এনে সত্যি বলানো। নার্কো টেস্টে 'সম্মোহন ঘুম' আনতে 'সাজেশন' না দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে সুমিত্রা পদ্মনাভনের এই প্রসঙ্গে একটা লেখা এখানে তুলে দিচ্ছি। শিরোনাম ছিল 'নার্কো টেস্ট' কী? লেখাটি 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার নভেম্বর ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

নার্কো টেস্ট বা নার্কো অ্যানালিসিস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি প্রথম টিভি দেখে। সারা দিন ধরে দেখানো হয়েছিল স্ট্যাম্প পেপারে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আবদুল করিম তেলগির নার্কো–অ্যানালিসিস। যারা দেখেছিলাম, তারা জানলাম নার্কো টেস্টে, অভিযুক্তকে হাসপাতালের মতো একটা পরিবেশে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। তারপর তাকে গালে আস্তে

চাপড় মেরে মেরে ঘুম একটু ভাঙিয়ে প্রশ্ন করা হয়। না, ঘুম পুরো ভাঙে না—সম্মোহন ঘুমের মতো একটা আধো ঘুম, আধো জাগা অবস্থায় সরলভাবে সেই মানুষটি জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে থাকে মনের কথা। দিতে থাকে প্রশ্নের উত্তর।

বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা! ওষুধের সাহায্যে সম্মোহন ঘুমের অবস্থাটি তৈরি করা হয়। ওষুধের পরিমাণই ঠিক করে কখন ঘুম ভাঙবে। তাই হঠাৎ জেগে যাওয়ার ভয় নেই। আর মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথা যেমন মানসিক রোগীরা সম্মোহিত অবস্থায় বলে ফেলে, ঠিক তেমনই, এক্ষেত্রে সম্ভাব্য অপরাধী বা তার সাকরেদরা সত্য গোপন না করে সব কথা শিশুর সারল্যে বলে যায়। ব্যস্—কেল্লা ফতে।

এতদিনে আরো যাদের যাদের ওপর এই 'সত্যকথন দাওয়াই' প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে চন্দনদস্যু বীরাপ্পনের সাঙ্গোপাঙ্গরা, নিঠারী কাণ্ডের ও আরুশি হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তরা, আবু সালেম ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে অভিযুক্তরা তো আছেই। পুলিশকে শুধু একবার বলতে হয়—যে আসামি সহযোগিতা করছে না, তাই কোনো কথা বের করা যাচ্ছে না। তখনই কোর্ট নার্কো অ্যানালিসিস করার অনুমতি দেয়। সঙ্গে থাকেন বিজ্ঞানীরা। এই সমস্ত পরীক্ষাই হয় ব্যাঙ্গালোরের 'ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি' বা FSL-এর তত্ত্বাবধানে।

ভারতে গত আট বছর ধরে এই নার্কো-অ্যানালিসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে অপরাধের তদন্তের কাজে। তদন্তের সময় অভিযুক্তকে, প্রত্যক্ষদর্শী বলে যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকে বা অভিযুক্তের কাছের ও পরিচিত মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হয়। তাদের বয়ান থেকেই অপরাধের নানান সূত্র বেরিয়ে আসে। কিন্তু মানুষের জটিল মস্তিষ্ক মানুষকে শিখিয়েছে মিথ্যা বলতে, অভিনয় করতে, মিথ্যাকে সত্য বলে হলফ করতে। আদালতে গীতা, বাইবেল ইত্যাদি ছুঁয়ে 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না' প্রতিশ্রুতির পরও চোখের পাতা না ফেলে, সোনামুখ করে নিপাট মিথ্যে কথা বলে যেতে পারে মানুষই। সত্যি বলানোর জন্যে তাই এত ব্যবস্থা।

কীভাবে হয় নার্কো টেস্ট?

* প্রথমে অভিযুক্তকে বসানো হয় **'লাই-ডিটেক্টর'** পরীক্ষায়। এর জন্য FSL-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক এই পরীক্ষায় রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি আরো কয়েকটি শারীরিক উপসর্গ পরিমাপ করে আন্দাজ করা হয় যে অভিযুক্ত সত্যি কথা বলছে না।

* এরপর হয় **'ব্রেন ম্যাপিং'**। তাতে মস্তিষ্কের কিছু পরীক্ষা করে আবারো নিশ্চিত হওয়া হয় যে অভিযুক্ত কিছু তথ্য গোপন করছে।

* তৃতীয় ধাপে অভিযুক্তকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দেন যে মানুষটি নার্কো টেস্ট দিতে শারীরিকভাবে প্রস্তুত বা সুস্থ।

এরপর যে-কোনো বড় অপারেশনের মতো অভিযুক্তকে ও.টি. বা অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে কনসেন্ট ফর্ম-এ সই করিয়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ সে স্বেচ্ছায় এই টেস্ট দিতে যাচ্ছে। তারপর অ্যানাস্থেটিস্ট তাকে 'ইন্ট্রাভেনাস ড্রিপ' বা ধমনীর মধ্যে দিয়ে ইঞ্জেকশনের মতো করে ফোঁটায় ফোঁটায় অজ্ঞান করার ওষুধ প্রয়োগ করেন।

তেলগি তো শুনেছি এত আরাম পেয়েছিল, যে আবার টেস্ট দেওয়ার জন্য আবদার ধরেছিল।

FSL-এর ডিরেক্টর ডা. মোহন বলছেন, "এটা যদি অত্যাচার হয়, তা হলে সর্বাগ্রে মনস্তাত্ত্বিকরা মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি বন্ধ করুন। তেলগি তো এই পরীক্ষার পর মানসিকভাবে এত নিশ্চিন্ত ও ভারমুক্ত বোধ করছিল যে আবার পরীক্ষায় যেতে চাইছিল।" ডা. মোহন আরো বলছেন যে এই পরীক্ষায় কোনো শারীরিক ক্ষতি হয় না এবং প্রশ্ন করেন মনোরোগে বিশেষজ্ঞরাই, তাই মানসিক আঘাতের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এখন পর্যন্ত ৭০০-৮০০ ব্যক্তির উপর এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে ও তার মধ্যে ২৫% কে নিরপরাধ ঘোষণা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তবু দেশে ও বিদেশে এখনো এই নার্কো টেস্ট 'বিজ্ঞান'-এর তকমা পায়নি। এখনো কোনো আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে এই বিষয়ে কোনো প্রমাণিত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি। তবে ডা. মোহনের কথায়—এত তথ্য ও পরিসংখ্যান রয়েছে যে শিগ্‌গিরই উনি বিজ্ঞানের দরবারে সেগুলো পেশ করবেন এবং তথ্য প্রমাণ-সহ একটা মাপকাঠি নির্ধারণ করে বিষয়টাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'স্ট্যান্ডার্ডাইজ' করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

তাহলে কেন অন্যান্য দেশ নার্কো অ্যানালিসিসকে বাতিল করেছে? (১) পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত নয় এখনো, (২) ডাক্তারি পেশার এক্তিয়ারে পড়ে না, যেহেতু এক্ষেত্রে কোনো রোগ সারানো নয়, অপরাধীকে ধরার ও শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, (৩) সব সময় নির্ভুল হয় না কারণ অনেকে সম্মোহনের ঘোরে ইলিউশন বা ডিলিউশনের শিকার হয়ে ভুল বলেন বা কল্পিত কিছু কথা বলেন।

এ বিষয়ে প্রাক্তন আই পি এস অফিসার কিরণ বেদী কী বলছেন শুনি।

'সব সময় নির্ভুলভাবে না হলেও এই পদ্ধতি যথেষ্ট উপযোগী। এখনো সময়ের পরীক্ষায় পাস হয়নি, আদালত এখনো ছাড়পত্র দেয়নি। তবু নার্কো টেস্ট সত্য উদ্ঘাটনে অনেক সময়ই যথেষ্ট সাহায্য করে। পদ্ধতিটাকে নিয়মের মাপকাঠিতে এনে একটা স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা হিসাবে আদালতের কাছে পেশ করতে হবে। ওটাই শেষ কথা হবে কি না, তা ঠিক করবে আদালত, অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করার পর।

যাই হোক, ততদিন আমরা কিরণ বেদীর কথায় একমত হয়ে বলতেই পারি যে শারীরিক অত্যাচারের চেয়ে নার্কো অ্যানালিসিস অনেক মানবিক একটি বিকল্প। অপরাধের সূত্র পেলে তবে তো তথ্যপ্রমাণ খোঁজা হবে ও পাওয়া যাবে। যেমন, ***কোনো অপরাধী যদি সম্মোহন ঘুমের মধ্যে বলে—'হাঁ, আমি খুন করেছি। ছুরিটা ফেলেছি পাশের ঝোপে।' তা হলে নিশ্চয়ই তার কথার ভিত্তিতে তার শাস্তি ঘোষণা হবে না। তখন ছুরিটা খোঁজা হবে। যদি সত্যি সেটা পাওয়া যায় ও তারপর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—যেমন আঙুলের ছাপ, DNA পরীক্ষা ইত্যাদি সবকিছু মেলানো যায়, তবেই অন্তিম সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবে।*** *তাই 'অবৈজ্ঞানিক' বলে উড়িয়ে না দিয়ে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে এগোনো সম্ভব মানুষের সদিচ্ছা থাকলে।*

মানুষের সদিচ্ছাই পারে সব পদ্ধতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সত্যে পৌঁছতে।

'নার্কো টেস্ট' ও সম্মোহনের ঘুমে তফাত নেই বলা যায়।

অধ্যায় : আট

সম্মোহন করে কথা বলানো যায়?

হ্যাঁ, বলান যায়, নার্কো টেস্টের মতোই কথা বলান যায়। তবে মনে রাখতে হবে—সম্মোহিত ব্যক্তি সহযোগিতা করে বলেই সম্মোহন করা যায়। সহযোগিতা না পেলে সম্মোহন করা অসম্ভব। কেউ একমনে সাজেশন না শুনলে সে সম্মোহিত হবে না।

নার্কো টেস্টের বেলায় ওষুধ শরীরে ইনজেক্ট করা হয়। ফলে আচ্ছন্ন অবস্থায় আনার জন্য ওষুধের মাত্রা প্রয়োজনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

সম্মোহন করে যাকে কথা বলাতে চাই, প্রয়োজনে তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করেও সম্মোহন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে 'পর্ব : চার'-এ বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

অনেক তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে বরং একটা ঘটনার উল্লেখ করছি।

এগারো বছরের ঝক্‌ঝকে চোখের চট্‌পটে ছেলে অমিতকে (প্রয়োজনের তাগিদে নামটা পাল্টালাম) ঘিরে ৬ মার্চ ১৯৮৯ থেকে ঘটে চলেছিল কতকগুলো অদ্ভুত ভুতুড়ে ঘটনা।

অমিত গুপ্ত কলকাতার এক অতি বিখ্যাত স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। থাকে উত্তর কলকাতায়। কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতাবাসী। নিজেদের বাড়ি। বনেদী পরিবার। বাপ-ঠাকুরদার খেলার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা। এক নামে খেলার জগতের সকলেই দোকান ও দোকানের মালিককে চেনেন।

অমিতকে ঘিরে ভুতুড়ে রহস্যের কাণ্ডটা জানতে পারি ১৫ মার্চ। 'আজকাল' পত্রিকার দপ্তরে গিয়েছিলাম। যেতেই আমার হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন পূষণ গুপ্ত। চিঠিটাই এখানে তুলে দিচ্ছি।

শ্রী অশোক দাশগুপ্ত সমীপেষু,
সম্পাদক, আজকাল পত্রিকা,
সবিনয় নিবেদন,

আমার পুত্র... (নামটা দিলাম না)... স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। তাকে কেন্দ্র করে কিছু অলৌকিক (?) কাণ্ড ঘটে চলেছে—যা আমার স্ত্রীর বয়ানে লিপিবদ্ধ। বয়ানটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সঙ্গে দিলাম। ঘটনাগুলোকে আমার যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে পারছে না।

আবার তাকে অস্বীকার করে সত্য প্রতিষ্ঠা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাড়িতে এ নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই অশান্তি। এই পরিস্থিতিতে আমি ও আমার স্ত্রী যুক্তিবাদী শ্রী প্রবীর ঘোষের শরণাপন্ন হতে চাই। এ বিষয়ে আপনার অনুমতি ও সাহায্য আমার পরিবারে শান্তি আনবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার ও প্রবীরবাবুর সাহায্য পেলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। নমস্কার।

ঠিকানা... স্বাক্ষর...

আমাদের সুবিধের জন্য ধরে নিচ্ছি অমিতের বাবার নাম সুদীপ, মা অনিতা। অনিতার তিন পৃষ্ঠার বয়ান পড়ে যা জানতে পারলাম, তার সংক্ষিপ্তসার—৬ থেকে ৯ মার্চ চারদিন রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ভিতরের উঠোনে, দরজার ঠিক সামনেই দেখা যেতে লাগল কিছুটা করে জল পড়ে থাকছে। ১০ তারিখ রাত ৮টা নাগাদ ঘরের আলো নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে খাটে বসেছিলেন অমিতের মা অনিতা ও বাবা সুদীপ। সামান্য সময়ের জন্য নিজেরা কথা বলতে বলতে বাইরে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন বারান্দায় চোখ পড়ল তখন ওঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন উঠোনে পড়ে আছে কিছুটা পায়খানা। ১১ তারিখ সকাল ৯টা থেকেই শুরু হল ভূতের তীব্র অত্যাচার। অমিতের ঠাকুমা পুজো করছিলেন। হঠাৎ ভিতরের উঠোনে চোখ পড়তেই দেখলেন উঠোনে এক গাদা জল। তারপর থেকে সারা দিন রাতে প্রায় চল্লিশবার জল পড়ে থাকতে দেখা গেছে বিভিন্ন ঘরে, বিছানায়, টেলিভিশনের ওপরে। এই শুরু, এরপর প্রতিটি দিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলতেই থাকে ভূতের তাণ্ডব।

অনিতার জবানবন্দিতে, "চেয়ারে বসে অমিত পড়ছে, পাশেই বিছানা। কলমের ঢাকনাটা তুলতে বিছানার দিকে হাত বাড়াতেই দেখা গেল, বিছানা থেকে কলের জলের মতো জল পড়ে অমিতের জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।"

অমিতদের ঠিক পাশেই অমিতের মামার বাড়ি। ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে অমিতকে মামার বাড়িতে রাখা হয়। সেখানেও ভূত অমিতকে রেহাই দেয়নি। সেখানেও শুরু হয় ভূতের উপদ্রব। নানা জায়গায় রহস্যজনকভাবে জলের আবির্ভাব হতে থাকে। অমিত বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করেছে সবে, হঠাৎ ওর মাথার উপর কে যেন হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল। অথচ বাথরুমের একটি মাত্র জানলাও তখন খোলা ছিল না।

এরপর অমিতকে আবার নিজের বাড়িতেই ফিরিয়ে আনা হয়। বাড়িতে অনবরত চলতেই থাকে ভূতের জল নিয়ে নানা রহস্যময় খেলা। সেদিনই রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা নাগাদ গৃহশিক্ষক অমিতকে পড়াচ্ছিলেন। গৃহশিক্ষকের সামনেই অমিতের চেয়ারে হঠাৎ একগাদা জলের আবির্ভাব। সেই রাতেই বাড়ির ও পাড়ার লোকজন অমিতদের ভিতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে জল-ভূতের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে বাড়িতে দু'জন তান্ত্রিক দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র পুজো হয়েছে। এক ব্রাহ্মণ আট ঘন্টা ধরে যজ্ঞও করেছেন ভূত তাড়াতে। খরচ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। এই আলোচনায় সুদীপবাবু জানান, বাড়িটাই বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতদিনের বাস তুলে চলে যাবেন, সিদ্ধান্তটা প্রতিবেশীদের পছন্দ হয়নি। কয়েকজন শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রবীর ঘোষের সাহায্য নেওয়ার কথা জানান। অমিত আলোচনা শুনছিল। ও শারীরিকভাবে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। ঘটনাটা সুদীপবাবুর নজরে পড়ে। অমিতকে এক মগ জল এগিয়ে দিয়ে বলেন, "শরীর খারাপ লাগছে? চোখে মুখে জলের ছিটে দে, ভালো লাগবে।" অমিত

জলের ছিটে দিয়ে সবে ঘুরেছে, অমনি কে যেন ওর মাথায় ওপর ঝপ্‌ঝপ্‌ করে জল ঢেলে দিল। সারা শরীর ভিজে একশা অবাক কাণ্ড! অথচ ওপরেও কেউ ছিলেন না। সেই মুহূর্তে সুদীপ ও অনিতা একমত হলেন—আর নয়, প্রবীরবাবু যদি কিছু করতে পারেন ভালো, নতুবা যে কোনো দামে বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাটই নয় কিনে নেবেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুদীপ, অনিতার মতামতের বিরোধিতা করতে একজনও এগিয়ে এলেন না।

সুদীপের চিঠি ও অনিতার লিপিবদ্ধ বয়ান পড়ে ঠিক করলাম আজ এবং এখনই অমিতদের বাড়ি যাব। 'আজকাল'-এর গাড়িতেই বেড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গী হলেন দুই চিত্র-সাংবাদিক ভাস্কর পাল, অশোক চন্দ এবং আমার দেহরক্ষী বঙ্কিম বৈরাগী।

অমিত, ওর মা, বাবা, জেঠু, ঠাকুমা, দাদু ও কিছু পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললাম। ওদের ধারণা, ঘটনাগুলোর পিছনে রয়েছে ভূতের হাত। গতকাল গীতা ও চণ্ডীপাঠ করে গেছেন হাওড়ার দুই পণ্ডিত। তাতে অবস্থার কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি। ভূতের আক্রমণ সমানে চলেছে। দেখলাম দু-বাড়ির জল-পড়া চেয়ার, বিছানা, মেঝে, টেলিভিশন, উঠোন, এমনকি মামার বাড়ির বাথরুমটি পর্যন্ত। বাথরুমের চার দেওয়াল, ছাদ ও দরজা জানালা দেখে নিশ্চিত হলাম, বন্ধ বাথরুমে বাইরে থেকে জল ছুড়ে দেওয়া অসম্ভব। অতএব?

ঠিক করলাম অমিতকে সম্মোহিত করব। তার আগে অমিতের সঙ্গে এটা-ওটা নিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম। অমিত আমার নাম শুনেছে। আমার সম্বন্ধে অনেক খবর জানে। এও জানতে পারলাম আমার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি পড়ে ফেলেছে। গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে, বিশেষ করে গোয়েন্দা কাহিনি ও অ্যাডভেঞ্চার। নিজেও অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালোবাসে।

আমিও আমার ওই বয়েসের গল্প শোনাচ্ছিলাম। কেমনভাবে মায়ের চোখ এড়িয়ে গল্পের বই পড়তে নানা ধরনের পরিকল্পনা করতাম, মা কেমন সব সময় 'পড়-পড়' করে আমার পিছনে টিক্‌ টিক্‌ করে লেগে থাকতেন, সেই সব গল্প। পরীক্ষার রেজাল্ট তেমন জুতসই হত না, আর তাই নিয়ে মা এমন বকাঝকা করতেন যে কি বলবো। একবার মাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। মা মারছিলেন, আমি হঠাৎ একটা চিৎকার করে এমন নেতিয়ে পড়েছিলাম যে মা ভেবেছিলেন মারতে মারতে আমাকে বুঝিবা মেরেই ফেলেছেন। তখন মা'র সেকি কান্না।

আমরা দুজনে গল্প করছিলাম। শ্রোতা আমার তিন সঙ্গী। ইতোমধ্যে ছবি তোলার কাজও চলছিল। যখন বুঝলাম আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখন বলাম, "সম্মোহন তো আমার বইয়ে পড়েছ, নিজের চোখে কখনো দেখেছ?"

অমিত লাফিঠে উঠলো, "আমাকে সম্মোহন করবে?"

সম্মোহন দেখতে রাজি হয়ে অমিত নিজের মনের দুর্বলতা প্রকাশ করতেই বললাম, "বেশ তো, তুমি বিছানাতে শুয়ে পড়।" অমিত শুয়ে পড়লো। বললাম, "এক মনে আমার কথাগুলো শোন।" আমি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'suggestion' দিচ্ছিলাম, সহজ কথায় বলতে পারি, ওর মস্তিষ্ককোষে কিছু ধারণা সঞ্চার করছিলাম। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে অমিত সম্মোহিত হল। ঘরে দর্শক বলতে আমার তিন সঙ্গী। সম্মোহিত অমিত আমার বিভিন্ন

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। আমার বিশ্বস্ত টেপ-রেকর্ডারটা অমিতের বালিশের পাশে শুয়ে এক মনে নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিল। প্রশ্নগুলোর কয়েকটা নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি।

আমি—কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?

অমিত—বাবা।

আমি—জেঠু ভালোবাসেন?

অমিত—হুঁ।

আমি—ঠাকুমা।

অমিত—হুঁ।

আমি—দাদু?

অমিত—হুঁ।

আমি—মা?

অমিত—মাও ভালোবাসে, তবে খুব বকে, খুব মারে।

আমি—তোমার স্কুলের রেজাল্ট কেমন হচ্ছে?

অমিত—মোটামুটি।

আমি—আগে আরো ভালো হতো?

অমিত—হ্যাঁ।

আমি—তোমার মা যে এত বকেন, মারেন, তোমার রাগ হয় না?

অমিত—হয়।

আমি—প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় না?

অমিত—হয়।

আমি—আমার মতো দুষ্টুমি করে মাকে ভয় পাইয়া দাও না কেন?

অমিত—তাই তো দিচ্ছি।

আমি—কেমন করে?

অমিত—জল ভূত তৈরি করে।

আমি—জল লুকিয়ে রাখছ কোথায়?

অমিত—বেলুনে।

আমি—আর ফাটাচ্ছো বুঝি সেপ্‌টিপিন দিয়ে?

অমিত—ঠিক ধরেছেন।

আমি—বেলুন লুকোতে শিখলে কী করে? তুমি তো দেখছি দারুন ম্যাজিসিয়ান।

অমিত—আমাদের স্কুলে সাইন্স ক্লাব আছে। সিনিয়ার স্টুডেন্টরা অলৌকিক-বাবাদের বুজরুকি ফাঁস করে দেখায় বিভিন্ন জায়গায়, নানা অনুষ্ঠানে। ওদের কাছ থেকে আমরা জুনিয়র স্টুডেন্টরাও অনেক খেলা শিখেছি।

জল ভূতের রহস্য ফাঁস হওয়ার পরেও একটু কাজ বাকি ছিল। ছেলেটিকে সাময়িকভাবে তার মানসিক বিষণ্ণতা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। অনিতাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম—স্নেহশীল মায়ের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যাপারে অতি উৎকণ্ঠা বা অতি আগ্রহের ফল সব সময় ভালো হয় না, যেমনটি হয়নি অমিতের ক্ষেত্রে।

সুদীপ ও অনিতার কাছে জল-ভূতের রহস্য উন্মোচন করে বুঝিয়েছিলাম, কেন অমিত এমনটা করল, তার কারণগুলো। স্থায়ীভাবে অমিতকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অমিতের প্রয়োজন মায়ের সহানুভূতি, ভালবাসা।

সেইসঙ্গে সুদীপ ও অনিতাকে বলেছিলাম, জল ভূতের রহস্যের কথা তাঁরা যে জেনে ফেলেছেন, এ কথা যেন অমিতকে জানতে না দেন, কারো কাছেই যেন অমিতের এই দুষ্টুমির বিষয়ে মুখ খুলে অমিতকে তীব্র সমালোচনার মুখে ঠেলে না দেন।

অমিতের মা, বাবার অনুরোধেই 'আজকাল'-এর পাতায় জল ভূতের রহস্য প্রকাশ করা হয় নি। কারণ পত্রিকার প্রতিবেদনে অমিতের নাম গোপন করা সম্ভব ছিল না। অমিতের নাম প্রকাশ করে ওকে মানসিক চাপের মধ্যে ফেলাও ছিল একান্তই অমানবিক।

ঘটনা দুই

আরো একটা সত্যি ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি, শুধু পাত্র-পাত্রীদের নাম গোপন করে।

১২ জানুয়ারি '৯০-এর সন্ধ্যায় আমাদের সমিতির এক সদস্য মৈনাক খবর দিলেন—সত্য গাঙ্গুলীর বাড়িতে কয়েকদিন ধরে অদ্ভুত সব ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটে চলেছে। সত্য গতকাল রাতে মৈনাকের সঙ্গে দেখা করে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সত্য এক বিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসকেরই ভাইপো, আমার সঙ্গে তেমন কোনো পূর্ব পরিচয় না থাকলেও ওই মনোরোগ চিকিৎসক আমার পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়।

ঘটনার যে বিবরণ মৈনাকের কাছ থেকে শুনলাম তা হল এইরকম—

ঘরে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এসে জিনিস-পত্তর পড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ সবার সামনে থেকে জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির অনেকেরই পোশাকে হঠাৎই দেখা যাচ্ছে কিছুটা অংশ খাবলা দিয়ে কাটা। ঘটনাগুলোর শুরু গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ৯ তারিখ থেকে।

পরিবারের সকলেই শিক্ষিত এবং মার্কসবাদী হিসেবে সুপরিচিত। গতকাল রাতে বাড়ির কাজের মেয়ে রেণু হঠাৎ চেতনা হারিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সত্যর বউদি দেখে দৌড়ে গিয়ে পিঠে একটা চড় মারতে মেয়েটি চেতনা ফিরে পায়। তারপরই কেমন যেন একটা ঘরের মধ্যে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সত্য ওঁদের পারিবারিক চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। প্রতিষ্ঠিত ওই চিকিৎসকই নাকি সত্যকে বলেন, 'এটা ঠিক আমার কেস নয়, আপনি বরং প্রবীরদাকে ডাকুন।' তারপরই সত্য আমাকে আনার জন্য মৈনাকের স্মরণাপন্ন হন।

সে রাতেই গেলাম সত্যদের বাড়িতে। সঙ্গে নিলাম মৈনাক, রঘু ও পিনাকীকে। সত্যরা থাকেন দোতলায়।

বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললাম। বাড়িতে থাকেন সত্য, দাদা নিত্য, বউদি মালা, ভাই চিত্ত, দুই বোন রেখা ও ছন্দা, মা অলকা ও কাজের মেয়ে রেণু।

মার বয়েস ৬৫-র কাছাকাছি। ভুতুড়ে কাণ্ডের বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন। স্পষ্টতই জানালেন, 'না, কারুর দুষ্টুমি বা কেউ মানসিক রোগে নিজের অজান্তে এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে বিশ্বাস করি না।' জানালেন, নিজের চোখে দেখেছেন ঠোঙায় রেখে দেওয়া জয়নগরের

মোয়ার মধ্য থেকে মুহূর্তে একটা মোয়াকে অদৃশ্য হতে। সেই মোয়াই আবার ফিরে এসেছে সকলের চোখের সামনে শূন্য থেকে। গত পরশু ওঁরা পরিবারের অনেকে টেলিভিশন দেখছিলেন, হঠাৎই ছাদ থেকে আমাদের সকলের চোখের সামনে মোয়াটা এসে পড়লো। মোয়াটার কিছুটা অংশ দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ধারালো দাঁত দিয়ে মোয়াটা কাটা হয়েছে।

আজই সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ঘটনার যা বর্ণনা দিলেন, সে আরো আকর্ষণীয়। ঘরে টেলিভিশন দেখছিলেন অলকা, ছন্দা, চিত্ত, রেণু ও মালা। হঠাৎই রেণুর হাত থেকে লোহার বালাটা নিজে থেকে খুলে এসে পড়লো মেঝেতে। লোহার বালাটা কালই রেণুকে পরানো হয়েছিল ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে। এই ঘটনা দেখার পর প্রত্যেকেই এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে চার মহিলাই চিত্তর পৈতে ধরে বসেছিলেন এবং পৈতে ধরেই চিত্ত করছিলেন গায়ত্রী জপ। আজই তিনবার রেণুর কানের দুল আপনা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছে।

বউদি মালা জানালেন অনেক ঘটনা। তার মধ্যে আকর্ষণীয় হল, বাথরুম বন্ধ করে স্নান করছেন, হঠাৎ মাথার উপর এসে পড়লো কিছু ব্যবহৃত চায়ের পাতা ও ডিমের খোসা। কাল সন্ধ্যায় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছেলেকে পড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কিছু এসে প্রচণ্ড জোরে তাঁর পিঠে আছড়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখেন শ্যাম্পুর শিশি। শিশিটা থাকে বাইরের বারান্দার র‍্যাকে। সেখান থেকে কী করে বন্ধ ঘরে এটা এসে আছড়ে পড়লো তার যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা তিনি পাননি।

রেখার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তিনিও অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানালেন। তার মধ্যে আমার কাছে যেটা আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, সেটা হল, রান্নাঘরে আটা মেখে রেখেছেন, উঠে দাঁড়িয়েছেন গ্যাসটা জ্বালিয়ে চাটুটা চাপাবেন বলে, হঠাৎ দেখলেন আটার তালটা নিজের থেকে ছিটকে এসে পড়লো রান্নাঘরের দেওয়ালে। না, সে সময় রান্নাঘরে আর কেউই ছিলেন না। রান্নাঘরের বাইরে, কিছুটা তফাতে বারান্দায় বসে কাঁচা-আনাজ কাটছিল রেণু। না, রেণুর পক্ষে কোনো ভাবেই নাকি রেখার চোখ এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আটা ছুড়ে মারা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া আরো একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছেন রেখা। সেখানে রেখা ছাড়া রেণু কেন, কারোরই উপস্থিতি ছিল না।

এবারো ঘটনাস্থল রান্নাঘর। গ্যাসের টেবিলের ওপর একটা ঠোঙায় রাখা ছিল কয়েকটা বিস্কুট। হঠাৎ চোখের সামনে টোঙার মুখ খুলে গেল। একটা বিস্কুট ঠোঙা থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে রান্নাঘরের জানালার শিক গলে বেরিয়ে গেল।

ছন্দার বয়স বছর ষোল। ওর দেখা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছিল, সেটা আজই সন্ধ্যায় ঘটেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল হারমোনিয়াম বাজিয়ে। হারমোনিয়ামের উপর ছিল কয়েকটা স্বরবিতান। ঘরে আর কেউ নেই। হঠাৎ লোডশেডিং। সেই মুহূর্তে তার গায়ের উপর আছড়ে পড়লো হারমোনিয়ামের উপর রাখা স্বরবিতানগুলো। আতঙ্কে ছন্দা চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে-রে?' অমনি গালের উপর এসে পড়লো একটা বিশাল চড়।

রেণুর বয়স বছর ষোল। ওর কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল সেগুলো হল, নিজের হাতের থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে—দেখেছে, কানের দুল হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে—অনুভব করেছে। গত পরশু

একসময় জামা পাল্টাতে গিয়ে দেখে অন্তর্বাসের বাম স্তনবৃত্তের কাছটা গোল করে কাটা। অথচ অন্তর্বাসটা পরার সময়ও ছিল গোটা।

রেখার এক বান্ধবী গীতা থাকেন, মধ্যমগ্রামে। রেখাদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবারের একজনের মতোই। মাসের অর্ধেক দিনই কাটে রেখাদের বাড়িতে। গীতার সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তিনি গত পরশুর একটা ঘটনা বললেন। একটা 'দেশ' সাপ্তাহিক-পত্রিকা পড়েছিল মেঝেতে। হঠাৎ দেশ পত্রিকা মেঝেতে চলতে শুরু করলো। থামল অন্তত হাত চারেক গিয়ে। না, হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। শীতের সন্ধ্যা। ঘরের প্রতিটি জানলা বন্ধ, বাইরের প্রকৃতি স্তব্ধ। ঘরে ফ্যানও চলছিল না। গত কালকের ঘটনাও কম রোমাঞ্চকর নয়। কাল সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখতে পেলেন একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরের মেঝেতে তৈরি হতে শুরু করলো। আতঙ্কিত চোখে দেখলেন কুণ্ডলীটা একটা বেড়াল হয়ে গিয়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল।

ভূতের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল কাপড় কাটা, বাড়ির প্রায় সকলেরই পোশাক, গরম-পোশাক ভূতের কোপে পড়ে কাটা পড়েছে। আমি গোটা চল্লিশেক পোশাক পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটাই প্রায় এক স্কোয়ার ইঞ্চির মতো জায়গা নিয়ে ধারালো কিছু দিয়ে গোল বা ডিম্বাকৃতিতে কাটা। কাটাগুলোরও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। ব্লাউজ, ক্লোক, টপ্ মেয়েদের কামিজের স্তনবৃন্তের কাছে কাটা। চিত্তের পাজামার লিঙ্গস্থানের কাছে কাটা, তবে এই কাটাটা একটু বড়-চার স্কোয়ার ইঞ্চির মতো জায়গা জুড়ে।

ওঁদের সঙ্গেই কথা বলে জানতে পারলাম গীতা গতকাল সকালে সত্য ও রেখাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব জানিয়েছেন—বাড়িওয়ালা এক তান্ত্রিকের সাহায্যে ওঁদের পিছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছে। ভূত তাড়ানো যাবে। তবে যাগযজ্ঞের খরচ খুব একটা কম হবে না। এই বিষয়ে কথা বলার জন্য মা ও বড়দাকে নিয়ে আগামী শনিবার যেতে বলেছেন। বাড়িওয়ালা এ বাড়িতে থাকেন না। থাকেন বৃহত্তর কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে। আর এ বাড়িটা বৃহত্তর কলকাতার উত্তর প্রান্তে, দমদমে।

বাড়ির তিন ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক ভুতুড়ে ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটার সময় তাঁরা ছাড়াও বাড়ির কেউ না কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল বা ছিলেন।

পুরো বিষয়টা নিয়ে ভালোমতো আবার নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাচ্ছি, পাঁচজন মহিলা স্পষ্টতই দাবি করছেন, তাঁরা এক বা একাধিক ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটতে দেখেছেন। ঘটনাগুলো ঘটার সময় আর কেউই সেখানে ছিলেন না। অর্থাৎ কি না, বাস্তবিকই ভুতুড়ে ঘটনা।

এবার এঁদের কথাগুলোর ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। এঁদের মধ্যে সম্ভবত একজন ইচ্ছে করে অথবা নিজের অজান্তে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছেন। বাকি চারজন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছেন—এ বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে। এই একান্ত বিশ্বাস থেকে তাঁরা হয়তো ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাতীয় কিছু দেখেছেন। 'দেশ' সাপ্তাহিক যেন নড়েছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেকেই ভুতুড়ে ঘটনার একক প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার লোভে কাল্পনিক গপ্পো ফেঁদেছেন। সাধারণভাবে মানুষের কোনো বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার মধ্য দিয়ে লোকেদের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার একটা লোভ থাকে। এক্ষেত্রে সম্ভবত তেমনই কিছু ঘটেছে।

অবশ্য এমনটাও অসম্ভব নয়, শুরুতে একজন মস্তিষ্ক কোষের বিশৃঙ্খলার দরুন নিজের অজান্তে ভুতুড়ে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং এই মানসিক রোগই সংক্রামিত হয়েছে আরো এক বা একাধিক মহিলার মধ্যে।

উপায় একটা আছে, তবে সময়সাপেক্ষ। যে পাঁচজন মহিলা এককভাবে ভুতুড়ে কাণ্ডের দর্শক ছিলেন বলে দাবি করছে ও করছেন তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে সত্যি বলানো।

নিত্য ও সত্যকে বললাম, "আপনারা সহযোগিতা করলে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারি। তবে আজই ভূতের অত্যাচার বন্ধ হবে, এমন কথা বলছি না। মালা, রেখা, ছন্দা, রেণু ও গীতাকে সম্মোহন করে বাস্তবিকই ভুতুড়ে ব্যাপারগুলো কীভাবে ঘটছে সেটা জেনে নিতে চাই। আশা রাখি, অবশ্যই আসল সত্যটুকুক ওঁদের কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব। কী করে ঘটছে জানতে পারলে, ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে আর যেন না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হবে না। আজ আমি একজন সম্মোহন করবো। এমন হতে পারে বাকি চারজনকে সম্মোহন করতে আরো চারটে দিন আমাকে আসতে হবে।"

প্রথম যাকে সম্মোহন করার জন্য বেছে নিলাম, সে রেণু। রেণুর গায়ের রঙ মাজা, মোটামুটি দেখতে, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, রেণুকে সম্মোহন করতে রেণুর সহযোগিতাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রেণুর অনুমতি নিয়েই ঘরে রাখলাম আমাদের সমিতির সদস্য মৈনাক, রঘু ও পিনাকীকে। উদ্দেশ্য, ওদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং সাক্ষী রাখা।

রেণুকে বললাম, সম্মোহন দেখেছ?

রেণু—শুনেছি ম্যাজিশিয়ানরা সম্মোহন করে ম্যাজিক দেখায়। আমি একটা কয়েনকে হাত সাফাই করে দুই-তিন-চার করে বাড়াতে শুরু করতেই বুঝলাম রেণুকে এবার সম্মোহন করা যাবে। ওকে বললাম, এবার বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে একমনে আমার কথা শুনতে থাক। তারপর দারুণ মজার একটা ম্যাজিক দেখাবো।

রেণুকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাজেশন দিতে লাগলাম বা ওর চিন্তায় ধারণা সঞ্চার করতে লাগলাম। শুরু করেছিলাম এই বলে, "তোমার ঘুম আসছে। একটু একটু করে চোখের পতাগুলো ভারি হয়ে আসছে। ঘুম আসছে।" পরে সম্মোহন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাব, তাই এখানে সম্মোহন বিষয়ে আলোচনায় গেলাম না। একসময় রেণুর বন্ধ চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও এখন সম্মোহিত। চোখের পাতার নিচে মণি দুটো এখন স্থির।

টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম। শুরু করলাম প্রশ্ন। উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল রেণু। ঘুম ঘুম অবস্থায় জড়িয়ে কথা বলছিল।

আমি—তোমাকে বাড়ির সকলে ভালোবাসে? নাকি কেউ কেউ তোমাকে মোটেই পছন্দ করে না?

রেণু—বাড়ির সকলেই ভালোবাসে।

আমি—আমি তোমাকে একটা করে নাম বলছি, তুমি বলে যাবে তারা ভালোবাসে কি না? দিদা?

রেণু—ভালোবাসে।

আমি—নিত্যদা?

রেণু—ভালোবাসে।

আমি—বউদি?

রেণু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। আবার জিজ্ঞেস করলাম—বউদি?

রেণু—হ্যাঁ, ভালোইবাসে।

বুঝলাম, রেণু বউদিকে তেমন পছন্দ করে না।

আমি—রেখাদি?

রেণু—ভালোবাসে।

আমি—ছন্দা?

রেণু—ভালোবাসে।

আমি—চিত্তদা?

রেণু—চিত্তদা, চিত্তদা, চিত্তদা, সুজাতাকে ভালোবাসে।

আমি—তুমি চিত্তদাকে ভালোবাস?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদাকে খুব ভালোবাস?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদার পাজামাটার ওইরকম জায়গাটা কাটলে কেন?

রেণু—বেশ করেছি।

আমি—বেশ মজাই হয়েছে। চিত্তদার উপর একচোট শোধ তুলে নিয়েছ। তুমি কী দিয়ে ওদের সব জামা-কাপড়গুলো কেটেছো? ব্লেড দিয়ে?

রেণু—না, কাঁচি দিয়ে।

আমি—ওরা কেউ তোমাকে সন্দেহ করেনি?

রেণু—না।

আমি—তুমি আজ সন্ধ্যায় লোডশেডিং-এর সময় ছন্দাকে চড় মেরেছিলে?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমিই মোয়া সরিয়ে পরে খাওয়া মোয়াটা ফেলেছিলে?

রেণু—হ্যাঁ।

আমি—মাখা আটা রান্না ঘরের দেওয়ালে কে ছুড়েছিল?

রেণু—আমি।

আমি—বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা ছুড়ে মেরেছিলে?

রেণু—না।

আমি—তবে, কী করে বন্ধ বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা পড়লো?

রেণু—আমার মনে হয় বউদি নিজেই করেছে। ও খুব মিথ্যেবাদী।

আমি—আর বউদিকে শ্যাম্পুর কৌটো ছুড়ে মারা?

রেণু—ওটা আমিই করেছিলাম।

আমি—বউদি বলছিলেন ঘর বন্ধ ছিল।

রেণু—মিথ্যে কথা।

আমি—তোমার হাত থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু করে নিজে থেকেই বেরিয়ে আসছিল, অনেকে নাকি দেখেছেন? ব্যাপারটা কী বলতো।

রেণু—আমিই চুড়িটা খুলে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম—আরে আরে চুড়িটা নিজে থেকেই হাত থেকে খুলে বেরিয়ে এলো। ওরা সকলেই টিভি দেখছিল। আমার কথায় মেঝের দিকে তাকায়। চুড়ি পড়ে থাকতে দেখে সকলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আমি—ওদের ভয় দেখাতে তোমার ভালো লাগছে?

রেণু—মজা লাগছে।

রেণুর সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধে হয়নি চিত্তকে ওর ভালো লাগে। চিত্তকে ঘিরে ও অনেক কথাই বলেছিল, যার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে সেটা শুধু চিত্ত ও রেণুই জানে। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি রেণুর অতৃপ্ত প্রেম, তার অবদমিত যৌন আবেগ মস্তিষ্ককোষের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিণতিতে বিভিন্নজনের এবং নিজের পোশাকের যৌনস্থান ঢাকা পড়ার জায়গাগুলোয় কাঁচি চালিয়েছিল।

এটুকু জানান বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, রেণুকে বলেছিলাম, আর এমনটা করলে ওকে পুলিশে দেব। রেণুকে সামাল দিতেই ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার বন্ধ হয়ে যায়। এই একই সঙ্গে আরো জানাই, ওই পরিবারের যাঁরা এককভাবে ভূতদর্শী ছিলেন, তাঁরাও পরবর্তী পর্যায়ে আমার সাথে কথা বলতে গিয়ে আগের ভূত দেখার দাবিগুলোকে হয় এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন, নয় স্বীকার করেছেন বলার সময় কিছু রঙ চড়িয়ে ফেলেছিলেন।

চিত্তর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছিলাম। জানিয়ে ছিলাম, রেণু সমস্ত বলেছে। সব কথাই টেপে ধরা আছে। তুমি আর এক বারের জন্যেও রেণুর সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলো না। রেণু তোমার-সুজাতার ব্যাপারটা জানে। তাইতেই তোমার ওপর শোধ তুলতেই ভুতুড়ে ব্যাপারগুলো ঘটাচ্ছিল। রেণু কথা দিয়েছে তুমি ওকে নিয়ে খেলা না করলে ও আর ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটাবে না।

অধ্যায় : নয়

প্ল্যানচেটে যে আত্মা আনা হয়, তা কি স্বসম্মোহন বা সম্মোহনের প্রতিক্রিয়া?

একটা ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সেটা ঘটেছিল ১৬ মে, ১৯৯২। গিয়েছি পাক্ষিক পত্রিকা 'সানন্দা'র দপ্তরে। কথা প্রসঙ্গে সম্পাদক সহযোগী দীপান্বিতা ভট্টাচার্য জানালেন—আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনি হবে প্ল্যানচেট নিয়ে। তুমি তো প্ল্যানচেটে বিশ্বাসই করো না, বিশ্বাস করো না প্ল্যানচেটে আত্মা আসে, তারা উত্তর দেয়। আমরা প্ল্যানচেটে বিশ্বাসীদের কথাই এবার হাজির করব। তাই সংখ্যাটা প্ল্যানচেট নিয়ে হলেও এই ব্যাপারে তোমার কোনো সাহায্য নিচ্ছি না।

বললাম—কে বলল তোমাকে, আমি বিশ্বাস করি না? আমি নিজে বিভিন্ন প্ল্যানচেটের আসর বসিয়ে দেখেছি, কি অদ্ভুতভাবে মিডিয়ামদের হাত দিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে আসে।

—তুমি নিজের করে দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—করে দেখাতে পারবে?

—নিশ্চয়ই।

—কবে দেখাবে? দু'চার দিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা কর, তা হলে এই ইস্যুটাতেই ম্যাটারটা দিতে পারি।

—আজই দেখাতে পারি।

—কোথায় দেখাবে?

—তোমাদের অসুবিধে না থাকলে এখানেই।

—কখন দেখাবে?

—এখুনি।

অমনি মুহূর্তে সাজ–সাজ রব পড়ে গেল। সানন্দার সম্পাদকের (তখন সম্পাদক ছিলেন অপর্ণা সেন) ঘরেই প্ল্যানচেটের আসর বসানো হবে ঠিক হল। মুহূর্তে ছোট ঘরটি ভর্তি হয়ে গেল সানন্দার সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক ও সম্পাদক সহযোগীদের ভিড়ে।

মিডিয়াম কে হবেন? এগিয়ে এলেন নিবেদিতা মজুমদার। কার আত্মাকে ডাকা হবে? ঠিক হল উত্তমকুমারের আত্মাকেই ডাকা হবে। সকলেই ব্যস্ত মানুষ। তাড়াতাড়ি উত্তর জানতে আগ্রহী। ঠিক হল, দর্শকরা প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরগুলো আসবে 'হ্যাঁ' ও 'না'র মধ্য দিয়ে। একটা সাদা কাগজে একটা বৃত্ত আঁকলাম। তারপর গোটা বৃত্ত জুড়ে, পরিধি ছুঁয়ে এঁকে ফেললাম একটা যোগ চিহ্ন। বৃত্তটার চার ভাগের দুই বিপরীত দিকে লিখলাম 'হ্যাঁ' অপর দুই বিপরীত দিকে 'না'। তারপর চেয়ে নিলাম একটু সুতো ও একটা আংটি। আংটিতে বেঁধে ফেললাম সুতো। এবার বৃত্ত আঁকা কাগজটা টেবিলে পেতে টেবিলের দুপ্রান্তে মুখোমুখি বসলাম আমি ও নিবেদিতা। আমার কথামতো নিবেদিতা তাঁর ডান হাতের কনুইটা টেবিলে রেখে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আংটিবাঁধা সুতোটাকে এমনভাবে ধরলেন, যাতে আংটিটা ঝুলে রইল যোগ চিহ্নের কেন্দ্রে অর্থাৎ বৃত্তেরও কেন্দ্রে।

এবার শুরু হল প্ল্যানচেটের দ্বিতীয় বা শেষ পর্যায়। প্রত্যেককে চুপ করতে বললাম। নিস্তব্ধ ঘর। ঘরে গোটাকয়েক ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া হল। কথা বলছিলাম শুধু আমি—নিবেদিতা, এক মনে ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের কথা। গভীরভাবে ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের কথা। ভাবতে থাকুন উত্তমকুমারের আত্মা আসছে। উত্তমকুমারের আত্মা এলে আংটিটা আপনা থেকে দুলতে থাকবে—'হ্যাঁ' লেখাকে নির্দেশ করে দুলতে থাকবে।

দু'মিনিটও কাটল না, আংটি কেঁপে উঠল, তারপর দোলা শুরু করল। দুলতে লাগল 'হ্যাঁ' শব্দ দুটির দিকে। এরপর শুরু হল দস্তুর মতো প্রশ্নবাণ। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও মিলছে 'হ্যাঁ' বা 'না'। একাধিক হাতের ছোট্ট খাতায় খস্‌খস্ করে লেখা হচ্ছে প্রশ্ন ও উত্তর। ছবি তোলা চলছে। একসময় নিবেদিতার চোখ বুজে এল। নিবেদিতা এলিয়ে পড়ার আগে ধরে ফেললেন সুদেষ্ণা রায়। আমি গম্ভীর, মৃদু ও টানা-টানা সুরে বলতে লাগলাম—নিবেদিতা, এক মনে শুধু আমার কথা শুনতে থাকুন। উত্তমকুমারের আত্মা চলে গেছে। আপনি জেগে উঠছেন। আপনি জেগে উঠছেন। চোখ খুলুন। একটু একটু করে চোখ খুলুন।

চোখ খুললেন নিবেদিতা। বললেন, খুব ঘুম পাচ্ছে। অনিরুদ্ধ ধর ও শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দৌড়োলেন নিবেদিতার জন্য গরম দুধের পরিবর্ত হিসেবে গরম চা আনতে।

উপস্থিত সবার আগ্রহ তখন তুঙ্গে। তাঁরা আবার প্ল্যানচেটের আসর বসাতে চাইলেন। মিডিয়াম হিসেবে চাইলেন সুদেষ্ণাকে। সুদেষ্ণা ওঁদের চোখে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না মানুষ। মজা ভালোই!

সুদেষ্ণা বসলেন। ঠিক হল সত্যজিৎ রায়ের আত্মাকে আনা হবে। নিবেদিতার সময় যা যা ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। আবার প্রশ্নমালা। এমন অনেক প্রশ্ন এল, যেগুলো কৌতূহল থেকেই উঠে আসা কিন্তু কখনই লেখায় প্রকাশ করা যায় না, প্রশ্নোত্তর পালা শেষ হতেই দীপান্বিতা বললেন—আত্মাকে দিয়ে রাইটিং-প্যাডে লেখানো যায় না?

বললাম—কেন যাবে না, নিশ্চয়ই যায়।

রাইটিং প্যাড এল। ডট্‌পেন এল। এবারো সুদেষ্ণাই মিডিয়াম। আহ্বান করা হল রাজীব গান্ধীর আত্মাকে। এবারো মিনিট দুয়েক লাগল। কাঁপতে লাগল সুদেষ্ণার হাতের ডট্‌পেন।

এবার ইংরেজিতে প্রশ্ন—রাজীব, আপনি কি এসেছেন? উত্তর এল—Yes. তারপর উত্তেজিত প্রশ্ন একের পর এক আসতেই লাগল। ডট্‌পেন রাইটিং প্যাড থেকে না তুলে কাঁপা কাঁপা লেখায় উত্তর দিয়েই চললেন সুদেষ্ণা রায়।

উত্তরপর্ব শেষ হতে ওঁদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার উত্তেজনার আগুনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেললাম—এতক্ষণ যা হল সেটা আদৌ প্ল্যানচেট নয়, সম্মোহন। উত্তরগুলো আত্মা দেয়নি, দিয়েছে দুই মিডিয়ামের অবচেতন মন। আমি যখন প্ল্যানচেটে আত্মা এনে দেখাবার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছি, তখন দুই মিডিয়ামই আমার কথায় প্রভাবিত হয়েছেন। প্রভাবিত হয়েছিলেন প্ল্যানচেটের আসরকে যেভাবে সাজিয়েছিলাম, যেভাবে পরিবেশটা তৈরি করেছিলাম, তার দ্বারাও। সবচেয়ে বড় কথা নিবেদিতা ও সুদেষ্ণা সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন বা এই নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন। 'আত্মা মরণশীল' যুক্তি ও বিজ্ঞানের সূত্র ধরে আসা প্রত্যয় তাঁদের চিন্তাতে দৃঢ়বদ্ধ থাকলে কখনো অলীক আত্মা তাঁদের উপর ভর করত না, যে ভরটা অবশ্যই একটা মানসিক অবস্থামাত্র—এর বাড়তি কিছু নয়। 'ভূতে ভর', 'জিনে ভর' বা 'মনসার ভর' ইত্যাদির জন্য কখনই ভূত, জিন বা মনসার বাস্তব অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় সচেতন বা অচেতন মনের গভীরে ভূত, জিন, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা দ্বিধার—"এদের বাস্তব অস্তিত্ব থাকলে থাকতেও বা পারে"। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসটা কোনো 'আনস্মার্ট' হওয়ার ব্যাপার নয়। একটি মানুষ ছোটবেলা থেকে আত্মীয়-বন্ধু-শিক্ষক-বইপত্তর থেকে একটু একটু করে শিখেছেন, বিশ্বাসকে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে স্থান দিয়েছেন—আত্মা অমর; এই বিশ্বাসের সঙ্গে স্মার্ট বা আনস্মার্ট হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

আমার প্রতি বিশ্বাস, আমি আত্মা এনে দেখাব—এই কথায় দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং পরিবেশগতভাবে ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা আত্মার প্রতি বিশ্বাস বা আধা বিশ্বাস এই তিনের প্রভাবের ফলে আমি সহজেই নিবেদিতা ও সুদেষ্ণার মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে ধারণা সঞ্চার করতে পেরেছি। আমি যে কথাগুলো ওঁদের বলেছি সেই কথাগুলোকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'suggestion' বা 'নির্দেশ' অথবা 'ধারণাসঞ্চার'। Suggestion বা ধারণাসঞ্চার সম্মোহনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত বা আবশ্যিক প্রথম ধাপ। আত্মা আসছে—আমার এই সঞ্চারিত ধারণার প্রভাবে তাঁরা সম্মোহিত অবস্থায় নিজেদের অজ্ঞাতে উত্তর দিয়ে গেছেন।

এরপরই যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক—সেটা হল, তা হলে কি ধরে নেব, প্ল্যানচেটের আসরে সম্মোহনবিদের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয়?

না, না, আদৌ তা নয়। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কেউ যদি সেইসঙ্গে বিশ্বাস করে বসেন—এই পদ্ধতিতে প্ল্যানচেটে আত্মা আনা সম্ভব, তবে সেই পদ্ধতি পালন করলে নিজের অজ্ঞাতে নিজের মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষে নির্দেশ পাঠান। যাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'স্বনির্দেশ' বা 'auto-suggestion'। নিজের অজ্ঞাতে সম্মোহিত হয়ে আত্মা তাঁর উপর ভর করেছে বলে বিশ্বাস করে বসেন। ফল নিজের অজান্তেই উত্তর দিতে থাকেন, যেগুলো সাধারণ চোখে অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা বলেই মনে হয়।

পর্ব : দুই

সম্মোহনের ইতিহাস ও নানা মানসিক রোগ

অধ্যায় : এক

সম্মোহনের বিজ্ঞান হয়ে ওঠার ইতিহাস

শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে 'বিশ্বদর্শন' করিয়েছিলেন—তা কি সম্মোহন ছিল? হিটলার যে একটা গোটা জাতিকে হিস্টিরিক করে তুলেছিলেন জাতিকে তাঁর একান্ত বাধ্য করে তুলেছিলেন, তাকে কি হিটলারের সম্মোহন শক্তি বলা যায়? রজনীশ কি তার চোখ ও কথা দিয়ে মানুষকে সম্মোহন করে রাখতেন? আমরা যে অভিনয় দেখতে দেখতে হাসি, কাঁদি, ক্রুদ্ধ হই, উত্তেজিত হই, তাকে কি অভিনেতার সম্মোহনী শক্তি বলবো? মহরমে বা চরকে ভক্তরা যে নিজেদের শরীরকে কষ্ট দেয় কিন্তু কষ্ট অনুভব করে না—এর কারণ কি সেই সময় তারা আত্মসম্মোহিত থাকে?

শ্রীকৃষ্ণ–অর্জুন মহাভারতের দুটি চরিত্র। দুটি চরিত্র–ই কাল্পনিক। সুতরাং বিশ্বদর্শনের গল্পটা সরিয়ে রেখে বাকি ঘটনাগুলো সম্পর্কে বলতে পারি—হ্যাঁ প্রত্যেকটি ঘটনাই সম্মোহন বা আত্মসম্মোহনের উদাহরণ।

যিশু ছিলেন ভবঘুরে মানুষ। গরিব ঝুপড়িবাসী রোগীদের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতেন। হাত বুলিয়ে দিতেন তাদের সারা শরীরে। মানসিকভাবে রোগীদের উপসর্গের অনেকটাই কমে যেত। যেমন সহানুভূতিসম্পন্ন সুন্দর ব্যবহার করা ডাক্তার ঘরে ঢুকলেই রোগী অনেকটাই সুস্থ মনে করে—তেমনটা। এতো জেনে বা না জেনে সম্মোহন।

নবী মুহাম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে ও জিহাদে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করবে। 'জিহাদ' হল অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত করার জন্য সহিংস আক্রমণ। জিহাদে প্রাণ গেলে সে সরাসরি বেহেস্তে যাবে। তার জন্য অপেক্ষা করবে সুন্দরী চিরযৌবনা যুবতী থেকে আরো নানা ভোগের সামগ্রী। তাঁর অনুরাগীরা সম্মোহিত হয়ে এসবে বিশ্বাস করেছিলেন।

প্রাচীনযুগে ভারত, চীন ও গ্রিসে সভ্যতার আদিপর্বে ধর্মগুরুরা সাধারণ নাগরিক থেকে রাজা–মন্ত্রী–সেনানায়ক–আমলাদের ভয় ও ভক্তি আদায় করেছিল। তখন চিকিৎসক ছিলেন ধর্মগুরুরা। তাঁরাই মন্ত্র–তন্ত্র–পুজো–জাদুবিদ্যা ইত্যাদি মিশিয়ে চিকিৎসা করতেন। অথর্ব বেদে সম্মোহনের উল্লেখ দেখতে পাই। মহাভারতেও সম্মোহনের প্রয়োগের উল্লেখ আছে।

প্রাচীনযুগে সম্মোহনের যে মর্যাদা ছিল মধ্যযুগে সেই মর্যাদা হারিয়ে সম্মোহন হয়ে দাঁড়ায় 'ব্ল্যাক-ম্যাজিক' বা ডাকিনীবিদ্যা। কাপালিকা বা তান্ত্রিকরা ইচ্ছে করলেই তাদের সম্মোহন শক্তির দ্বারা ক্ষতি করতে পারে, এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার বশে আজো অনেকেই এদের সযত্নে এড়িয়ে চলেন।

সম্মোহনের নানা মত

'সম্মোহন'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'হিপ্নোটিজম্' (Hypnotism)। 'হিপনোটিজম্' কথাটি আবার এসেছে 'হিপ্নোসিস্' (Hypnosis) কথা থেকে। 'হিপ্নোসিস্' কথার অর্থ 'ঘুম'। স্বাভাবিক ঘুমের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও 'সম্মোহন ঘুম' আর 'স্বাভাবিক ঘুম' এক নয়, কারণ অ-সাদৃশ্যও কম নয়। তবে এটা বলা যায়, সম্মোহন জেগে থাকা ঘুমের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা।

আধ্যাত্মিকতাবাদ ও জাদুবিদ্যার কবল থেকে মনোবিজ্ঞানকে মুক্ত করে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত করতে প্রচুর বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। সম্মোহনের ক্ষেত্রে এই বাধা ছিল আরো বহুগুণ বেশি। কারণ, এখানে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার।

ডা. ফ্রাঞ্জ আন্তন মেসমার (Dr. Franz Anton Mesmer)

আধুনিক যুগের সম্মোহনের সূচনা করেন জার্মান চিকিৎসক ডা. মেসমার। জন্ম ১৭৩৪ সালে। কৈশোর ও যৌবনে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের শরীর ও মনের ওপর গ্রহ-নক্ষত্র এবং চুম্বকের প্রভাব আছে। হিস্টিরিয়া, ভর হওয়া রোগীদের সংখ্যা সে-সময় যথেষ্টই ছিল। মেসমার এইসব রোগীদের সাজেশন দিতেন অর্থাৎ তাঁদের মনে ধারণা সঞ্চার করতেন, 'তাঁরা ভালো হয়ে উঠছেন'। পাশাপাশি শরীরে নানা আকারের চুম্বক বসিয়ে দিতেন। মেসমার বলতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক ধরনের তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই পদার্থ মানবদেহেও প্রবাহিত হচ্ছে। ডা. মেসমার এই প্রবাহের নাম দিয়েছিলেন animal magnatism। মানুষের দেহে এই প্রবাহে কোনো ধরনের ভারসাম্যের অভাব হলে অসুখ হয়। প্রবাহের ভারসাম্য ঠিক করে দিলেই রোগ সেরে যায়।

ডা. মেসমার তাদেরই চিকিৎসা করতেন যারা মানসিক রোগী। মানসিক রোগীকে আরাম করে চেয়ারে বসার ব্যবস্থা করতেন। শরীরের কোনো কোনো অংশে বেঁধে দিতেন চুম্বকের টুকরো। ঘর থাকতো আলো-আঁধারে ঢাকা। রোগী যে চেয়ারে বসতেন, তাঁর উল্টো দিকের একটা আরাম চেয়ারে বসতেন মেসমার। মেসমার রোগী বা রোগিণীর হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসতেন। রোগীকে সাজেশন দিতেন রিল্যাকসেশনের। তারপর একসময় সাজেশন দিতেন—তোমার ভালো লাগছে। শরীরের অসুবিধে এখন নেই। ভালো আছো...ভালো থাকবে ইত্যাদি। এই সময় মেসমারের আঙুলগুলো রোগীণির শরীরের নানা অংশে বোলাতেন।

হিস্টিরিয়া রোগিণীর সংখ্যা সে যুগ থেকে এ যুগে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং মেসমারের কাছে রোগীর চেয়ে রোগিণি আসতেন অনেক বেশি। এবং এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ের তরুণী। ফলে নিন্দুকেরা মেসমারের নিন্দে করার সুযোগ

পেয়েছিল। তবে এও সত্যি—মেসমার কিছু মানসিক রোগী ও রোগিণীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তাদের অনেকেই মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে ভুগতেন। মেসমার কথার জাদুতে তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। ফলে তারা মেসমারের সাজেশনে সুস্থ হয়ে উঠতেন।

ডা. মেসমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, তিনি প্রতারণা করছেন। ডা. মেসমার চলে আসেন প্যারিসে। সময়টা ছিল ১৭৭৮ সাল। এই সময় প্যারিসে তখন বিদ্বজনের পাশাপাশি রমরমা ছিল জ্যোতিষী থেকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের। এমন এক বিচিত্র সময়ে বিচিত্র চিকিৎসার জমজমাট ব্যবসা খুলে বসলেন বিশাল ধনী ডা. মেসমার। এখানে তিনি গ্রুপ থেরাপি বা গণসম্মোহন করতে লাগলেন। এক একটা গ্রুপে পনেরো থেকে কুড়িজন রোগী-রোগিণী থাকতেন। বড় একটা হলঘরে রোগীরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াতেন, ঘরের মেঝে ছিল পুরু গদিতে মোড়া। দেওয়াল মোড়া বড় বড় আয়নায়, ঘরের মাঝখানে একটা বড় গামলায় চুম্বক ডুবিয়ে রাখা হতো। গামলার জলের থেকে মাথা উঁচু করে থাকত কয়েকটা ধাতুর রড। রডের সঙ্গে জড়ান থাকত পনের-কুড়িটা ধাতুর তার। সেই তার ছোঁয়ানো হতো রোগীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে। এই গণসম্মোহন চলাকালীন সুন্দর মিউজিক বাজানো হত হালকা সুরে। ডা. মেসমার সাজেশন দিতে থাকেন। **এই সম্মোহন চিকিৎসার নাম ছিল 'মেসমারিজম'**।

ডা. মেসমারের জনপ্রিয়তার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকরা নিজেদের ও বিজ্ঞানের বিপদ দেখতে পেলেন। তাঁরা রাজা ষোড়শ লুইয়ের কাছে দরবার করলেন। রাজা ১৭৮৪ সালে একটা কমিশন তৈরি করলেন। এঁদের উপর দায়িত্ব দিলেন ডা. মেসমারের প্রাণী-চুম্বকত্বের তত্ত্বের সত্যতা নির্ধারণ করতে। কমিশন পর্যবেক্ষণের পর ডা. মেসমারের তত্ত্ব বাতিল করে দেন। কমিশন বলেন, বহু ধরনের রোগ আছে, যা শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে আপনা-আপনি সেরে যায়। আর সেরেছে সেই সব শারীরিক রোগ যা মানসিক কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলো সেরে ওঠার পিছনে ছিল ডা. মেসমারের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। এঁরা কেউই

প্রাণী–চুম্বকত্বের কারণে সুস্থ হয়নি। আর কিছু রোগী সুস্থ হয়েছেন ডা. মেসমারের সাজেশন দেওয়ার ক্ষমতায় বা রোগীদের মনে ধারণা সঞ্চারের কারণে।

কমিশন তৈরি হয়েছিল তিনজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে নিয়ে। তাঁরা হলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (কমিশনের চেয়ারম্যান) এবং আন্তন ল্যাভয়েসিয়র এবং ডা. গিলোটিন (যিনি গিলোটিন–এর স্রষ্টা)। ওঁরা পরিষ্কার সাদা জলকে চুম্বক ডোবান জল বলে তাতে ডোবান ধাতুর দণ্ড থেকে ধাতুর তার নিয়ে রোগীদের ছুঁইয়ে সাজেশন দিতেই রোগীদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন। এ–সবই ছিল রোগীদের মধ্যে সঞ্চারিত ধারণার ফল।

ডা. জন এলিটসন (John Ellitson)

জন্ম ১৭৯১ সালে ইংলন্ডে। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন মেডিসিনের অধ্যাপক। এই সময় তিনি বহু মৃগীরোগী (epilepsy), হিস্টিরিয়া রোগী, মানসিক কারণে হাঁপানি, মানসিক কারণে তোতলা ও শরীরের কোনো অঙ্গের অসারতার রোগীকে সম্মোহন করে সাজেশন দিয়ে সারিয়ে তোলেন।

তিনি মনে করতেন, সাইকোসোমাটিক ডিজিজের ক্ষেত্রে সম্মোহন খুবই কার্যকর। এমনকি যে কোনো রোগের বেলাতেই রোগীর মানসিক শক্তি জোগাতে সম্মোহন তুলনাহীন।

জেমস্ ব্রেইড্ (James Braid)

'মেসমারিজম'–এর অবৈজ্ঞানিক অংশকে বাদ দিয়ে, ওই তত্ত্বের 'সাজেশন' বা 'রোগীর উপর ধারণা সঞ্চার' বিষয়টিকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন জেমস্ ব্রেইড। **তাঁর হাত ধরেই সম্মোহন বিদ্যা আধুনিক যুগে পা রাখে।**

ব্রেইডের জন্ম ১৭৯৫ সালে স্কটল্যান্ডে। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক।

১৮৪১ সালের ঘটনা। ফ্রান্সের একজন মেসমারিজম নিয়ে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে মেসমারিজম–এ সাজেশনের কার্যকর ভূমিকা দেখে ব্রেইড বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে আগ্রহী হন।

দীর্ঘ পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি কিছু সিদ্ধান্তে হাজির হন। তিনি মেসমারের

magnetic-fluid (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রবাহিত তরল চুম্বক তত্ত্ব) বাতিল করে দেন ১৮৪৭ সালে। তিনি বলেন, গভীর মনোসংযোগ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি 'সাজেশন' শুনতে থাকলে তার মধ্যে শারীরিকগত ও আচরণগত কিছু পরিবর্তন ঘটে।

এই সাজেশন পদ্ধতির সাহায্যে গভীর মনোসংযোগকারী আধাঘুম-আধাজরগরণের এক অবস্থায় চলে যায়। এই পদ্ধতিকে আমরা Mesmorism না বলে Hypnotism (হিপনোটিজম) বলব। মেসমারের নামে যে তত্ত্ব রয়েছে, তাতে কিছু ভুল ও কিছু ঠিক তত্ত্ব আছে। ভুল তত্ত্বকে ছেঁটে ফেলতে হলে শব্দটাকেও বাতিল করতে হয়।

মেসমার রোগীকে যে সাজেশন দিলেন তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি জেনে বা না জেনেই সাজেশন দিতেন। আর সাজেশনের চেয়ে অনেক বেশি যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতেন, সেই চুম্বক ছিল একেবারেই ভূমিকাহীন।

সাজেশনে রোগীদের যে আধাঘুম–আধাজাগরণ অবস্থা তৈরি হয় তাকে 'ঘুম' বা হিপানোসিস–ই বলব। 'হিপানোসিস' একটা গ্রিক শব্দ যার মানে 'ঘুম'। এসবই বললেন ব্রেইড।

ডা. জেমস ব্রেইড–এর মতে :

* সম্মোহিত অবস্থায় আনার জন্য সাজেশন দেওয়ার ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে এক ধরনের পরিবর্তন আসে। একে বলতে পারি মানসিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সাধারণ ঘুমে দেখা যায় না।

* অপারেশনের আগে রোগীকে যদি সাজেশন দেওয়া হয় যে তার শরীরের ওই বিশেষ অংশ অবশ হয়ে গেছে, ব্যথা–যন্ত্রণা হচ্ছে না—তবে অনেক সময়ই দেখা যায় শরীরের ওই অংশ অবশ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় অপারেশন করলে রোগী ব্যথা অনুভব করে না অথবা খুব সামান্য ব্যথা অনুভব করে।

* রিল্যাকসেশন–এর সাজেশন দিয়ে একজন মানুষের নাড়ির স্পন্দন বা ব্ল্যাডপ্রেশার কন্ট্রোল করা যায়।

* হিস্টিরিয়াসহ বিভিন্ন স্নায়ুরোগ সম্মোহনের সাহায্যে সারিয়ে তোলা যায়।

* মানসিক কারণে শরীরের নানা ধরনের রোগ যথা কোনো অঙ্গের অবশতা, যন্ত্রণা ইত্যাদি সারিয়ে তোলা যায়।

জঁা মার্টিন সার্কো (Jahn Martin Charcot)

ডা. ব্রেইড–এর সঙ্গে এক নিশ্বাসে আর একজন স্নায়ুরোগ চিকিৎসকের নাম করতে হয়, তিনি হলেন ডা. জঁা মার্টিন সার্কো। এইজন্য ডা. ব্রেইডের সঙ্গে শার্কোর নাম উচ্চারণের দাবি রাখে, কারণ তাঁর কাছে স্নায়ুরোগ বিষয়ে হাতে–কলমে শিখতে হাজির হয়েছিলেন ডা. বার্নহিম, ডা. পিয়ারে জ্যানে, ডা. সসমান্ড ফ্রয়েড–এর মতো বিখ্যাত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা।

ডা. শার্কোর জন্ম ১৮২৫ সালে। তিনি প্যারিসের একটি হাসপাতালে ও নিজের ক্লিনিকে চিকিৎসা করতেন। দূরদূরান্তের স্নায়ুরোগীরা আসতেন। তাঁদের মধ্যে বেশকিছু মৃগীরোগী (epilepsy) ও বায়ুরোগী বা মূর্ছারোগীও (hysteria) থাকতেন। সম্মোহনের সাহায্যে এঁদের

ভালো করে তোলার চেষ্টা হত। **মৃগীরোগী বা এপিলেপসি রোগীরা সম্মোহনে আরোগ্য লাভ করত না।** এপিলেপসি রোগের আক্রমণ আরম্ভ হয় কোনোরকম আভাস না দিয়ে। সাধারণভাবে রোগীর সব মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায় এই সময় রোগীর জ্ঞান থাকে না। যেহেতু মৃগী বা এপিলেপসি রোগী রোগ আক্রমণের শুরুতেই জ্ঞান হারায়, তাই আক্রান্ত অবস্থায় তাকে সাজেশন দেওয়া যায় না।

হিস্টিরিয়া হয় সাধারণভাবে অবদমিত মানসিক অবস্থা থেকে, উৎকণ্ঠা থেকে, পাপবোধ থেকে, যৌন-অবদমন থেকে ইত্যাদি। ভূতে ভর, ঈশ্বরে ভরও সাধারণত হিস্টিরিয়া রোগ থেকে হয়। হিস্টিরিয়া রোগের ক্ষেত্রে সম্মোহন করে রোগীর মনে ধারণা সঞ্চার করে অর্থাৎ সাজেশন পাঠিয়ে যথেষ্ট ভালো ফল পাওয়া যায়। দাঁতে দাঁত চেপে **হিস্টিরিয়া রোগীরা যে মূর্ছা যায়, তাতেও কিন্তু রোগী জ্ঞান হারায় না। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অবচেতনভাবে অজ্ঞানের অভিনয় করে।**

একসময় শার্কো দেখলেন, হিস্টিরিয়া রোগীরা এপিলেপসি রোগীদের সঙ্গে একসাথে থাকার ফলে দাঁতে দাঁত চাপায় অভ্যস্ত হয়েছে। এটা যে অনেক সময় লোক দেখানো ব্যাপার—সেটাও অনুভব করেন।

তবে একটা ভুল কিন্তু শার্কোর মধ্যে ছিল। তিনি ও তাঁর ছাত্রদের অনেকেই সাজেশনের পাশাপাশি চুম্বকের ব্যবহারে বিশ্বাস ছিলেন।

শার্কোর তিন বিখ্যাত চিকিৎসক ছাত্র ডা. জ্যানে, ডা. বার্নহিম এবং ডা. ফ্রয়েডসহ আরো কিছু ছাত্র তাঁর চুম্বকতত্ত্বকে বিজ্ঞান বিরোধী বলে ঘোষণা করে সাজেশনের কার্যকর ভূমিকাকে গ্রহণ করলেন।

১৮৯৩ সালে শার্কোর মৃত্যু হয়। স্নায়ুরোগে শার্কোর সম্মোহন চিকিৎসার অবদান আজো চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে।

ডা. এ লিউবোল্ট (Dr. A. Lieubeault)

ডা. এ লিউবোল্ট ছিলেন জনপ্রিয় হিপনোথেরাপিস্ট। তাঁর কাজের ক্ষেত্র ছিল ফ্রান্সের ন্যান্সিতে। তিনি কয়েক হাজার মানসিক রোগীকে রোগমুক্ত করে প্রমাণ করেন রোগ সারিয়ে তোলার ব্যাপারে সাজেশনের ভূমিকা অসাধারণ।

তাঁর সম্মোহন চিকিৎসার সাফল্যের কথা শুনে ডা. বার্নহিম ন্যান্সিতে এসে হাজির হন। লিউবোল্ড–এর অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি ও সাফল্য দেখে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েন। এবং একসঙ্গে চিকিৎসা শুরু করেন।

ডা. এইচ বার্নহিম (Dr. H. Bernheim)

ডা. বার্নহিম ডা. শার্কোর কাছে গিয়েছিলেন সম্মোহন চিকিৎসা বিষয়ে ভালোমতো জানতে। ডা. লিউবোল্টের সম্মোহন চিকিৎসার অসাধারণ সাফল্যের কথা শুনে তাঁর এক রোগীকে নিয়ে যান ডা. লিউবোল্টের কাছে। এই রোগী বাতের জন্য অঙ্গ অবক্ষতায়

ভুগছিলেন। ডা. বার্নহিম রোগীকে ছ'মাস চিকিৎসা করেন কিন্তু সারিয়ে তুলতে ব্যর্থ হন। ডা. লিউবোল্টকে রোগীর বর্ণনা দিয়ে তাঁর সঙ্গে রোগী নিয়ে সাক্ষাতের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ডা. লিউবোল্টের সম্মতি নিয়ে রোগীসহ ন্যান্সিতে আসেন। ডা. লিউবোল্ট সম্মোহন চিকিৎসার সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই রোগীকে সুস্থ করে তোলেন।

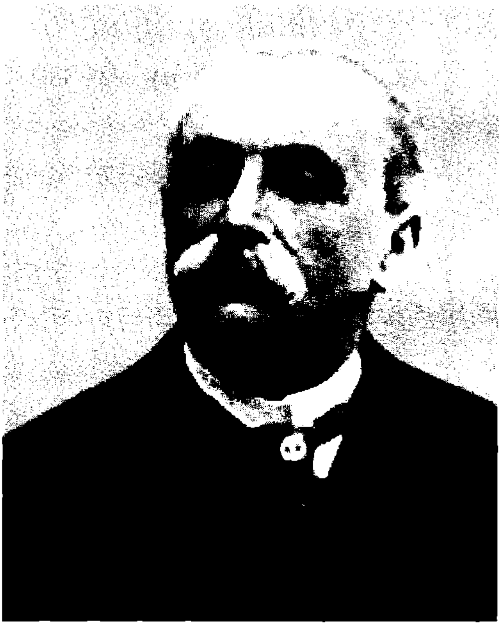

মুগ্ধ বার্নহিম জুটি বাঁধেন লিউবোল্টের সঙ্গে লিউবোল্ট ও বার্নহিম দুজনে মিলে ৩০ হাজার রোগীকে সম্মোহনের সাহায্যে সুস্থ করে তুলেছিলেন। রোগীদের কেসহিস্ট্রি লিখে রাখতেন ডা. বার্নহিম।

১৮৮৪ সালে ডা. বার্নহিমের লেখা একটি বই প্রকাশিত হল। নাম : The La Suggestion, বাংলা শব্দার্থ করে বলতে পারি 'সাজেশন দেওয়ার আইন'। ১৯৮৬ সালেই আরো একটি বই প্রকাশিত হল। নাম : 'La Therapeutic Suggestive'; লেখক ডা. বার্নহিম।

এই গ্রন্থ দুটিতে সম্মোহন চিকিৎসা বিষয়ে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। গ্রন্থ দুটি চিকিৎসা জগতে আলোড়ন তুলেছিল।

গ্রন্থ দুটি প্রকাশের ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ সালে 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' কিছু বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে একটা কমিশন তৈরি করে। কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়—সম্মোহনের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সম্মোহনের কার্যকারিতা কতটা।

কমিশন তাঁদের পেশ করা রিপোর্টে জানান :

* সম্মোহন ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে।

* সম্মোহনের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

* শারীরক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে দ্রুততর বা শ্লথগতির করা। মনে প্রশান্তি আনা অর্থাৎ রিলাক্স করায়। নাড়ির গতিতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। শরীরের কোনো অংশে অসাড়তা আনে, অসাড় অংশে সাড় আনে। অনিদ্রা রোগীকে সাজেশন দিয়ে ঘুম পাড়ান যায়। ব্যথা দূর করে ইত্যাদি। ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব বাড়ে।

* নেশা দূর করতে সাহায্য করে।

* যে কোনো রোগীকেই মানসিক শক্তি জোগায়।

* সম্মোহন চিকিৎসার ভূমিকাকে স্বীকার করছে কমিশন।

আরো অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে এলেন মেতেল, জিমসেন, ভেরওর্ন এবং বেকটেরেফ। ভেরওর্ন বললেন, সম্মোহন হল অতি জাগ্রত অবস্থা অর্থাৎ এই অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক থাকে সবচেয়ে সজাগ। বেকটেরেফ বললেন—সম্মোহন হল স্বাভাবিক ঘুমেরই রকমফের।

এলেন ফ্রান্সের এক বিখ্যাত মনোবিদ পিয়ারে জ্যানেট (Piarey Janet)। তিনি মানুষের সচেতন মনের (Conscious) এবং অবচেতন মনের (Sub-conscious) স্তরের কথা বললেন।

এলেন ভিয়েনার এক বিখ্যাত চিকিৎসক যোসেফ ব্রুয়ার (Dr. Joseph Breuer)। তিনি রোগীকে সম্মোহনের সাহায্যে অতীত জীবনে (পূর্বজন্মে নয়) নিয়ে যেতে সমর্থ হন। ফলে অতীতের কোন্ বিশেষ ঘটনা মানসিক রোগ বা সাইকোসোমটিক রোগের কারণ—তা খুঁজে বের করা সহজ হল।

ড. সিগমান্ড ফ্রয়েড (Dr. Sigmund Freud)

ফ্রয়েড হাজির হলেন তাঁর সাইকো-অ্যানালিটিক তত্ত্ব নিয়ে। ডা. সিগমান্ড জন্মেছিলেন ১৮৫৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩৯ সালে। ফ্রয়েড ছিলেন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁর চিকিৎসা জীবনের একটা সময়ে সম্মোহন বিষয়ে আগ্রহ হারান।

১৯৮৮-তে সম্মোহনের সাজেশন ও থেরাপির উপর একটা বই লেখেন। বইটিতে শার্কো, বার্নহিম এবং লিউবোল্ট-এর সম্মোহন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আছে।

ফ্রয়েডের মতে সম্মোহনকারী ও সম্মোহিতের মধ্যে 'সম্পর্ক' বা 'raport' গড়ে ওঠাটা অত্যন্ত জরুরি। যিনি সম্মোহন করবেন তাঁর যেমন নিজের সম্মোহন করার ক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকাটা দরকার। তেমনই রোগীরও সম্মোহনকারীর উপর আস্থা অর্জন করাটাও খুবই দরকার।

ফ্রয়েড বেশ কয়েকটা বছর বিভিন্ন স্নায়ুরোগীদের উপর সম্মোহন চিকিৎসা চালান। তিনি নানা মানসিক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সম্মোহনের সাহায্য নিতেন। সম্মোহন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই তিনি ব্যর্থ

হয়েছেন। সম্ভবত নিজের সম্মোহন করার ক্ষমতার উপর তিনি পুরোপুরি আস্থাশীল ছিলেন না তাই এই ব্যর্থতা। একসময় ফ্রয়েড নিজেকে সম্মোহন চিকিৎসা থেকে সরিয়ে আনেন।

ফ্রয়েড মনে করতেন, সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ তার মনে চাপা পড়ে থাকা অনেক ইচ্ছে, ঘটনার কথা মনে করতে পারে, যা সজাগ অবস্থায় মনে আনতে পারে না। নানা প্রশ্ন করেও সেই অচেতন গোপন স্তরের খবর জানা যায় না। ফ্রয়েড এই অচেতন স্তরের নাম দিলেন 'The Unconscious' বা 'অচেতন' স্তর। ফ্রয়েড সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, স্বপ্ন-ই অচেতন মনের হদিশ দিতে পারে।

আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে একটি হল যৌনতা। ফ্রয়েডের মতে আমরা সকলেই কামনার দ্বারা কর্মপ্রেরণা পাচ্ছি। এবং একইসঙ্গে সমাজে নিজের সম্মানকে বাঁচাতে এইসব কামচিন্তাকে গোপন করে রাখি। এই যে সম্মান রাখতে গোপন করার চেষ্টা—একে বলে 'ইগো' (ego) বা অহং। এই ইগোর সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তির লড়াই চিরন্তন চলছে। শৈশবে মা-বাবার প্রতি ছেলে ও মেয়ের কামনা থাকে। একে বলে 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স'।—এসবই ফ্রয়েডের চিন্তা-ভাবনা তত্ত্ব।

ইগোরও আবার স্তরবিন্যাস করেছিলেন ফ্রয়েড। ইগো, সুপারইগো, ইদ্। তাঁর তত্ত্বে সংযোজিত হয়েছিল 'Libido' শব্দটি, যার অর্থ 'কামশক্তি'। ফ্রয়েড মনে করতেন, কর্মোদ্যোগের পিছনে থাকে যৌনাকামনা বা কামশক্তি। এই শক্তি কখনো কাজ করে অচেতন মনে, কখনো বা সচেতন মনে।

ফ্রয়েড তাঁর লিবিডোতত্ত্ব হাজির করেছেন স্বপ্নে। তাঁর মতে স্বপ্নে আমরা যা দেখি তার মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই থাকে লিঙ্গ ও যোনি। ছাতি, লাঠি, কলা, কলম, ছুরি, ছোরা, সাপ, বানমাছ ইত্যাদিরা সবই লিঙ্গের প্রতীক। আর বাক্স, কাবার্ড, গলি, নৌকো, জাহাজ—সবই যোনির প্রতীক। আপেল, নাসপাতি, কমলালেবু ইত্যাদি গোল ধরনের ফল স্তনের প্রতীক। স্বপ্ন মানেই অবদমিত ইচ্ছের অভিব্যক্তি। জমিতে লাঙল দেওয়ার স্বপ্ন, বীজবপন ইত্যাদিকে অজাচার প্রবৃত্তির ইচ্ছের প্রতিফলন বলে মনে করতেন ফ্রয়েড।

ফ্রয়েড এই যৌনসর্বস্ব তত্ত্বের জন্যেই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পর্ণ পড়ার উত্তেজনা ছড়িয়ে তিনি একসময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বিশেষ করে দর্শন বা ফিলজফির ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্ব এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধুরাও নিষিদ্ধ যৌনরসে ডুব দিতে ওইসব লেখা পড়তেন।

মানুষের মন নিয়ে যতই নতুন নতুন গবেষণা ও অগ্রগতি হতে লাগল, ততই ফ্রয়েডের তত্ত্বগুলো গুরুত্ব হারাতে লাগল। ১৯৫০ নাগাদ মাথা থেকে উত্তেজনা বা টেনশন দূর করার ট্রাংকিউলাইজার ও বিষণ্ণতা দূর করার অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট ওষুধের সাফল্য প্রমাণিত হল। মানুষের মনের ভিত্তিভূমি যে মস্তিষ্ক তা যেমন প্রমাণিত হল, তেমনই প্রমাণিত হল মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের উত্তেজনা ও নিস্তেজনা মনকে প্রভাবিত করে। আরো গবেষণায় উঠে এলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। **যতই সময় এগোতে লাগল ততই ফ্রয়েডের যৌনতাসর্বস্ব লিবিডোতত্ত্ব বাতিল হতে লাগল।**

ইভান পেত্রভিচ পাভলভ (Ivan Petroviech Pavlov)

পাভলভের জন্ম রাশিয়ায় ১৮৪৯ সালে। ছিলেন বিশিষ্ট শারীরবিদ (Physiologist)। ১৮৮৩ সালে 'ডক্টর অফ মেডিসিন' হন। ১৯০৪ সালে শারীরবিজ্ঞান বিভাগে নোবেল প্রাইজ পান। তাঁর সহকর্মী ও সমকালীন বিজ্ঞানীদের অনেকেই তাঁর conditional reflex (শর্তাধীন প্রতিফলন) তত্ত্ব নিয়ে উপহাস করতেন।

আপনারা অনেকেই সাপের খেলা দেখেছেন। সাপুড়েরা এক ধরনের শিকড় বের করে বলে, শিকড় ধরে থাকলে গন্ধে সাপ সেই ঘরে ঢোকে না। শিকড়টির কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হাতের মুঠোয় সাপের গলাটা ধরে তার নাকের দিকে শিকড়টা নিয়ে যেতেই সাপ দ্রুত হাতের মুঠোয় মুখ ঢুকিয়ে দিতে তৎপর হয়।

এই ঘটনার পিছনেও আছে 'কনডিশনড্ রিফ্লেক্স'। সাপুড়ে বেশ কিছুদিন ধরে তার পোষা সাপের মধ্যে এই 'কনডিশনড্ রিফ্লেক্স' তৈরি করেছে। শিকড়ের সাইজের একটা লোহার টুকরোকে গরম করে সাপের নাকে ঠেকাতেই সাপ ব্যথা পেয়েছে এবং বাঁচতে

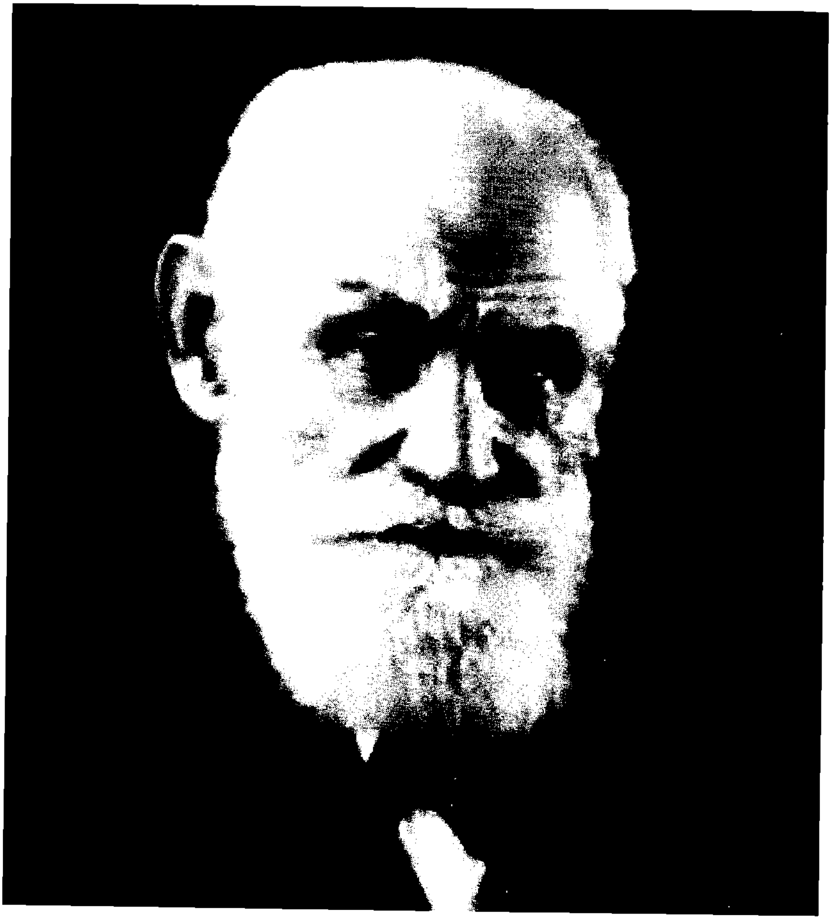

পালাতে চেয়েছে। শিকড়টি নাকের কাছে আনলেই গরম ছ্যাঁকা খাওয়ার ভয় কাজ করছে তার মধ্যে। বারবার ছ্যাঁকা দিয়ে সাপের চেতনায় ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা শর্ত—'ছ্যাঁকা লাগবে'। আর সেই শর্তেল প্রতিফলনেই সাপ পালাতে চাইছে। এই ঘটনার সঙ্গে শিকড়টির ওষুধিগুণের কোনো সম্পর্ক নেই।

পাভলভ তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন কুকুরদের ওপর। একটি কুকুরকে খাবার দেওয়ার সময় ঘণ্টা বাজান হল। খাবার দেখেই কুকুরটির জিভ থেকে লালা ঝরতে থাকে। কিছুদিন এমন চলার পর কুকুরটিকে খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজানোতেই কুকুরটির জিভ থেকে লাল ঝরতে লাগল।

বিভিন্ন কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন, সবার বেলায় একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। অর্থাৎ বিশেষ condition-এ বা বিশেষ শর্তে তার একই ধরনের reflex হয়।

শারীরবৃত্তের এই তত্ত্বই পাভলভের মহান আবিষ্কার। পাভলভের মতে রিফ্লেক্স দু-ধরনের বলা যায়। একটা রিফ্লেক্স কাজ করে শরীরে, অন্যটি মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে।

পাভলভ-তত্ত্বে মস্তিষ্কের 'ছক' বা type

আইভান পাভলভের (Ivan Pavlov) মনোবিজ্ঞান-তত্ত্বে আস্থাশীলেরা মনে করেন, মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের বিশেষ কয়েকটা 'ছক' বা 'টাইপ' আছে।

এই ছক বা 'টাইপ' বুঝতে গেলে আগে বুঝতে হবে মস্তিষ্ককোষের স্নায়ুক্রিয়ার 'ধর্ম'। স্নায়ুক্রিয়ার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য তিনটি। (১) শক্তি (strength), (২) গতিময়তা (mobility) ও (৩) ভারসাম্য (balance)।

'শক্তি' হল মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের সহ্য করার ক্ষমতা। মাফিয়া ডন আবু সালেম আর বেলেঘাটার স্টেশনারি দোকানের কর্মী জীতেনের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের সহ্য ক্ষমতা সমান নয়। টাডা কোর্ট, সি বি আই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরার পরও আবু সালেমের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ সতেজ, একই রকম কর্মক্ষম।

আর জীতেন? পোলিও রোগী। শান্ত, সরল তার দোকানের উল্টোদিকের এক প্রাসাদ বাসিনীর এক তরফা প্রেমে পড়লো। মেয়েটি ব্যবসা করেন। আর মাস গেলে আয় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার। মাঝে-মধ্যে এটা-সেটা কিনতে জীতেনের দোকানে আসেন। জীতেনের পোলিও রোগ এবং সুন্দর ব্যবহারের কারণে জীতেনের প্রতি করুণা ও সহানুভূতি আছে। জীতেনকে জীতুদা বলে সম্বোধন করেন। ভালো ব্যবহার করেন। এই করুণাকেই ভালবাসা বলে ধরে নিল জীতেন। জীতেনের মাস মাইনে সাতশো'। থাকে খালপাড়ের বস্তিতে। প্রেমের কথা মেয়েটিকে জানাতে পারেনি কোনোদিন। কিন্তু ওর দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি ওকে ভালোবাসে। জীতেন এখন মানসিক রোগী। বিষয়টা এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়—

জীতেনের দুর্বল টাইপের মস্তিষ্ক। সহ্য ক্ষমতা খুবই-ই দুর্বল। ফলে তার মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সাদা-মাটা কথায় পাগল।

'গতিময়তা' হল মস্তিষ্ক কোষের সেই গুণ, যা থাকলে একটি মানুষ দ্রুত একটি থেকে আরো একটি বিষয়ে মনোযোগ করতে পারে। এ দেশের রাজনীতিকদের দিকে তাকান।

এদের বেশিরভাগ-ই একইসঙ্গে সাংসদ, বিধায়ক অথবা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। পাবলিক রিলেশন, ক্যাডার রিলেশন, মাসলম্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ, তোলা আদায়ের ভাগ নেওয়া, ক্যাডারদের খুশি রাখতে স্কুল-কলেজ হাসপাতালে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করেন। খেলার জগতে কোনো দিন পা না রেখেও খেলার সর্বময় কর্তা হতে হয়। স্টেডিয়ামে মাঝেমধ্যে ফাংশন করতে হয়। মুম্বাই-চেন্নাই-কলকাতার সিনেমার স্টার-মেগাস্টার ও গায়ক-গায়িকা নাচক-নাচিকাদের ধরে আনতে হয়। এমনি হাজারো ঝক্কি-ঝামেলা সামলে বই লেখেন, নাটক করেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। এঁদের মস্তিষ্ক কোষের গতিময়তা সাধারণ মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি। বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বহুজাতিক সংস্থার বড় এক্সিকিউটিভ থেকে দাউদ, তেলগির মতো অপরাধ জগতের বাদশাদেরও মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা খুব-ই বেশি।

সব মস্তিষ্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা সমান নয়। কেউ আবেগে গা ভাসান, উত্তেজনায় মাত্রাবোধ হারান, দুঃখে ভেঙে পড়েন, নিস্তেজনার শিকার হয়ে পড়েন। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে বা প্রেমে ব্যর্থতায় মানসিক ভারসাম্য হারানো মানুষের সংখ্যা কম নয়। আবার আনন্দের আতিশয্যে আবেগতাড়িত মানুষও আমরা দেখেছি। দেশের ফুটবল টিমের জয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সমর্থকরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে, দুরন্ত বেগে মোটর চালিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে। ওদের আনন্দের আতিশয্যে মরেছে বহু মানুষ। ওদের সবার-ই মস্তিষ্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা কম।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর স্বপ্ন ছিল পুত্র সঞ্জয়কে নিয়ে। তাঁকেই দেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের গদিতে বসাবার চিন্তায় যখন মশগুল, তখন-ই সঞ্জয়ের মৃত্যু হল। এত বড় আঘাতের পরও শ্রীমতি গান্ধী শ্রীমতি গান্ধী-ই ছিলেন। তাঁর মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা ছিল অসম্ভব রকমের বেশি।

মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের এই তিন 'ধর্ম' বা বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে তৈরি হয় বিভিন্ন টাইপ বা ছকের। এই টাইপ বা ছককে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেছেন প্যাভলভ। (১) মেলানকলিক (Melancholic), (২) কোলেরিক (Choleric), (৩) ফ্লেগমাটিক (Phlegmatic) ও (৪) সাংগুইন (Sanguine)।

১. মেলানকলিক বা বিষাদগ্রস্ত টাইপ : ব্যাঙ্কের কেরানি বিনোদবাবু। ঘষটে স্কুল ফাইনাল পাস করতেই কাকা ব্যাঙ্কে কেরানি পদে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কাজে প্রচুর ভুল করেন। চুরি না করলে ব্যাঙ্কের চাকরি যায় না। বিনোদবাবুরও যায়নি। ভালো মাইনে। ব্যাঙ্ক লোনে বাড়ি করেছেন। বিয়ে করেছেন। সংসার বলতে বউ আর ছেলে। ব্যাঙ্ক কো-অপারিটিভে বাড়ি না করলেই ভালো হতো—এটা প্রতিদিনই মনে হয় বিনোদবাবুর। অফিসে যাঁদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকতে হয়, অফিসের পর বাড়ি ফিরে আবার তাঁদের মুখ-ই দেখতে হয়। মনটা সব সময় বিষণ্ন। বাড়ি থেকে অফিস, অফিস থেকে বাড়ি—সব সময় মন খারাপ।

কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করলে একটাই উত্তর, 'আর...চলছে, জিনিসপত্রের যা দাম? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। ভালো আর কোথায়? ভালো থাকার উপায় আছে?'

লাগাতার বিষণ্নতা এসেছে অফিসের কাজে আত্মবিশ্বাসের সভাব থেকে। প্যারেন্টস মিটিং–এ ডাক পড়লে কী করবেন, কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে ছেলের সহপাঠীদের মা–বাবার কাছে দৌড়ে বেড়ান। ক্লাসটিচারের রুমে ঢোকার আগে অন্তত একবার টয়লেটে ঢুকতেই হয়। পরিবেশের সামান্য চাপেই বিনোদ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ফলে সহকর্মীদের কাছে বিনোদ 'খোরাক'।

বিনোদ 'মেলানকলিক' টাইপের একটি উদাহরণ। ছা–পোষা আত্মবিশ্বাসহীন, মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষদের মধ্যে এই ধরনের টাইপ বেশি দেখা যায়।

২. কোলেরিক বা অসহিষ্ণু টাইপ : এরা অতিমাত্রায় উৎসাহী, অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী, অসহিষ্ণু, প্রাণশক্তি টগবগ করে ফুটছে। অস্থিরমতি, অসংযত, হঠকারি, ডিক্টেটর মানসিকতা থেকে বে–হিসেবি ঝুঁকি নিতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল। হিটলার থেকে ইন্দিরা গান্ধী কোলেরিক টাইপের সুন্দর উদাহরণ।

৩. ফ্লেগমাটিক : ফ্লেগমাটিক বা শান্ত ধীর টাইপের মানুষরা অচঞ্চল, অধ্যবসায়ী, আঘাত সহ্য করতে পারেন উদাসীনতার সঙ্গে। এঁরা অক্লান্ত পরিশ্রমে ধীর–স্থির। ভেবে চিন্তে কাজ করেন। গভীর গবেষণায় আন্তরিকতার সঙ্গে দীর্ঘকাল লেগে থাকতে পারেন। বিফল হলেও ভেঙে পড়েন না। নতুন করে আবার কাজে মনোসংযোগ করেন। গবেষক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা এই টাইপের স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী।

৪. সাংগুইন : 'সাংগুইন' বা 'প্রত্যয়ী' টাইপ মানুষরা একইসঙ্গে অনেক ধরনের কাজে মন বসাতে পারেন। দ্রুত এক বিষয় থেকে আর একটি বিষয়ে গভীরভাবে মনোসংযোগ করতে পারেন। রেগে গেলেও বাইরে প্রকাশ করেন না। আনন্দে সংযম থাকতে পারেন। দ্রুত বিচার করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এইসব গুণের সমাহার সাধারণভাবে একজন প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকদের মধ্যে থাকে।

মস্তিষ্কের বিশেষ ধর্মের এই যে চারটি শ্রেণি বিভাজন বা টাইপ বিভাজন করেছিলেন পাভলভ, তাকে চূড়ান্ত বা অভ্রান্ত ধরে নিয়ে ভুল হবে।

কুড়ি বছর আগে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পাভলভের এমন বিভাজনের পক্ষে মত পোষণ করেছিলাম, সেটাকে সর্বশেষ তত্ত্ব ধরে নিয়ে। মনে রাখতে হবে—একজন যুক্তিবাদী সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা অথবা ঘোড়ার ডিমের অস্তিত্বও তো প্রমাণ হতে পারে, এমন নির্বোধ ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হন না।

একসময় ফ্রয়েডের তত্ত্ব বিশ্বকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আজ সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)-এর অতি যৌনতা (Pan-sexualism) তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেছে। **ফ্রয়েডের তত্ত্ব এখন স্থান পেয়েছে মনোবিজ্ঞানে নয়, মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে।**

সর্বশেষ পাওয়া তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে এটা বলতেই পারি—পাভলভের করা মস্তিষ্ক–স্নায়ুকোষের 'টাইপ' অনুসারে এক একটা মানুষকে এক একটা খোপে ঢুকিয়ে দিলে ভুল

হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ (১) মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, পরিবর্তিত পরিবেশ সবই তার 'টাইপ' বা ছক পাল্টে দিতে পারে। (২) এক একটি ঘটনাও মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে সাময়িকভাবে পাল্টে দিতে পারে, যাতে আপনার 'টাইপ' ক্যালকুলেশন ভুল হবে। ২০০৪ এর নভেম্বরে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচের কথা ভাবুন। সৌরভ টিম থেকে বাদ। দল নির্বাচক থেকে কোচ সবাই মনে করছেন সৌরভের বর্তমান ফর্ম খারাপ। বাঙালিদের আবেগ সেই বাস্তবতা মানতে নারাজ। ফলে তারা নির্ভেজাল সৌরভ প্রেমে ও বাঙালি প্রেমে মাতোয়ারা হলেন। খাঁটি বাঙালিত্ব তাঁদের খাঁটি সাম্প্রদায়িক করে তুললো। ভারতীয় দলকে হারাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন পিচ নির্মাণের দায়িত্বে থাকা মানুষটি থেকে সিনেমা স্টার, মন্ত্রী থেকে দর্শক 'বিশুদ্ধ' বাঙালিরা। ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে গলা ফাটালেন, ভারতীয় ক্রিকেটার-এর দিকে জুতো দেখালেন। এঁরা কারা? 'কোলেরিক' টাইপের 'অসহিষ্ণু' 'অসংযত' মানুষ। (৩) পাভলভ যে সময় মানুষের মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষকে চারটি টাইপে ভাগ করেছিলেন, সময়টা সেখানে আটকে নেই। যে সমাজে যত বেশি জটিলতা দেখা দেবে, ততই আরো বহু ও বিচিত্র সব টাইপের উদ্ভব হতে থাকবে। (৪) মানসিকতা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব পাল্টাতে অনেকেই 'বিহেভিয়ারাল থেরাপি' (Behavioural Theraphy, 'গ্রুপ থেরাপি' (Group Therapy), ব্যক্তিত্ব তৈরির ক্লাসে ভর্তি হচ্ছেন, কেউবা যাচ্ছেন ম্যারিটাল কাউন্সেলিং সেশনে। এরপর আর টাইপের অচলায়তনে আস্থা রাখি কী করে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনে করে, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে কখনই নির্দিষ্ট কোনো ছকে (type) বাঁধা যায় না। মন গতিশীল। যার জীবনে উত্থান-পতন বেশি, তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষও সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ তথাকথিত 'ছক' বা 'type' বদলাতে থাকে।

পাভলভপন্থীরা দ্বিধাহীনভাবে মনে করেন মনোরোগবিদ্যার সঙ্কট সমাধান বস্তুবাদীদের reflex-তত্ত্ব ও পাভলভের শর্তাধীন (conditioned reflex)-তত্ত্বের চর্চা ছাড়া হতে পারে না। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দিয়ে কোনো ওষুধের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা চলে না—যেসব ওষুধ মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত বা নিস্তেজিত করে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন মনের রোগের বিভিন্ন ওষুধ উন্নত দেশগুলোতে ব্যবহৃত হতে শুরু করল, তখন ওষুধের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যার জন্য পাভলভ অথবা ফ্রয়েডের তত্ত্বের কোনো প্রয়োজন হয় না। **মাথা ঠাণ্ডা রাখতে ট্রাংকিউলাইজার এবং মন খারাপ দূর করে মনকে চনমনে রাখতে অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট ওষুধের সাফল্য এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে।**

অধ্যায় : দুই

মনোরোগ, সম্মোহন জানতে মগজের কাজ জানা জরুরি

আজকাল টিভি বিজ্ঞাপনের দৌলতে একটা শিশুও জেনে ফেলেছে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা বাড়াবার উপায়। 'সোনা-চাঁন্দি চ্যবনপ্রাস' বা 'ব্রাহ্মী শাকের রস সমৃদ্ধ ব্রেনোলিয়া' খাও আর বুদ্ধিমান হয়ে যাও।

বিজ্ঞাপনের গরু গাছে ওঠে—এটা তো আপনাদের জানা। এটাও জানা যে, বিজ্ঞাপন মানুষকে গরু বানাতে চায়। **সোনা-চাঁন্দি চ্যবনপ্রাস ও ব্রাহ্মী শাকের রসের মেধা-বৃদ্ধি বাড়াবার বিজ্ঞাপন এমনই মানুষকে গরু বানাবার বিজ্ঞাপন।**

বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা ইত্যাদি মস্তিষ্কের কাজ-কর্ম নিয়ে মানুষের নানা ধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে, যার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন, (১) মাথা বড় মানেই বুদ্ধিমান। (২) পুরুষের তুলনায় মেয়েদের মস্তিষ্কের ওজন কম। অতএব, পুরুষরা বেশি বুদ্ধিমান। (৩) মেডিটেশন বা যোগব্যায়ামে বুদ্ধি বাড়ে। (৪) অপরাধীর সন্তান অপরাধী হবে। (৫) **একটা লোক ভালো হবে কি খারাপ, একগামী কি লম্পট আগে থেকে জিন বা বংশগতি বা প্রোগ্রামিং বা নির্ধারিত করে রাখে...ইত্যাদি ইত্যাদি।**

মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞান আজ যতটা এগিয়েছে, তারই সাহায্য নিয়ে বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধাকে অবশ্যই বাড়ানো যায়। আমরা এখন এই বিষয়ে আবিষ্কৃত তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনায় যাব।

মগজের কাজ

এই যে আমরা হাঁটছি, চলছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাচ্ছি, চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠছি, খেলছি, নাটক করছি, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখছি, পরিকল্পনা করছি, আবিষ্কার করছি—এই সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছে মগজ বা মস্তিষ্ক।

এই মগজে আছে ১০ লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ। হ্যাঁ, আমরা বলছি মানুষের মগজের কথা। মস্তিষ্ক-ই হল মানুষের শরীরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মস্তিষ্ককে বলতে পারি, প্রকৃতির তৈরি বিশাল এক কম্পিউটার। ছোটবেলা থেকেই ব্রেন কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং হতে

থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রামিং পাল্টাতে থাকে। মস্তিষ্ক সেই প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করতে থাকে।

আমাদের স্নায়ুতন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। (১) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System), (২) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System, (৩) প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System)।

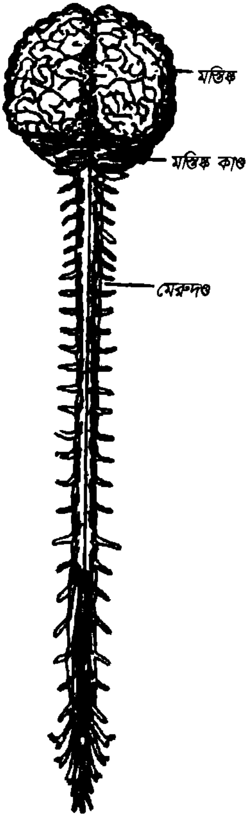

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত হল মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)। এই Spinal cord বা সুষুম্নাকাণ্ড থাকে Spine বা মেরুদণ্ডের ভিতরে। দেখতে ধূসর ও সাদাটে ফিতের মতো। এই ফিতের মতো পদার্থটি মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ডের শেষ অস্থি পর্যন্ত বিস্তৃত। ধূসর পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে স্নায়ুকোষ (Nerve cell) এর সাদাটে পদার্থ দিয়ে তৈরি স্নায়ুতন্তু (Nerve fibres)।

মস্তিষ্ক ও দেহের প্রতিটি Sense organs সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে সুষুম্নাকাণ্ড।

সুষুম্নাকান্ড ঘাড়ের কাছে এসে মস্তিষ্কে ঢুকেছে। যেখানে সুষুম্নাকান্ড মস্তিষ্কে ঢুকছে, সেই অংশকে বলে অধঃমস্তিষ্ক।

গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum) যেসব স্নায়ু বেরিয়ে শরীরের নিচের অংশে গেছে সেসবই যায় অধঃসস্তিক দিয়ে।

মস্তিষ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুরুমস্তিষ্ক। এই অংশ ধূসর পদার্থ (Gray matter) আর সাদা পদার্থ (White matter) দিয়ে তৈরি।

গুরুমস্তিষ্কের প্রধান তিনটি কেন্দ্র হল (১) সংবেদন কেন্দ্র (sensary area), (২) শক্তি কেন্দ্র (Motor area) এবং (৩) সমন্বয় কেন্দ্র (Association area)।

মধ্যমস্তিষ্কের প্রধান দুটি ভাগ (১) থ্যালামাস (Thalamus), (২) হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)।

মস্তিষ্ক কোষগুলো সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে মাথার খুলি। খুলি কতকগুলো চ্যাপ্টা ও ছোট আকারের হাড়ের টুকরোয় তৈরি। হাড়ের টুকরোগুলো খাপে খাপে আটকে আছে। দেখলে মনে হবে সুতো দিয়ে সেলাই করা হয়েছে।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণভাবে ১৩৫০ গ্রাম থেকে ১৪৫০ গ্রাম। এই মস্তিষ্কের পরেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুদণ্ড। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড এই দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।

স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয়েছে স্নায়ুকোষ নিউরোন দিয়ে। জন্মের সময় মস্তিষ্কে যে পরিমাণ স্নায়ুকোষ থাকে তা প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকে। অর্থাৎ স্নায়ুকোষ আর বাড়ে না। বরং ২০ বছর বয়সের পর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার করে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু হতে থাকে।

স্নায়ুকোষগুলো বা মস্তিষ্ক মাথার খুলির মধ্যে এক বিশেষ ধরনের থলথলে তরলে ভেসে থাকে। এই তরলকে বলে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড সংক্ষেপে সি.এস.এফ.।

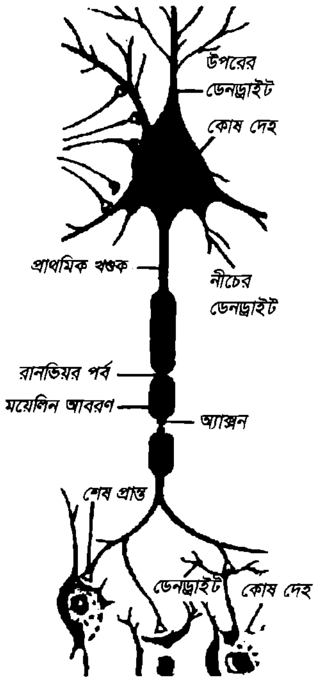

স্নায়ুকোষের ছবি

একটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন স্নায়ুতন্ত্রের একক। এমনই ১০ লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন নিয়ে মানুষ জন্মায়। নিউরোন থেকে ডালপালার মতো ছড়িয়ে থাকে 'ডেনড্রাইট'। গ্রিক ভাষায় 'ডেনড্রাইট' শব্দের অর্থ গাছ। ডেনড্রাইট দেখতে শাখা-প্রশাখা যুক্ত গাছের মতো। এই ডেনড্রাইট অন্য নিউরোন থেকে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া করে। স্নায়ুকোষ বা নিউরোন আকৃতিতে অনেকটা গোলাকার। এই নিউরোন থেকে লম্বা লেজের মতো একটা অংশ বার হয় অ্যাক্সন। অ্যাক্সনের কাজ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরের অংশে খবর আদান-প্রদান। বিভিন্ন স্নায়ুকোষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ডেনড্রাইট। কিন্তু ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সন নষ্ট হলে অনেক সময় স্নায়ুকোষের সঙ্গে লেগে থাকা অংশ স্মৃতিশক্তি থেকে নতুনভাবে অংশগুলো তৈরি হতে পারে। তবে নতুন নতুন স্নায়ু-সন্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রতিভা বিকাশ, সৃষ্টিধর্মীচিন্তা ইত্যাদি বিকশিত হয়।

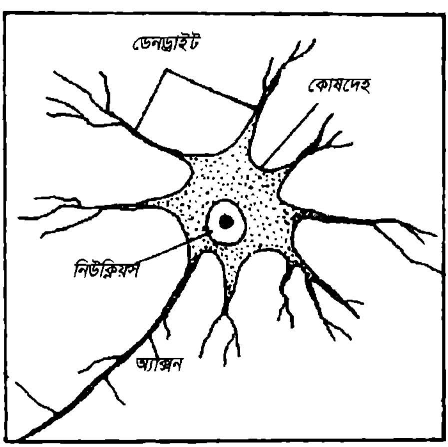

চেস্টীয় স্নায়ুকোষ

রেটিনার স্নায়ুকোষ

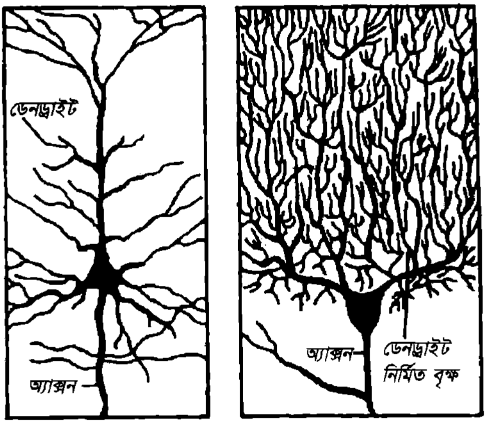

গুরু-মস্তিষ্কের
বহিঃস্তরে পিরামিডাকৃতি
স্নায়ুকোষ

লঘুমস্তিষ্কের পারকিন্‌জি
স্নায়ুকোষ

স্নায়ুকোষ

কীভাবে এই স্নায়ু-সন্ধি সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের চিন্তাশীল বিকাশ করতে পারি—সে নিয়ে নিশ্চয়ই পরে আলোচনায় যাব।

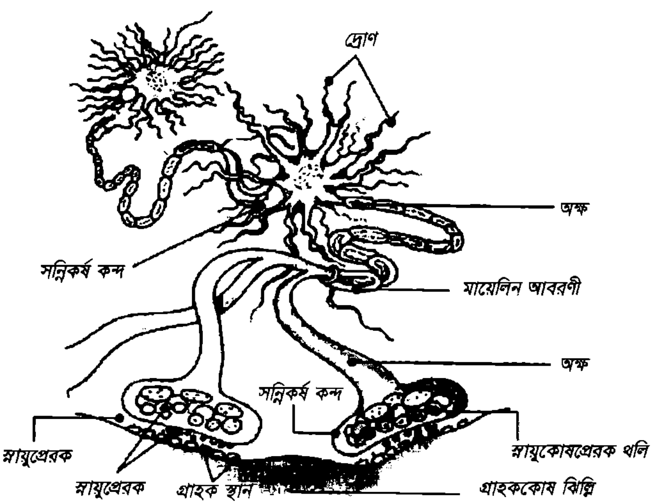

স্নায়ুকোষ

মাথার খুলির ভিতর যে মস্তিষ্ক রয়েছে, তার কিছুটা অংশ ধূসর বা গ্রে রঙের। কিছুটা অংশের রঙ সাদা। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বা নিউরোন যখন ঘনবদ্ধভাবে একসঙ্গে মিলে থাকে,

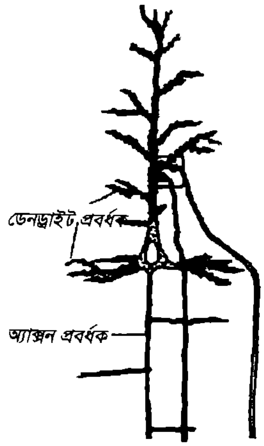

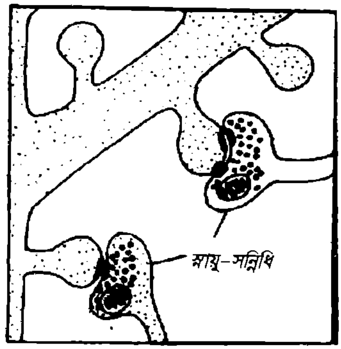

তখন দেখায় ধূসর। একেই বলে 'গ্রে-ম্যাটার'। প্রচলিত ধারণা—যার গ্রে-ম্যাটার যত বেশি, তার বুদ্ধি-মেধা তত বেশি।

এই ধারণার সত্যি-মিথ্যে নিয়ে পরে আলোচনায় যাব। মস্তিষ্কে রয়েছে ১২ জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভ। এই স্নায়ু বা নার্ভের কাজ হল মাথা ও ঘাড়ের নানা অংশের কাজকর্ম পরিচালনা করা।

এই স্নায়ুগুলোর সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু মিলে-মিশে অস্থি-পেশিগুলোর কাজকর্ম পরিচালনা করে এবং খবর আদান-প্রদান করে।

শরীরের কিছু অংশ যথা হৃদপেশি, পিত্তথলি, মূত্রথলি ইত্যাদির কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক : সিমপ্যাথেটিক। শরীরের জমানো শক্তিকে ব্যবহার করে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র কাজ করে। যেমন, হৃদস্পন্দনের হার বাড়িয়ে দেওয়া, অস্থিপেশিতে রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। দুই : প্যারাসিমপ্যাথেটিক। এই স্নায়ুতন্ত্রের কাজ শরীরে খাদ্যরসের ক্ষরণ, লালাক্ষরণ ইত্যাদি।

হৃদপিণ্ড যত রক্ত পাম্প করে তার শতকরা কুড়ি ভাগই আসে মস্তিষ্কে।

মগজের তিন প্রধান অংশ

মগজের তিনটি প্রধান অংশ হল (১) অগ্র মস্তিষ্ক বা গুরু মস্তিষ্ক (Cerebrum), (২) মধ্য মস্তিষ্কের দুটি অংশ (ক) থ্যালামাস (Thalamus), (খ) হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus), (৩) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা লঘু মস্তিষ্ক (Cerebellum)।

মস্তিষ্কের তিনটি অংশের মধ্যে অগ্র ও গুরু মস্তিষ্কই প্রধান। গুরু মস্তিষ্কই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি, আবেগ, প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-আনন্দ কল্পনা প্রবণতা, দিকনির্ণয় ক্ষমতা, সঙ্গীতে-শিল্পে-সাহিত্যে অনুরাগ, শোনা ও পড়া ইত্যাদির আধার।

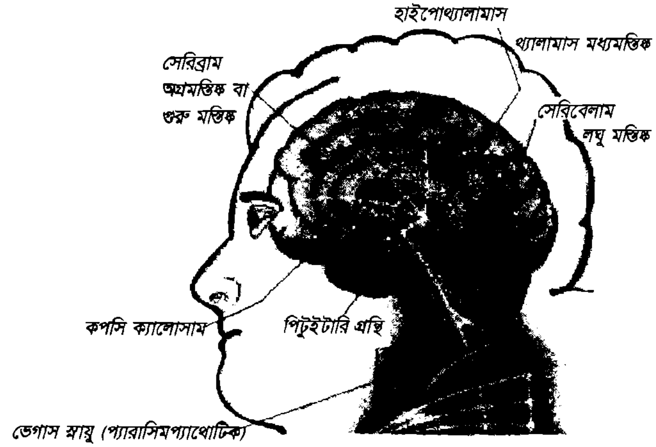

মধ্যমস্তিষ্ক সূক্ষ্ম চালচলন, আচরণ, দেহভঙ্গি ইত্যাদি পরিচালনা করে। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, আচরণ, চালচলন ইত্যাদি যে পাল্টায় তার বড় দৃষ্টান্ত উৎপল দত্ত ও শম্ভু মিত্রের কাছে পাঠ নেওয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। ক্রিকেটার ইরফান পাঠান থেকে ফুটবলার পেলে গরিব ঘর থেকে উঠে এলেও বিখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহখেলোয়াড়দের প্রভাবে চাল-চলন পাল্টে যায়। এই পাল্টে যাওয়ার ব্যাপারটা, অর্থাৎ একমুখী করে তোলার ব্যাপারটা ঘটায় মধ্যমস্তিষ্ক।

পশ্চাৎমস্তিষ্ক অক্ষিগোলক সঞ্চরণ, শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালন, চর্বণ, মুখের অভিব্যক্তি, হৃদস্পন্দন, পাচনযন্ত্র ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। দেহের অত্যন্ত জরুরি কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক।

মগজের দুটি ভাগ, দুটি মন

গুরু-মস্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে বাম ও দক্ষিণে দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছে একটা গভীর খাঁজ। দেখতে অনেকটা এরকম—

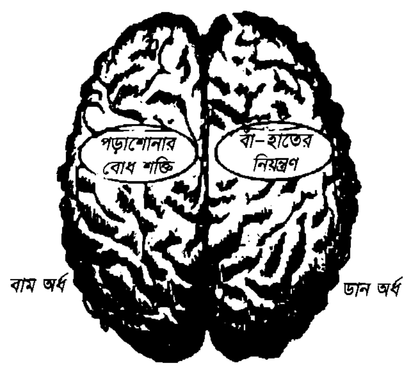

মগজের দুটি অর্ধই আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ করে। মগজের দুটি অংশের কাজে সমতা রক্ষা করে অজস্র স্নায়ুপথ, যারা বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।

দুই অংশের যোগাযোগ কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষের আচার-আচরণে সামান্য পরিবর্তন ঘটে দুই অংশের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের বাঁদিকের অংশ আচার-আচরণে, বোধবুদ্ধি ইত্যাদিকে বেশি রকম প্রভাবিত করে।

মস্তিষ্কের বাঁদিক-ই সাধারণভাবে বাক্‌শক্তি, পড়াশুনায় আগ্রহ, যুক্তিতর্কের ক্ষমতা, বিশ্লেষণীশক্তি, গণন ক্ষমতা ও ডানদিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্ম পরিচালনা করে।

মস্তিষ্কের ডানদিক কল্পনাপ্রবণতা, দিকনির্ণয় ক্ষমতা, সঙ্গীত-চিত্রকলা ইত্যাদির প্রতি আবেগ, অনেকদিন আগে দেখা মানুষকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া বাঁদিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্ম পরিচালনা করে।

বড় মাথা বেশি বুদ্ধির লক্ষণ নয়

একটি চলতি ধারণা—বড় মাথা মানেই বেশি বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা আদৌ সত্যি নয়। বরং বলতে পারি, এমন ধারণা বিজ্ঞান-বিরোধী।

হাতের সামনেই হাজারো উদাহরণ রয়েছে। জাপানের গড়পড়তা মানুষদের তুলনায় আফ্রিকার হতদরিদ্র মানুষগুলোর মাথা অনেক বড়। কিন্তু তারপরও জাপানিরা মেধায় অন্যতম সেরা জাতি।

মাথা বড় হলেই যে মস্তিষ্কের পরিমাণ বেড়ে যাবে—এমন ভাবনার গোড়ায় ভুল রয়েছে। মস্তিষ্কের ওজন সাধারণভাবে ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ গ্রাম হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের কোঁচকানো অংশ বেশি হলে মেধাবুদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই কোঁচকানো যত কমতে থাকে ততই বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেতে পারে। বহু কারণেই গ্রে ম্যাটারের এই কোঁচকানো খাঁজগুলো ফ্ল্যাট হতে পারে বা খাঁজের গভীরতা হারাতে পারে। বড় মাথাতে খাঁজ বেশি থাকে—এমন ভাববার কোনো কারণ নেই।

> ***পৃথিবী বিখ্যাত লেখক আনাতোলে ফ্রাঁসের মস্তিষ্কের ওজন ছিল মাত্র ১০২০ গ্রাম। এই তথ্য দ্বারা বলতে চাইছি যে মস্তিষ্কের ওজন কখনো মেধা-বৃদ্ধির পরিমাপক নয়।***

রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন তাঁদের ১০ লক্ষ কোটি মস্তিষ্ক কোষের খুব বেশি হলেও শতকরা একভাগের কম কোষকে কাজে লাগিয়েই রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন হয়েছিলেন। এক একটি মস্তিষ্ক কোষের রয়েছে শেখার অসীম ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে যতই কাজে লাগানো যাবে, ততই বিকাশ ঘটবে বুদ্ধি-মেধার।

বুদ্ধি-মেধা বাড়াবার উপায়

মেধা-বুদ্ধি বাড়াবার প্রধান উপায় হল—মস্তিষ্ককোষগুলোকে প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগানো। মস্তিষ্ককোষকে কে কতটা কাজে লাগাচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে, বুদ্ধি-মেধার উন্নতি। মগজকে যত বেশি কাজে লাগাবেন, খেলাবেন, তত বেশি মেধা বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। স্নায়ুকোষের শেখার ক্ষমতা এতই বেশি যে, আন্তরিকতার সঙ্গে, ভালোবেসে যা শিখতে চাইবেন, তাই শিখে নেবে স্নায়ুকোষ। ভালো-খারাপ, অপরাধ-বিজ্ঞান থেকে

চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য থেকে সমাজনীতি যা-ই পড়বেন, দেখবেন, জানবেন, তা-ই জমা হবে স্নায়ুকোষে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি থেকে রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিৎ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু প্রতিভাই বিভিন্ন বিষয়ে পর্যন্ত পরিমাণে তাঁদের মস্তিষ্ককোষকে কাজে লাগাতেন। এতে তাঁরা সবচেয়ে বেশি করে মস্তিষ্ককোষগুলোকে কর্মক্ষম রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মস্তিষ্ক হল—কাজ করলে কাজি, অলস হলেই পাজি। চিত্রা বসু ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম.এস.সি। বিয়ে হল কলকাতায় ধনী বনেদি বাড়িতে। বছর দশেক পরে বইমেলায় ওকে দেখলাম। সপ্রতিভ, জিজ্ঞাসু, ঝকঝকে কথার সেই মানুষটাকে খুঁজেই পেলাম না। জানাল ওর রোজনামচা। মেয়েকে তৈরি করে দিয়ে সকালে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া। স্কুল থেকে আনা। দুপুরে কিছুটা ঘুম। সন্ধ্যায় মেয়েকে পড়ানো। গাড়ি আছে। স্কুলে যাওয়া আসার কষ্ট নেই। মেয়ের বইগুলো পড়ার বাইরে অন্য কোনো বই পড়ার তেমন সুযোগ হয় না। মেয়ের জন্য কয়েকটা কেনার মতো বইয়ের খোঁজে মেলায় আসা, বর, মেয়ে ও তাদের পরিচর্যা ও দিবানিদ্রার মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। চর্চার অভাবে চিত্রার মেধা-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে।

আইনস্টাইন একবার রসিকতার সুরে বলেছিলেন, 'কিছু লোকের মস্তিষ্ক আছে কিন্তু কোনো কাজেই লাগে না। ওরা যা কাজ করে তার জন্য শুধু শিরদাঁড়াই যথেষ্ট ছিল।'

আমাদের গলার ওপর একটা মাথা চাপানো আছে। সেটা কি শুধুই বয়ে বেড়াবার জন্যে? নাকি শ্যাম্পু, ময়শ্চারাইজার, সাবানের বিজ্ঞাপনে দেখাবার জন্যে?

> **আমাদের মনে রাখতে-ই হবে মগজকে যথেষ্ট পরিমাণে কাজে না লাগালে অলস মস্তিষ্ককোষগুলোর মৃত্যু ঘটতে থাকবে।**

শারীরিকভাবে স্থায়ী অসুস্থতা অনেক সময় একজনকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে পারে। চিন্তায় শ্লথতা আসে, পরিকল্পনামাফিক কাজে উৎসাহ হারায়। ফলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর দ্রুত মৃত্যু ঘটতে থাকে। চিন্তা, বুদ্ধি, মেধা, বিশ্লেষণক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার পরও কেউ যদি তাঁর মগজ নানা কাজে খেলাতে থাকেন, তবে নতুন নতুন সৃষ্টির বিস্ময়কর বিকাশ সম্ভব। **স্টিফেন হকিং-এর মতো পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী তার-ই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। অচল দেহ। কিন্তু সচল মস্তিষ্ক তাঁকে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী করেছে।**

'পারকিনসন্স' রোগী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ড. বিপ্লব দাশগুপ্ত দুজনের সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারতেন না, কথা বলতেন এতই জড়িয়ে যে তাঁর কাছের মানুষরাও কথার অর্থ বুঝতে পারতেন না। মুখ দিয়ে লালা পড়ত। প্রবীণ মানুষটি এইসব শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও কম্পিউটারে বসে লিখে গেছেন অনবদ্য সব অভিজ্ঞতা, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের অসাধারণ বিশ্লেষণ-ধর্মী নানা গ্রন্থ। তিনি জানতেন মস্তিষ্কচর্চাই তাঁকে অলজাইমার রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচাবে। এটাও জানতেন, পারকিনসন্স রোগীদের অলজাইমার রোগের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। অলজাইমার রোগী, চিন্তাশক্তি, বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। আর **অলজাইমার রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় ব্যাপক মস্তিষ্কচর্চা।**

ব্যাপক মস্তিষ্কচর্চা অব্যাহত রাখতে পারলে যুক্তিবোধ নব্বইতেও অতি তীক্ষ্ণ থাকে। হাতের সামনে উদাহরণ জর্জ বারনার্ড শ', নীরদ সি চৌধুরী, খুশবন্ত সিং, অন্নদাশঙ্কর রায়।

মস্তিষ্কের পুষ্টি

মস্তিষ্কচর্চার জন্য মস্তিষ্ককে কার্যক্ষম রাখা জরুরি। আর কার্যক্ষম রাখতে জরুরি মস্তিষ্কে পুষ্টি সরবরাহ অব্যাহত রাখা। মস্তিষ্কের পুষ্টি জোগায় রক্ত। চারটি মহাধমনী শুদ্ধ রক্ত 'হার্ট' থেকে বহন করে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়।

মস্তিষ্কের ওজন সাধারণভাবে দেহের ওজনের শতকরা ২ ভাগের মতো। কিন্তু সারাদেহে অনবরত যে রক্ত হার্ট থেকে প্রবাহিত হয়, তার শতকরা ১৫ ভাগই যায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের কাজের জন্য যে শক্তির দরকার, তা সরবরাহ করে 'গ্লুকোজ'। গোটা শরীরে যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, তার শতকরা ২০ ভাগ-ই খরচ হয় মস্তিষ্কে। এই গ্লুকোজ ও অক্সিজেন রক্তের সঙ্গেই মস্তিষ্কে যায়। অর্থাৎ রক্তই গ্লুকোজ ও অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়।

মস্তিষ্কে পুষ্টি সরবরাহ বন্ধ হলে স্ট্রোক, পক্ষাঘাত হতে পারে। রক্তের জোগান না পাওয়া বা কম পাওয়ার জন্য স্নায়ুকোষের মৃত্যুও হয়। দেহের কোন অংশে পুষ্টির জোগানে ঘাটতি হচ্ছে বা বন্ধ হচ্ছে, তার উপর শরীরে কী ধরনের অসুখ হবে, সেটাও নির্ভর করে।

প্রচুর পড়া মানেই মস্তিষ্কচর্চা নয়

আমার বউ সীমা প্রতিদিনই প্রচুর পড়েন। বাংলা ম্যাগাজিন দেশ, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, আনন্দমেলা থেকে পরিচয়, কৃত্তিবাস, লোক-সংস্কৃতি গবেষণা ইত্যাদি বাড়িতে যা আসে সবই পড়েন। দিনে দুপুর বেলায় পড়েন, রাতে বই না পড়লে ঘুম আসে না। তাই পড়েন, দুটো আড়াইটে পর্যন্ত।

পড়ে যান কিন্তু কোনো লেখা নিয়েই নিজে গভীর বিশ্লেষণে যান না। পড়ে ফেলা লেখা নিয়ে আবার ভাবতে বসেন না। প্রবন্ধে কোনো তত্ত্বগত ভুল, স্ববিরোধিতা, যুক্তির শ্লথতা বা অতি-সরলতা রয়েছে কি না—সেসব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণে যান না। গল্প-উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কোনো ভুল বা গোঁজামিল আছে কি না—এই নিয়ে ভাবতে বসেন না। এমন প্রচুর পড়িয়ে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাই গড়ে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ—অন্তত ভারতে।

এরা পড়ুয়া এবং মস্তিষ্কচর্চা করেন—এমনটা আদৌ বলা যায় না। মস্তিষ্কচর্চা শুরু করতে চাইলে আজ থেকেই শুরু করুন। যা পরে করবেন, তা আজ শুরু করাই ভালো, যদি তা ভালো কাজ হয়।

মস্তিষ্কচর্চা মানে ভাবনার চর্চা। নতুন নতুন ভাবনার চর্চা। সেটা একই বিষয়নির্ভর হতে পারে, আবার বিভিন্ন বিষয়-নির্ভর হতে পারে।

> **চিন্তাভাবনা একটা অভ্যাস। এই অভ্যাসকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের জন্য বই পড়তে হতে পারে, ওয়েবসাইট ঘাঁটতে হতে পারে, সিডি দেখার প্রয়োজন হতে পারে আবার কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কিছু দিন-মাস-বছর কাটাতে হতে পারে।**

অধ্যায় : তিন

মানসিক রোগের রকমফের

১) শারীরিক কারণে মানসিক অসুখ

জন্মের সময় শিশুকে যন্ত্রের সাহায্যে ডেলিভারি করাতে গিয়ে যদি শিশুর মাথায় যন্ত্র আঘাত করে থাকে তবে তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে পারে। দুর্ঘটনার কারণে মস্তিষ্কে চোট লাগতে পারে। ব্রেন টিউমার, এনকেফালাইটিস ইত্যাদি কারণে মানসিক রোগ হতে পারে।

কিডনি খারাপ হলে শরীরের দূষিত যেসব পদার্থ কিডনি শোধন করে, তা বন্ধ থাকে। দূষিত পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধিতে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। ফুসফুস ঠিকমতো কাজ না করলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ফলে মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

মানুষের শরীরে কিছু গ্রন্থি বা gland আছে। যেমন পিটুইটারি, থাইরয়েড ইত্যাদি। এইসব গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসা রস মস্তিষ্কের কাজে সাহায্য করে। **কোনো কারণে গ্রন্থিগুলো থেকে রস কম বা বেশি বের হলে মানসিক রোগ হতে পারে।**

এইসব কারণে মানসিক রোগ হলে মানসিক রোগের কারণ যে শারীরিক রোগ, তার চিকিৎসা খুবই জরুরি।

২) মনের কারণে মানসিক রোগ

ক) নিউরোসিস (Neurosis), স্নায়ুরোগ

খ) সাইকোসিস (Psychosis), উন্মাদ

নিউরোসিস (Neurosis)

প্রধানত পরীক্ষার সময় হঠাৎ করে স্মৃতি হারিয়ে ফেলা। সব পড়া ভুলে যাওয়া (Hysterical neurosis-dissociative type)।

কেস-হিস্ট্রি : ১

১৯৯৪ সালের ঘটনা। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু অনুপ সাতসকালে ফোন করলেন ল্যান্ড লাইনে। তখন মোবাইলের জনপ্রিয়তা ছিল না। সমস্যাটা একমাত্র সন্তান মেয়ে অনন্যাকে নিয়ে। ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আজ থেকে পরীক্ষা শুরু। কাল রাতে ও একটা অঘটন ঘটিয়েছে। হাতের শিরা কেটেছে ব্লেড দিয়ে। ডাক্তার এসেছেন। ব্লাড বন্ধ হয়েছে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন। এখন ও ঘুমোচ্ছে।

—কেন শিরা কাটলো?

—ও মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছে। গত বছর উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষা চলাকালীন আমার মা মারা যান। মা এ বাড়িতেই থাকতেন। অনন্যাকে খুব ভালোবাসতেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ও পরীক্ষায় ড্রপ দেয়। এবার পরীক্ষা যতই এগিয়েছে, ততই টেনশনে ভুগেছে। কাল সকাল থেকে ওর মনে হল—যা পড়েছে তা সবই ভুলে গেছে। তারপর রাতে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমার মিসেসও তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন। দেবো?

—দাও।

—আমি অনন্যার মা বলছি। মেয়েকে একবার এসে দেখুন। ওকে হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে যদি রিল্যাক্স মুডে নিয়ে আসেন তো আপনার উপকার কোনো দিন ভুলবো না।

—বললাম, ফোনটা ওর হাতে ধরিয়ে দিতে পারবেন?

—হ্যাঁ দিচ্ছি।

অনন্যাকে নিশ্চিত করলাম, তুমি এক মনে আমার কথা শুনতে থাক। তারপর মিনিট দশেক হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে আধাঘুম আধাজাগরণের অবস্থায় এসেছে অনুমান করে রিল্যাকসেশনের সাজেশন দিতে শুরু করলাম। তার মিনিট পাঁচেক পরে টানা টানা সুরে বলতে লাগলাম, তুমি আজ আর পড়বে না। আজ পরীক্ষা দিতে বসবে। কোশ্চেন পেপার হাতে পাওয়ার পর পড়তে শুরু করবে। কোশ্চেন পড়া শেষ হলেই দেখবে আন্সারগুলো সুন্দর মনে পড়ে যাচ্ছে। লিখতে শুরু করবে। খুব ভালো পরীক্ষা হবে।

তারপর পরীক্ষার দিনও সকালে সাজেশন দিলাম।

রেজাল্ট বের হতে দেখা গেল অনন্যা স্টার পেয়েছে।

১৯৯৪-এর ১ বৈশাখ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ছিল ত্রিপুরা হিতসাধনী হলে। ব্যবস্থাপক যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠান ছিল গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক ইত্যাদির। অনুষ্ঠানে হাজির হলেন অনুপ, অনন্যা ও অনন্যার মা। পত্রিকায় অনুষ্ঠানসূচি দেখে চলে এসেছেন। অনন্যার মা মাইকে কিছু বলতে চাইলেন। বললেন। প্রবীরবাবুই আমাদের ঈশ্বর। তারপর বললেন সেই পরীক্ষার ঘটনাটা।

কেস-হিস্ট্রি : ২

স্মৃতি হারাবার আরো একটি ঘটনা

সময়টা ২০০৯ সাল। একটি মেয়ের ফোন পেলাম একদিন। নাম বলল অনিমা। কাজোড়ায় থাকে। বি.এ. অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দিন কয়েক পরে। অনিমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী দিন কয়েক হল আগুনে পুড়ে মারা গেছে।

"এই ঘটনার পর থেকে পড়তে বসলেই বান্ধবী আগুনে পুড়ছে দেখতে পাই। এখন গত দু-দিন হল বুঝতে পারছি, পড়া বিষয়ও মনে করতে পারছি না। সব ভুলে গেছি। আমাকে বাঁচান।"

—তুমি আমার মোবাইল নম্বর কার কাছ থেকে পেলে?

—রানাদার এক বন্ধু দিয়েছে। আমি কি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

—তোমাকে আসতে হবে না। তুমি কি কোনো একটা বেডরুমে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে পারবে?

—হ্যাঁ, পারবো।

—মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খুব হালকা পোশাক পরে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে একটা পরিষ্কার বিছানায় আরাম করে শুয়ে পড়। শুয়ে আমার মোবাইলে একটা কল দেবে। মোবাইলেই তোমাকে হিপনোটিক সাজেশন দেব। তাতেই একদম ঠিক হয়ে যাবে।

অনন্যার মতোই ওকে সাজেশন দিলাম। অনিমা এখন ২০১১-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ফাইনাল দেবে।

কেস-হিস্ট্রি : ৩

Hysterical neurosis-dissociative type-এর আর একটি উদাহরণ রানা হাজরা। কাজোড়ারই ছেলে।

রানার সমস্যা ও উত্তরণের ঘটনা রানার লেখা থেকেই তুলে দিচ্ছি (প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ, প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং)।

"২০০৩, জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ছ'দিন দেরি। বাড়ি থেকে ফোনে খবর এল, মা মারা গেছেন। মা আমার সবচেয়ে প্রিয়। এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলাম না। যাদবপুর থেকে কাজোড়ায় ফিরলাম। বাড়ি গিয়ে মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলাম। আত্মীয়-পড়শিদের সহানুভূতির বান ডেকেছিল আমাকে ঘিরে। তাই তো কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তারের দেওয়া দুটো ঘুমের ওষুধ খেয়েও আমি নাকি ঘুমোইনি, তবে মনে মনে ভেবেছিলাম যে পরীক্ষা দেব-ই। বাড়ির সবার পরামর্শ ছিল পরীক্ষা না দেওয়ার। ফলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। মাথাও কাজ করছিল না ঠিকমতো। পুরোনো পড়া মনে করতে গেলে পারছি না। সব ভুলে গেছি। কোনো এক সময়ে প্রবীরদার ফোন এল।

কয়েকটি কথা, 'শুনেছি। কলকাতা আয়, পরীক্ষা দিতে হবে। ভালো থাক।'

প্রবীরদার একটা ফোন মনের জোর কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। দু'দিন পর সুবীরের সাথে কলকাতার মেসে ফিরলাম। আমি সাল, তারিখ, ফোন নম্বর অনেককিছু স্মৃতিতে রাখতে পারি। কিন্তু মানসিকভাবে বিধ্বস্ত আমি সেই সময়কার কথা মনে রাখতে পারিনি, পরে আমার কথা জেনেছি বন্ধুদের থেকে। মেসে ফিরে ঘুমোইনি। শুধু চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বই খুললেও, পড়িনি। এই অবস্থায় মেসের ছেলেরা সিদ্ধান্ত নেয়, প্রণবকে (দত্ত) দিয়ে প্রবীরদাকে ফোন করার। প্রণবের সাথে প্রবীরদার কাছে যাই। প্রণবের কথা অনুযায়ী দিনটা ছিল রবিবার। পরদিন পরীক্ষা ছিল।

কোনো সমস্যার কথা না বলে প্রবীরদা আমার সঙ্গে স্রেফ আড্ডা দিলেন, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট নিলাম। একসময় প্রবীরদা বললেন, 'আয় তোকে একটু রিলাকসেশন দিই।' আমাকে বিছানায় শুইয়ে হিপ্‌নোটিক সাজেশন দিলেন। সাজেশন ছিল রিলাকসেশনের। আধঘণ্টা পরে প্রবীরদা যখন আমার হিপনোটিক ঘুম ভাঙালেন, তখন মনে হয়েছিল এই কয়েক দিনের জট পাকানো মাথাটা হালকা লাগছে, রিল্যাক্সড্ লাগছে। তারপর আমরা দু'জনে আড্ডা দিতে দিতে ক্রিকেট খেলা দেখলাম টিভিতে। দুপুরে আমি, বউদি ও প্রবীরদা একসঙ্গে খেলাম। তারপর হঠাৎই বললেন, 'চল আমরা একটা অ্যাকশন করে আসি।'

মহাজাতি সদনে জ্যোতিষ সম্মেলন হচ্ছিল। সমিতির অনেক সদস্য-সদস্যাদের দেখলাম আসন দখল করে জ্যোতিষীদের বকবক শুনছে। প্রবীরদা আমাকে বললেন, 'তুই আজ আমার বডিগার্ড। নে তোর কাজ শুরু হল। আয় আমার সঙ্গে।'

প্রবীরদা ঝট্ করে মঞ্চে উঠে জ্যোতিষীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা এতজন বড় বড় জ্যোতিষী হাজির রয়েছেন, আর আমি এতোদিন ধরে উত্তর খুঁজছি—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান কিনা? চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলছি। আপনারা গণনা করে জানাবেন, তাঁদের মৃত্যু কবে হবে।'

'তারা নিউজ' চ্যানেল ছবি তুলছে। প্রবীরদা বললেন, 'আজ না বলতে পারলে আর একদিন না হয় উত্তর দেবেন। কবে উত্তর দেবেন টিভি ক্যামেরার সামনে জানিয়ে দিন।'

জ্যোতিষীরা সদলবলে ঝাঁপালো প্রবীরদার উপর। রোগা-পটকা আমার গায়ে তখন অদ্ভুত শক্তি এসে গেছে। একটু পরে দেখি আরো অনেকেই প্রবীরদাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন। পুলিশও ইতোমধ্যে হাজির। জ্যোতিষ সম্মেলন ভণ্ডুল। প্রবীরদার সঙ্গে দৌড়লাম জোড়াসাঁকো থানায়, জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে, সঙ্গে তারা টিভির গাড়ি।

রাতে ফিরে প্রবীরদার ফ্ল্যাটে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা। সোমবার সকালে প্রবীরদা বললেন, 'যা, মেসে যা। আজ তো পরীক্ষা। একটু বইয়ে চোখ বুলিয়ে নিস। নো টেনশন। পরীক্ষা দিয়ে আমাকে একটা ফোন করিস।'

মেসে ফিরলাম। দু-ঘণ্টার মতো বই খুলে চোখ বুলালাম। কলেজে গেলাম। পরীক্ষা ভালো হল। পরপর পরীক্ষা দিতে থাকি। রেজাল্ট ছিল আশি শতাংশের কাছাকাছি। না, কোনো অসদুপায় গ্রহণ করিনি। আমার ক্যারিয়ারকে পাল্টে দিয়েছিলেন প্রবীরদা।"

কেস-হিস্ট্রি : ৪

১৯৮৭-র ১ জুলাই, প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে সন্ধে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখি লোডশেডিংয়ের মধ্যে বৈঠকখানায় চার তরুণ আমারই অপেক্ষায় বসে। দুজন এসেছেন একটি সাইন্স ক্লাব থেকে, ওঁদের একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে। তৃতীয় তরুণ রবীন্দ্রনাথ পাইন জানালেন, তিনি এসেছেন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। চতুর্থজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী। দুই তরুণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে বিদায় দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের দিকে মন দিলাম। রবীন্দ্রনাথের ডাক-নাম রবি। বয়েস জানাল একুশ। অনুমান করলাম লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কেজি। পরনে সাদা টেরিকটনের ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি। ট্রাউজারের ফ্যাসানে আধুনিকতার ছোঁয়া; উরুর পাশে কালো সুতোয় মোটা করে লেখা Ashihara Kal-Kan (Karate)। হাফ-হাতা

গেঞ্জির জন্য বাহুর যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে হাউন্ডের মতো পেশির আভাস। রবির চোখের দৃষ্টি ও ফাঁক হয়ে থাকা এক জোড়া ঠোঁট স্পষ্টতই ওর মানসিক ভারসাম্যের অভাবের ইঙ্গিত বহন করছিল।

রবি কথা শুরু করল এইভাবে, "আপনি আমাকে বাঁচান, নইলে মরে যাব। আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।"

বললাম, "আমার দ্বারা তোমাকে যদি বাঁচান সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই বাঁচাব। তোমার সব কথাই শুনব, তার আগে বলতো, আমার ঠিকানা কোথা থেকে পেলে? কেউ তোমাকে পাঠিয়েছেন?"

"জুন সংখ্যা 'অপরাধ' পত্রিকায় আপনার একটা ইন্টারভিউ পড়ি গতকাল। লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়, কেউ যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেন, তবে সে আপনি। আমি অপরাধ পত্রিকার অফিস থেকেই আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।"

ইতোমধ্যে আমাদের জন্য লেবু-চা এসে গেল। দুটো কাপ রবি ও রবির বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "বাঃ, তুমি তো খুব তৎপর ছেলে।"

রবি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, না, তা নয়, আপনি যদি আমার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা বুঝতেন, মানে আমি যদি আমার মানসিক অবস্থা আপনার সামনে খুলে দেখাতে পারতাম, তা হলে বুঝতেন একান্ত বাঁচার তাগিদেই আমি আপনার ঠিকানার জন্য কালই লেখাটা পড়ে পত্রিকার অফিসে দৌড়েছি।"

"যাই হোক তুমি যখন আমার কাছে এসেছ তোমার সব কথাই শুনবো এবং সাধ্যমতো সমস্ত রকমের সাহায্য করব। ততক্ষণ বরং আমরা চা খেতে খেতে তোমাদের বাড়ির কথা শুনি।"

একটু একটু করে ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। মা, বাবা, সাড়ে চার বছরের ভাই পুকাই ও রবিকে নিয়ে ছোট সংসার। বাবা ঘনশ্যাম পাইন আপনভোলো মানুষ, গুণী যন্ত্রসংগীত শিল্পী। বহু ধরনের বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়েছেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের বহু জনপ্রিয় লঘু-সংগীত শিল্পীর সঙ্গে। অনেক সিনেমা এবং নাটকেও যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। স্থায়ী আবাস তৈরি করে উঠতে পারেননি। থাকেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে 'আলোছায়া' সিনেমা হলের কাছে ভাড়া বাড়িতে।

রবি 'আসিহারা কাইকান ক্যারাটে অরগানাইজেশন'-এর ফুলবাগান ব্রাঞ্চের নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষক। পার্ক সার্কাসে অরগানাইজেশনের প্রধান কার্যালয়। প্রধান পরিচালক ভারতীয় ক্যারাটের জীবন্ত প্রবাদ পুরুষ দাদি বালসারা। ফুলবাগান ব্রাঞ্চটা এল পার্কে। এখানে রবি ক্যারাটে শেখায় সপ্তাহে তিন দিন, রবি, বুধ ও শুক্র, সকাল ৬টা থেকে ৮-৩০। নিজে সিনিয়ার ব্রাউন বেল্ট। এবারই ব্ল্যাকে বেল্ট পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। বর্তমান অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি।

কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এমনকি বাংলার বাইরেও বহু ক্যারাটে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে রবি। কখনো দাদি বালসারার সঙ্গে, কখনো ব্যক্তিগতভাবে। শেষ প্রদর্শনী '৮৬-র সরস্বতী পুজোর দিন বেলেঘাটা কর্মী সংঘের মাঠে। সেদিন কনুইয়ের আঘাতে রবি আটটা বরফের স্ল্যাব ভেঙে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, ভালবাসা আদায় করেছিল। দুটো বিশাল বরফের চাঁই কেটে তৈরি হয়েছিল ওই আটটা স্ল্যাব।

রবি এবার আসল ঘটনায় ফিরল। বলতে শুরু করল, মাস দুয়েক আগের ঘটনা, সে দিনটা ছিল এপ্রিলের ২৫, শনিবার। খবর পেলাম রবি নামে একটা ছেলে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটা পেয়ে যখন দেখতে হাজির হলাম তখন দেরি হয়ে গেছে, পুলিশ লাশ নিয়ে চলে গেছে।

"পরদিন রবিবার, সকলে ক্লাবে ক্যারাটে ট্রেনিং দিয়ে বাড়ি এলাম ন'টা নাগাদ। আমাদের বাড়িতে এক উঠোন ঘিরে কয়েক ঘর ভাড়াটে। ক্যারাটের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলাম পাশের কার্তিক কাকুর ঘরে। এটা–সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে এক বাটি মুড়ি এসে গেল। হঠাৎ গতকালের রেলে কাটা পড়ার কথা উঠল। কাকুকে বললাম, গতকাল যে ছেলেটা কাটা পড়েছে সে নাকি আত্মহত্যা করেছে, নাম ছিল রবি। ওই রবির বদলে আমি রবি গেলেই ভালো হত।

"ওই রবির বদলে আমি রবি মরলে ভালো হত, এই কথাটা ঘুরে ফিরে বার কয়েক প্রকাশ করতে হঠাৎই কাকু আমার চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব মরার শখ হয়েছে, নারে?

"কাকুর ওই কথাটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে কেটে কেটে আমার মাথায় ঢুকে গেল। মাথার সমস্ত চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল। কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল। মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিল। থরথর করে কাঁপছিলাম। দু–পায়ের উপর নিজের শরীরকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। একসময় দেখলাম হাতের বাটি থেকে মুড়িগুলো ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠল। ঘরের চৌকাঠ পেরুলেই এক চিলতে বারান্দা। কোনো মতে বারান্দায় গিয়ে হাজির হতেই হড় হড় করে বমি করে ফেললাম। আমার চোখের সামনে ছয়–সাত বছর আগে দেখা একটা দৃশ্য ছায়াছবির মতো ভেসে উঠল।

"আশি বা একাশি সালের বর্ষাকালের সকাল। আনন্দ পালিত রোডের ব্রিজটার ওপর দিয়ে আসছিলাম বাজার করে। অনেক তলায় রেল লাইনের মিছিল, যথেষ্ট ন্যস্ত লাইন। দু-পাঁচ মিনিট পরপরই ট্রেন চলাচল করে, একটু দূরে লাইনের ধারে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটা আত্মহত্যা করবে না তো?

"মিনিট খানেক অপেক্ষা করতেই একটা ট্রেন আসতে দেখলাম। লোকটা চঞ্চল হল। ট্রেনটা কাছাকাছি হতেই লোকটা লাইনের উপর গলা দিয়ে দু'হাত দিয়ে লাইন আঁকড়ে রইল।

"তীব্র সিটি বাজিয়ে ব্রেক কষল ট্রেনটা। দু–পাশের চাকা থেকে আগুনের ফুলকি ছিটোতে ছিটোতে ট্রেনটা লোকটার উপর দিয়ে চলে গেল। গলাহীন শরীরটা পাথরের টুকরোর ঢাল বেয়ে নেমে এল। গার্ড নেমে দেহটা দেখে খাতায় কী নোট করে সিটি বাজিয়ে দিল। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টের দরজা জানলা দিয়ে উঁকি মারা অনেক উৎকণ্ঠিত মাথা নিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। এবার আমি কাটা মুণ্ডুটাকে দেখতে পেলাম। দু–পাশের রেললাইনের মাঝামাঝি পড়ে রয়েছে।

"আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার এই দৃশ্যটা সেইদিনে সেই রাতে বহুবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সারাটা রাত প্রচণ্ড আতঙ্কে জেগে কাটালাম।

"সকালে সকলের যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি এক অন্য মানুষ। ক্যারাটে ইনস্ট্রাক্টর রবিন পাইন তখন ভয়ে জবুথুবু একটা নব্বই বছরের বুড়ো।

আমার অবস্থা দেখে বাড়িওয়ালা কৃষ্ণগোপাল দেবনাথ আমাকে নিয়ে গেলেন কাঁকুড়গাছিতে তাঁর পরিচিত এক তান্ত্রিকের কাছে। প্রণামী হিসেবে দিতে হল এক কেজি চিনি, একটা মোমবাতি, একপ্যাকেট ধূপকাঠি ও একশো টাকা। তান্ত্রিকের নাম ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ঠিকানা ৬৮ মানিকতলা মেন রোড।

"তান্ত্রিকবাবা ধূপ মোমবাতি জ্বালিয়ে মড়ার খুলি নিয়ে কী সব মন্ত্র পড়লেন, ওটা নাকি 'খুলি চালান' বলে। তারপর জানালেন—আনন্দ পালিত রোডের ওই ট্রেনে কাটা পড়া লোকটার আত্মাই আমার এই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অতৃপ্ত আত্মা তিনজনকে রেল লাইনে টেনে নিয়ে আত্মহত্যা করাবে। তৃতীয় যে ব্যক্তিকে মারবে সে হল আমি।

"এই কথাগুলো শোনার পর আমার জিব শুকিয়ে গেল। কিছু বলতে পারছিলাম না। মাথায় যেন কেমন একটা অদ্ভুত শূন্যতা। শিরশিরে ভয়টা আরো বেশি করে মাথাচাড়া দিল। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম ট্রেনের আওয়াজ। দেখতে পেলাম আনন্দ পালিত রোডের লোকটাকে। লোকটা লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। বাঁ হাতটায় ধরে রাখল লাইন। ডান হাতটা তুলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম—না, যাব না।

"তান্ত্রিকবাবার ছেলে আমার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। শুনতে পেলাম তান্ত্রিকবাবার গলা—'আত্মাটা ওকে ডাকছে। ব্যাটা একে ছাড়বে না।'

"কৃষ্ণগোপালবাবু বললেন, 'একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে বাবা। কী করতে হবে বলুন।'

"একটা যজ্ঞ করতে হবে। তবে, ভূত ব্যাটা বড় সহজ পাত্র নয়।"

"বাড়ি এলাম আরো খারাপ অবস্থা নিয়ে। এসেই বিছানা নিলাম। ওই ২৬ এপ্রিলই ছিল শেষ ক্লাবে যাওয়া। শেখাবার মতো শারীরিক ও মানসিক জোর সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। মাঝে মধ্যে বন্ধুরা জোর করে বাইরে নিয়ে যায়, চুপ-চাপ বসে থাকি। গলায় হাতে কয়েকটা তাবিজ কবজ চেপেছে। কাজ হয়নি কিছুই। প্রচণ্ড ভয়ের শিরশিরানি নিয়ে প্রতিদিনই আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার ঘটনাটা ছায়াছবির মতোই আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। ট্রেনের প্রচণ্ড ব্রেক কষার আওয়াজ, আগুনের ফুলকি আর রেললাইনে গলা দেওয়া লোকটার হাতছানি আমাকে ভয়ে পাগল করে তুলেছে।

"একদিনের কথা, আমার এক ছাত্রের বাড়িতে গেছি। আমাদের দু-চারটে বাড়ির পরেই থাকে। বাড়িতে একনাগাড়ে শুয়ে-বসে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম বলেই যাওয়া। এটা-ওটা নিয়ে কথা বলছিলাম। ছাত্রের ছোট ভাই খাতাতে একটা কী আঁকছিল। ঝুঁকলাম দেখতে। একটা ট্রেনের ছবি। মুহূর্তে আমার কানে ভেসে এল ট্রেনের প্রচণ্ড আওয়াজ। চোখের সামনে দেখতে পেলাম একটা ট্রেন প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষল। চাকা আর লাইনের তীব্র ঘষটানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম দু-পাশে আগুনের ফুলকি। ভয়ে শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। মাথাটা কেমন চিন্তাশূন্য হয়ে গেল, চিৎকার করে উঠলাম। পরে শুনেছি, আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

"আমি বুঝতে পারছিলাম, একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছি। এমনিভাবে বেশিদিন বাঁচা যাবে না। আত্মার ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুই সবচেয়ে সুন্দর পথ বলে একসময় ভাবতে শুরু করলাম। এই সময় এক প্রতিবেশীর উপদেশে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসার জন্য হাজির হলাম। দিনটা ছিল ৪ জুন।

"ডাক্তারবাবু সব শুনে বোঝালেন—আত্মা-টাত্মা কিছু নেই, এটা মনের ভয়। ওষুধ লিখে দিলেন। মানসিক রোগের চিকিৎসা শুরু হল। ওষুধ খেয়ে ঘুমোই খুব কিন্তু জাগলেই সেই প্রচণ্ড ভয়ের মুহূর্তগুলো হাজির হতে থাকে। প্রচণ্ড পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় জিবটা কে যেন পেছন দিকে টানছে। আত্মহত্যার দৃশ্যটা আমাকে মুক্তি দেয়নি একটি দিনের জন্যেও। দিন দিন শক্তি কমেছে, কমেছে স্মরণশক্তিও। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করলাম চিকিৎসা-বিজ্ঞান আমাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। প্রতিটি দিনের অসহ্য যন্ত্রণার থেকে নিজেকে মুক্ত করার পথ নিজেই বেছে নিলাম। তিরিশে জুন সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম আত্মহত্যা করব। সেদিন দুপুরে আমার এক বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার হাতে তুলে দিল জুন সংখ্যা 'অপরাধ' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। বলল, পড়ে দেখ ভূত-প্রেত, আত্মা কিছুই নেই, বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন প্রবীর ঘোষ। লেখাটা পড়লে আমাদের পুরোনো ধ্যান-ধারণাগুলো বড় বেশি মিথ্যে মনে হয়।

"লেখাটা পড়ে ফেললাম। বারবার পড়লাম। কেমন যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলাম। মনে হল, আপনি আমাকে ঠিক করতে পারবেন। আপনার ঠিকানা চাই। বন্ধুকে নিয়ে কাল বিকেলেই গেলাম 'অপরাধ' পত্রিকার অফিসে। ঠিকানাটা পেয়ে আজ আপনার কাছে এসেছি। আজকাল আমি পথে বেরুতে ভয় পাই। একটা মোটরের হর্ন বা সাইকেলের ঘণ্টা শুনলেই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠি।"

"হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন সঙ্গে এনেছো?" জিজ্ঞেস করলাম।

"প্রেসক্রিপশনটা আপনার কাজে লাগাতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছি। এই যে—"

দেখলাম। ৪/৬/৮৭ লেখা আছে—

Tryptanol 25 mg.
1 tab at noon
2 tabs at evening
for 3 days.

পরবর্তী এক তারিখে লেখা—

Tryptanol 25 mg.
1 tab at noon
3 tabs at evening

পরবর্তী এক তারিখে লেখা আছে—

Tab tryptanol 25 mg.
1 tab 3 times daily
Tab Eskazine 1 mg.
1 tab 3 times daily

রবির সঙ্গে গল্প-গল্প করতে করতে খোলা-মেলা একটা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললাম। কথাবার্তার মধ্য দিয়েই ওদের পারিবারিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা জানতে পারলাম।

রবির কথামতো—জ্ঞান হয়ে অবধি বাবার কাছ থেকে শুনে আসছে, তার দ্বারা কিছু হবে না। বাবা ছেলেকে যতটা না মানুষ হওয়ায় সুযোগ দিয়েছিলেন, যতটা না পড়াশুনার সুযোগ দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভর্ৎসনাই করেছেন। যত্ন করে বাজনার তালিম না দিয়েই বারবার ঘোষণা করেছেন, বাজনা বাজানো তোর কর্ম নয়, আমার ঘাড়ে বসে না থেকে এখন থেকে চরে খাওয়া চেষ্টা কর। রবি তার শিল্পী–বাবাকে ভালোবাসে কিন্তু তার শাসক বাবাকে একটুও শ্রদ্ধা করতে পারে না। রবি চরে খাওয়ারই চেষ্টা করেছে। বেছে নিয়েছে বেপরোয়া জীবন। খেলা হিসেবে নিয়েছে ক্যারাটেকে। জীবনচর্চাতেও প্রতি পদে পদে পেশিশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছে। একসময় পড়াশুনোয় আকর্ষণ হারিয়েছে। রবির ষোল–সতের বছর বয়সে পৃথিবীর আলো দেখেছে রবির ভাই। রবিকে বাবার কাছে শুনতে হয়েছে, দুনিয়ার ছেলেরা টুকে পাস করছে, তুই এমনই অপদার্থ যে টোকার ক্ষমতাটুকুও নেই। স্কুলের গণ্ডি পেরুতে না পারলে কোনো কাজই জুটবে না। তখন হয় ভিক্ষে করে খেতে হবে না হয় চুরি ডাকাতি করে।

রবির জীবনে একমাত্র প্রেরণা ছিলেন দাদি বালসারা। খুব উৎসাহ দিলেন। বালসারা ইতোমধ্যে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীকে হারালেন। স্ত্রী ছিলেন দাদি বালসারার জীবনের অনেকটা জুড়ে। বালসারার ক্যারাটের প্রতি উৎসাহ ছাত্রদের প্রতি উৎসাহ হঠাৎ কেমন যেন নিভে গেল। রবির জীবনের প্রেরণার আলোটুকুও নিভে গেল। নেমে এলো অন্ধকার। বাবার অনিয়মিত আয়, আর্থিক অনটন, দীর্ঘদিনের বাকি পড়া ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালার বাড়ি ছাড়ার নোটিশ। সকালে ঘুম থেকে উঠে গঞ্জনা, দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাইয়ের দেশাশুনো করা, স্নান করান, খাওয়ান। নিজে আধপেটা খাওয়া অথবা একেবারেই না খেয়ে থাকা, বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাউণ্ডুলের মতো উদ্দেশ্যহীন ঘোরা, রাতে ফিরে আবার সেই অনটনের সংসারে গাল–মন্দ শোনা এটাই প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবির নিজের চোখে নিজেকে ছোট করে ফেলেছিল।

রবির সঙ্গে অনেক কথা হল, অনেক গল্প। ভূত প্রসঙ্গে 'অপরাধ'–এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটির কথাও এলো। বুঝতে অসুবিধে হল না, সাক্ষাৎকারটি রবিকে জোর নাড়া দিয়েছে। ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ চেপে বসেছে ওর মনে। ভূত ভর, আত্মা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ টেনে আলোচনায় মেতে উঠলাম, ভূতে ভরের কিছু কিছু নেপথ্য কাহিনী শোনালাম। ওসব নিয়ে ওর মনে জেগে থাকা প্রশ্নগুলো একে একে বেড়িয়ে এলো। ওর যুক্তির কাছে যাতে গ্রহণযোগ্য মনে হয় সে কথা মাথায় রেখেই উত্তর দিলাম। একসময় জিজ্ঞেস করলাম, "২৬ এপ্রিলের পর কোনোদিন ট্রেনে উঠেছ?" রবি উত্তর দিল, "না। ট্রেনকে এখন আমি এড়িয়ে চলি। মনে হয় ট্রেনে চড়লে আমি বোধহয় চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

রবিকে বললাম, "তুমি কি এই ঘটনার পর কখনো রেল লাইনের ধারে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছ?"

"না। অসম্ভব! ও আমি কিছুতেই পারব না। ওই সময় লাইনে ট্রেন এসে পড়লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারবো না। ট্রেনের তলায় কাঁপিয়ে পড়বই।" বলল, রবি।

বললাম, "তোমার সঙ্গে যদি আমি থাকি এবং তোমার দু–হাত দূর দিয়ে একটা ট্রেন ঝড়ের গতিতে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভয় না পাও বা ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে না পড়, তা হলে তোমার ভয় কাটবে তো?"

রবির চোখে উচ্ছ্বলতা লক্ষ্য করলাম, "আপনি পারবেন আমার সামনে দিয়ে চলন্ত ট্রেন পাস করিয়ে দিতে? যদি পারেন তবে নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পাব, ভয় কেটে যাবে।"

"ঠিক আছে, আগামী রবিবার সকাল ৯টার মধ্যে এখানে চলে এস। তুমি আর আমি যাব এমন কোনো একটা স্পটে, যেখানে দিয়ে তীব্র গতিতে ট্রেন চলাচল করে। দু-তিনটে ট্রেন তোমার সামনে দিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আমরা অপেক্ষা করব ট্রেনের হাত দুয়েক দূরে। প্রতিবারই ট্রেন চলে যাওয়ার পর দেখতে পাবে তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই আছ, ঝাঁপিয়ে পড়নি।"

"আঙ্কল, আপনি যদি সত্যিই এমনি করতে পারেন তবে আশা করি আমার ভয়টা কেটে যাবে। আর ভালো হয় যদি আপনি আমাকে আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার স্পটে দাঁড় করিয়ে ট্রেন পাস করিয়ে দিতে পারেন। এমনটা পারলে আমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাব, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব।"

বললাম, "বেশ তাই হবে, তবে ওই কথাই রইল, তুমি আগামী রবিবার সকাল ৯টার মধ্যে এখানে চলে এস।"

কলকাতার বাইরে না থাকলে রবিবার সকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, অপরিচিতদের ভিড় হয় আমার ফ্ল্যাটে। সেই রবিবারেও সকাল থেকে বন্ধুদের আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে ৯টায় তখনো রবি এলো না। ঠিক করলাম আমিই ওর বাড়ি যাব। ঠিকানা জানি, অতএব সমস্যা নেই।

"আমাকে এখনই একবার বের করতে হবে।" এ কথা বলে আসরের ছন্দপতন ঘাটালাম। দু-একজন কারণ জানতে চাওয়ায় সংক্ষেপে রবির ঘটনা জানালাম। বেশ কয়েকজন আমার সঙ্গী হতে চাইলেন, এঁদের মধ্যে একজন হলেন ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট লোলিত সাউ।

লোলিত বলল, "দাদা, আমি আপনার সঙ্গে যাই। রবি যাতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে আমি দেখব। এমনভাবে ধরে রাখব যে ও লাফাবার সুযোগই পাবে না।"

বললাম, "লোলিত, তোমার ধারণাই নেই এই ধরনের মানসিক রোগীরা কী অসম্ভব ধরনের শক্তি বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারে। এই ধরনের একজন মানসিক রোগগ্রস্ত দুর্বল শরীরের মহিলাও বিশেষ মানসিক অবস্থায় যেমন ভূতে পেয়েছে ভাবলে, এতই সবল হয়ে ওঠে যে পাঁচজন সবল পুরুষও তাকে শক্তি প্রয়োগে সামাল দিতে পারে না।"

"সবচেয়ে বড় কথা হল, এমনি করে ওকে ধরে-বেঁধে ট্রেনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে ওর মনের ভয় দূর হবে না।

"তা ছাড়া যেভাবে ওর মানসিক চিকিৎসা করতে চাই, তাতে বহুর উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। এতে ও আপনাদের দিকে, আপনাদের কথার দিকেও আকর্ষিত হবে। ফলে আমার কথাগুলোকে ওর চিন্তায় গভীরভাবে ঢোকাতে ব্যর্থ হব। আর এই ব্যর্থতা মানেই, ট্রেন আসবে, রবি আতঙ্কিত হবে, আত্মার আহ্বান শুনতে পাবে, ঝাঁপাবে এবং মরবে। পরিণতিটা আমার এবং সমিতির পক্ষেও ভালো হবে না।"

শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলাম মধুসূদন রায় ও চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়কে।

রবি বাড়িতেই ছিল। বাবা সকালেই বেরিয়েছেন রিহারসাল দিতে। মা যোগমায়া দেবীকে পরিচয় দিতে ঘরে নিয়ে বসালেন। রবি চৌকিতে জবুথবু হয়ে বসেছিল। যোগমায়া জানালেন, "কাল সারা দিনরাত রবি শুধু কেঁদেছে। ওর মতো একটা জোয়ান ছেলে বাচ্চাদের মতো কাঁদছে এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আজ ওর যা শরীর ও মনের অবস্থা তাতে ওর পক্ষে একা আপনার বাড়ি যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওর বাবার আজ রিহারসালে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, ফিরে এসে রবিকে নিয়ে আপনাদের বাড়ি যাবেন। সাড়ে আটটার সময় আমি রবিকে বললাম, চল্ আমি তোকে প্রবীরবাবুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। রবি কিছুতেই রাজি হল না। কাল থেকে রবি বারবার বলছে, "আমি আর বাঁচব না, মরবই। এই কষ্ট সহ্য করার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভালো।"

ইতোমধ্যে কয়েকজন প্রতিবেশী এলেন আমার আসার খবর পেয়ে। আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলাম না। রবির সঙ্গে দু-একটা কথা বলে বললাম, "চল, আনন্দ পালিত রোড থেকে ঘুরে আসি।"

রবিকে নিয়ে আমি, কুমার আর মধুদা (মধুসূদন রায়) এলাম আনন্দ পালিত রোডে। চার দিন আগে রবির মানসিক অবস্থা যেমন দেখেছিলাম, আজকের অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ বলে মনে হল।

একসময় সেই ব্রিজের উপর উঠলাম, যে ব্রিজ থেকে রবি আত্মহত্যা করতে দেখেছিল। ব্রিজের একটু দূরে বাঁদিকের একটা জায়গা দেখিয়ে রবি বলল, "ওইখানে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনটা আসতেই লোকটাকে চঞ্চল হতে দেখেছিলাম। তারপর...।"

তারপরের কথাগুলো না শুনে ব্রিজের দু-পাশে আনাজপাতি, শাকসবজি নিয়ে বসা লোকগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললাম, "এখানে আনাজপাতির দাম কেমন?"

রবি বলল, "অ্যাঁ, কী?"

আমি একটা দোকানির সামনে দাঁড়িয়ে পেঁপে আর থোড়ের দাম করতে শুরু করলাম, কিনলাম পাকা কলা।

একসময় আমরা কলা খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করলাম। কথা বলছিলাম সেই সঙ্গে, "এখানে জিনিসপত্তর তো খুব সস্তা। তোমরা আগে এখানে কোথায় থাকতে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

দূরে দৃশ্যমান একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওই বাড়িটার দুটো বাড়ি পরেই।"

ব্রিজ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে রেল-লাইনের ওপর এসে পড়লাম। আমি ওকে শোনাচ্ছিলাম, আমার একটা কাহিনির ওপর ফিল্ম তোলার ইচ্ছের কথা। কাহিনিটার একটু একটু অংশ ওকে শোনাচ্ছিলাম।

লাইনের পাশ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। আমি বলে চলেছিলাম আমার কাহিনির কথা। সেখানেও ফিল্মে রেললাইন ও ট্রেনকে কীভাবে ব্যবহার করবো, ট্রেনের চলার গতির সঙ্গে কী ধরনের আবহ সঙ্গীত প্রয়োগ করবো বলে ভেবে রেখেছি, তাও শোনাতে লাগলাম।

রবি সিনেমা, শুটিং, আবহ সঙ্গীত এসবের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে। এসবের সঙ্গে ওর একটা গোপন ও গভীর সখ্যতা আছে। রবি শুনছিল, মতামত জানাচ্ছিল। আমি কথার মাঝেই হালকাভাবেই ছ-সাত বছর আগের আত্মহত্যার স্পটটা জানতে চাইলাম।

স্পটে এসে আমি ও রবি দাঁড়ালাম। মধুদা ও কুমার দাঁড়ালেন কিছুটা দূরে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি রেল লাইনের হাত দেড়েক দূরে। এখান থেকে পাথরের টুকরোগুলো ঢিবির আকারে রেল লাইন পর্যন্ত উঠে গেছে।

ব্যস্ত লাইন। মিনিট তিনেকের মধ্যে আমাদের লাইনে গাড়ি আসতে দেখলাম। আমার কাহিনি ঘিরে সিনেমা তোলার গল্প কিন্তু চালুই ছিল। রবিকে ট্রেনটা দেখিয়ে বোঝাতে লাগলাম, ঠিক কীভাবে ক্যামেরা প্ল্যান করার কথা ভেবেছি। নিজের একটা চোখ বন্ধ করে খোলা চোখের সামনে আমার একটা হাতকে দূরবিনের মতো করে দেখতে লাগলাম। রবিকেও দৃশ্যটি বোঝার স্বার্থে আমার মতো করে ট্রেনের দিকে দৃষ্টি দিতে বললাম। বলে চললাম, "এবার লাইনের ওপর দিয়ে চাকাগুলো গড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা লক্ষ্য কর। এমন দৃশ্যই তুলব।"

ট্রেন ইতোমধ্যে অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল। রবিকে বললাম, "লক্ষ্য কর, ট্রেনের চাকা যতই আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে ততই দেখতে পাচ্ছি ছন্দোবদ্ধভাবে লাইনগুলো মাটিতে বসে যাচ্ছে এবং উঠে আসছে। এই যে এখন চাকাগুলো আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। দেখ, প্রতিটি চাকা আমাদের কাছে যখনই আসছে তখনই লাইনটা মাটিতে চেপে বসছে। চাকাটা চলে যেতেই কেমন সুন্দর ট্রেনের ও লাইনের আওয়াজ হচ্ছে। এর সঙ্গে একটু মজার এফেক্ট মিউজিক কম্পোজ করলে দৃশ্যটা দারুণ উতরোবে।" ট্রেনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা সুর কণ্ঠ থেকে বের করছিলাম। ট্রেনটা যতক্ষণ না আমাদের অতিক্রম করে গেল ততক্ষণই আমি গলা থেকে আবহ সঙ্গীত বের করে গেলাম। ট্রেনটা আমাদের অতিক্রম করে যেতে রবিকে বললাম, "রবি, ট্রেন কিন্তু আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে।"

আমার কথায় রবির ঘোর কাটলো। অদ্ভুত উচ্ছ্বলতার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আঙ্কল, আমার কিছু হয়নি। ট্রেনে ঝাঁপাইনি। আমি ভালো হয়ে গেছি।"

ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে দৃঢ় করমর্দন করল। মধুদা ও কুমার এগিয়ে এলেন। ঘটনার পরিণতিতে ওঁরাও খুশি। মধুদা রবিকে বললেন, "কী হল, ভয় কেটেছে?"

আমার কাছের একটা গাছের তলায় বাঁধান বেদীর ওপর বসলাম। কিছুক্ষণ চারজন হালকা মেজাজে গল্প করলাম। একসময় রবি বলল, "আঙ্কল, আর একটা ট্রেন পাশ করিয়ে দেবেন?"

বুঝলাম, রবি তার আত্মবিশ্বাসকে আরো একটু বাড়িতে নিতে চায়। উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "বেশ তো চলো।"

আমরা দুজনে আবার লাইনের সামনে দাঁড়ালাম। এবারো হাঁটতে হাঁটতে সেই ফিল্মের কাহিনিতে রবিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। লাইন দিয়ে চাকা গড়িয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে লাইনের ওঠা-নামা এবং ঘটাং ঘট্ ঘট্ একটানা শব্দ, এরই সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমার গলার সুরকে। এবারো ট্রেন চলে গেল রবির কোনো বিপদ না ঘটিয়ে।

ট্রেন চলে যেতে রবি উল্লাসে লাফিয়ে উঠল, "ওঃ, এবারো আমার কিছু হয়নি। অর্থাৎ আমার আর কিছু হবে না।"

তারপর সে এক অন্য রবি। শিথিল ঠোঁট, ঝুলে পড়া চোয়াল ও ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির রবি পাল্টে গেছে। হৈ-চৈ তুলে আমাদের একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। ওই চা খাওয়ালো। ট্যাক্সি ডাকতেই হাত নেড়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিদায় করে বলল, "বাসেই ফিরবো।"

রবিদের স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়াতে রবি নেমে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করলো প্রবল শব্দে। বাস চলতে শুরু করতেই চলন্ত বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ে চেঁচালো, "আঙ্কল, মাঝে মধ্যে আপনার বাড়িতে গিয়ে একটু জ্বালিয়ে আসবো।"

বললাম, "বেশ তো, যখন ইচ্ছে চলে এসো।"

চলন্ত বাস থেকে টুক করে নেমে পড়ে রবি জানিয়ে দিয়ে গেল ও সম্পূর্ণ সুস্থ।

একে কী বলবো? সম্মোহন, একটু অন্যভাবে।

২১ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রবি আবার এলো। বসার ঘরে তখন মেলা ভিড়। পাক্কা তিন ঘণ্টা সকলকে না ধরনের ক্যারাটে আর আইকিদো দেখিয়ে জমিয়ে রেখে বিদায় নিল। যাওয়ার আগে দুটো কথা জানিয়ে গেল, এক, আগামী ব্ল্যাক বেল্টের পরীক্ষায় রবি নামছে, প্র্যাকটিসও শুরু করেছে। দুই, ৬ জুলাই তারিখেই কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে মনোরোগ বিভাগে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন আছ?"

"কেমন দেখছেন?"

"ভালোই তো দেখছি।"

"সত্যিই ভালো আছি, একদম ভালো।"

"দিনে দিনে তো তোমার অবস্থা অবনতিই হচ্ছিল, হঠাৎ এমন আশ্চর্যজনক পরিবর্তন?"

আমার সঙ্গে যোগাযোগ এবং আমার মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতির পুরোটাই ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছে রবি।

প্রেসক্রিপসনে ডাক্তারবাবু লিখেছেন, "stop medicine".

ইতোমধ্যে রবির কাজের একটা সুরাহা হয়েছে। রবি মাঝে মধ্যে আমার কাছে আসে। আমার সঙ্গে, আমার স্ত্রী সীমা ও আমার ছেলে পিনাকীর সঙ্গে গল্প করে। লক্ষ্য করেছি, রবি আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। বিশ্বাস করে ও আর অপদার্থ নয়। সমাজে ওরও কিছু দেওয়ার আছে। ও কারো বোঝা নয়, বরং সংসারকে সাহায্য করবে।

রবির মুখ থেকে যেদিন ওর ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়ার খবরটা পেলাম সেদিন সম্ভবত রবির চেয়ে কম আনন্দ আমি পাইনি।

মনোরোগ তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, হিংসাত্মক ঘটনাবলি, বেকারত্বের ও দারিদ্র্যের বিভীষিকা, জীবন নির্বাহে প্রতিনিয়ত ব্যয় বৃদ্ধি, ধর্ম-বর্ণ বা রাজনৈতিক অত্যাচার, ভয়, শোষণ, প্রতিবাদহীনভাবে অন্যায়কে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া অনিশ্চয়তা, ভয় এসব থেকেও আসে মনের রোগ। আমরা মনোরোগীর আশপাশের সুস্থ মানুষরা রোগীদের প্রতি মানবিক হয়ে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মতো পরিবেশ সৃষ্টিতে কিছুটা সাহায্য করতে পারি

কি না—নিশ্চয়ই দেখতে পারি। আমরা মানবিক হবার শিক্ষা দিতে পারি ঘরে, শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, খেলার মাঠে, জীবনের চলাফেরার প্রতিটি ক্ষেত্রে, 'মূল্যবোধ' 'শিক্ষার সার্থকতা' মানবিকতার বিকাশে প্রাচীন সংস্কৃতির গালভরা দৃষ্টান্ত টেনে নয়।

চিকিৎসার কথা এলেই চিকিৎসকের কথাও এসে যায়, এসে যায় তাঁদের অনেকেরই পেশাগত অসাধুতার কথা। এঁরা অনেকেই মানসিক রোগীদের সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে অর্থ প্রসবকারী সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক। অথচ মানসিক রোগীদের কথা বিস্তৃতভাবে না শুনে বিধান দেওয়া অসম্ভব। বিধান ঠিক কি ভুল, বিধানে রোগীর ক্ষতি হবে কি অক্ষতি, সে প্রশ্ন অর্থলোলুপ চিকিৎসকদের কাছে একান্তই গৌণ।

এ বিষয়ে আমার-আপনার সচেতনতা, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধই পারে অর্থলোভী চিকিৎসকদের কাজে মনোযোগী হতে বাধ্য করতে।

অধ্যায় : চার

Hysterical neurosis—Conversion type

কোনও কার্য-কারণ সম্পর্ক ছাড়াই মানসিক কারণে শারীরিক অসুস্থতাকে বলে হিস্টিরিকাল নিউরোসিস—কনভারসন টাইপ।

এই রোগের খোঁজ পাওয়া যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধরত সেনাদের অনেকেই দৃষ্টি হারায়, শ্রবণশক্তি হারায়, স্মৃতি হারায়।

ডাক্তাররা এর কোনো কারণ খুঁজে পাননি, কারণ, চোখ, কান ঠিক ছিল। রোগীদের পাঠান হয় মনোবিদ ও মনোচিকিৎসকদের কাছে। তাঁরা দীর্ঘ পরীক্ষার পর মত দেন যে—এইসব রোগের কারণ মস্তিষ্ক কোষ। রোগী সেনাদের মন বীভৎস হত্যার ব্যাপকতা সহ্য করতে পারেনি। তারা এত হত্যা-রক্ত দেখতে চাইছিল না, ট্যাঙ্ক, বোমা, বন্দুকের অনবরত শব্দ শুনতে চাইছিল না, যুদ্ধের ভয়ংকর স্মৃতি ধরে রাখতে চাইছিল না। এই না চাওয়ার তীব্র আকুতি থেকেই তারা দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি ও স্মৃতি হারিয়েছে।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় কিছু ছাত্র-ছাত্রীর আঙুল শক্ত হয়ে যায়, কলম ধরার অবস্থায় থাকে না। পরীক্ষাভীতি থেকে এমন ঘটনা ঘটে। এইসব ক্ষেত্রে মনোবিদদের সাহায্য নিলে সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে।

আংজাইটি নিউরোসিস (Anxiety neurosis) উৎকণ্ঠা

কিছু মানুষ আছে সব সময় বাড়তি টেনশনে ভোগে। সব কিছুতেই উৎকণ্ঠা।

চাকুরে ছেলে অফিস থেকে যখন ফেরে, তার আধঘণ্টা আগে থেকেই মা'র উৎকণ্ঠা শুরু হয়। বাড়ি থেকে বাস স্ট্যান্ড দশ মিনিটের পথ। মা আধঘণ্টা আগে থেকেই বাড়ি ও বাসস্ট্যান্ড যাতায়াত করতে থাকেন।

এদের উৎকণ্ঠা সবেই।

ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে কেউ বারবার হিসি করে, পটি করে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ট্রান্সফার অর্ডার পেলেই হাঁপানি প্রবলভাবে আক্রমণ করে।

এমন বহু রকম উৎকণ্ঠা আছে। এসব ক্ষেত্রে মনোবিদ ও মনোরোগ চিকিৎসক একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। আবার মনোবিদ অনেক সময়ই রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারেন। কিন্তু শুধুমাত্র ওষুধ দিয়ে এইসব অসুখ সারিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব।

মনে রাখতে হবে উৎকণ্ঠা বা আংজাইটি বহু রোগের কারণ। হার্ট, লাংস, পেশির খিঁচুনি, ঘাড় ও পিঠ ব্যথা, অনিদ্রা, পেটের গোলমাল, কোষ্ঠকাঠিন্য, আলসার, বুক ধড়ফড়, কামশীতলতা, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি এক বা একাধিক অসুখের সম্ভাবনা থাকে।

আতঙ্ক (Phobia) বা (Phobic neurosis)

ফোবিয়া হল যুক্তিহীন আতঙ্ক। অহেতুক আতঙ্ক। কেউ আরশোলা দেখে আতঙ্কিত হয় তো কেউ কুকুর, বিড়াল, টিকটিকি, সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়। কেউ বাসে, ট্রামে, ট্রেনে বা লিফটে চড়তে ভয় পায়, কেউ উঁচু জায়গায় উঠলে ভয় পায়, কেউ ফাঁকা মাঠে ভয় পায়, কেউ একা থাকতে ভয় পায় তো কেউ রক্ত দেখে জ্ঞান হারায়, কেউ অন্ধকারকে ভয় পায়, কেউ ভিড়ে ভয় পায়, কেউ আগুনে ভয় পায়, তো কেউ জলে।

এসব ক্ষেত্রে সেরা চিকিৎসা সম্মোহনের সাহায্যে রিল্যাকসেশন নেওয়া। তারপর যেই অবস্থায় ভয় পায়, সেই অবস্থায় সাজেশন দিয়ে নিয়ে আসা এবং তারপর সাজেশন দেওয়া ভয় লাগছে না, ভয় লাগছে না, ভয় লাগছে না...

এই সাজেশন অডিও ক্যাসেটে রেকর্ড করে দিন। রোগীকে বলুন, একটা ফাঁকা ঘরে সুন্দর বিছানায় হালকা পোশাকে শোবেন। ঘরে থাকবে স্বল্প আলো। তারপর ক্যাসেটটা শুনতে থাকুন। যখন ক্যাসেট বন্ধ হবার হয়ে যাবে। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে শুয়ে থাকুন। ফোবিয়া থেকে আপনি মুক্তি পাবেন–ই।

হতাশা ও অবসাদ (Depressive neurosis)

প্রেমে ব্যর্থ তরুণ-তরুণী হতাশায় ভোগে। কঠিন অসুখে ভুগতে ভুগতে হতাশা আসে। হতাশার কারণ হতেই পারে দারিদ্র। রাষ্ট্রীয় বা পার্টির প্রবল সন্ত্রাসের মধ্যে থাকতে থাকতে অবসাদ আসে। জাতিদাঙ্গা রায়টে বহু মানুষ অবসাদ ও হতাশা থেকে নানা ধরনের মানসিক রোগের শিকার হয়। আবার অকারণে দুঃখ আসে। এই অকারণ দুঃখ থেকে মনোবিকার দেখা দেয়।

রিল্যাকসেশনের সাজেশনে কিছুটা মানসিক জোর বাড়াতে পারে।

বাধ্যতামূলক পীড়নে অথবা আত্মবিশ্বাসের অভাবে আচ্ছন্ন (Obsessive Compulsive neurosis)

অনেক ধর্মীয় সংগঠনের সন্ন্যাসী, পীর, নানদের কেউ কেউ চাকরি ছেড়ে, অধ্যাপনা ছেড়ে এই জীবনে এসে শেষ পর্যন্ত অনুভব করছেন, ঈশ্বর-আল্লা সবই অবাস্তব চিন্তা। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। যা মিথ্যে তার পক্ষেই প্রচার করতে হচ্ছে। **এ হল বাধ্যতামূলক পীড়ন।**

অনেকেই অফিসের ড্রয়ার লক করার পরও ফেরার জন্য পা বাড়িয়েও আবার এসে লকটা ঠিক বন্ধ করা আছে কিনা আবার পরীক্ষা করে যায়। অনেক সময় এমনটা করে দুবারেরও বেশি। **এ হল আত্মবিশ্বাসের অভাব।**

ঘরের দরজা বন্ধ করেও অনেকে আবার ফিরে ফিরে এসে পরীক্ষা করে।

আবার **অনেকে এই রোগে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়।** বারবার হাত-পা-বাসন-ঘর ধোয়াধুয়ি করে।

কেউ আবার পথ চলতে চলতে প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট ছুঁয়ে যায়। ভাবে, না ছুঁলে অমঙ্গল হবে, কাজে বাধা পড়বে।

ভগবানের ছবি দেখলে কারো কারো মনে হয়, ছবির উপর পা তুলে ফেলবে।

কোনো কোনো ছেলে মহিলাদের চোখের দিকে বা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। তার পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। কারণ সেই সব ছেলেদের মনে হয় মুখ বা চোখের দিকে তাকাতে গেলেই বুকের দিকে দৃষ্টি চলে যাবেই।

একজন লেখক মনে করেন, হৃদয় থেকেই চিন্তা ও প্রেমের উৎপত্তি হয়। রোগী বুঝতেই পারে না, এটা অমূলক চিন্তা। বিজ্ঞান বই খুলে দেখিয়ে দিলাম মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষই প্রেমের কারণ। তবু তার মাথায় একই চিন্তা ঘুরপাক খায়।

শরীর ঘিরে দুশ্চিন্তা (Hypochondriacal)

শরীর সর্বস্ব সুন্দরী, মডেলগার্ল, অভিনেত্রীরা যখন জ্ঞানবুদ্ধিতে নিম্ন মেধার হন, তখন শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা ভিড় করে আসে। আসে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই বোধহয় চুল উঠে যাচ্ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছি, ত্বক জেল্লা হারাচ্ছে।

ডাক্তার দেখাবার প্রবণতা বাড়ে। দাঁতের ডাক্তার, ত্বকের ডাক্তার ইত্যাদি স্পেশালিস্ট দেখাতে হবে। পা মচকেছে। শুধু 'ভলিনি' দিয়ে সারবে না। অস্থি-বিশেষজ্ঞ দেখাও। এক্স-রে করো। এম আর আই করো।

কোনো ডাক্তার-ই নানা পরীক্ষার পরেও রোগের কারণ যখন খুঁজে পান না। তখন রোগী একের পর এক ডাক্তার পাল্টাতে থাকেন। যেসব ডাক্তার বোঝাতে চেষ্টা করেন, আসলে আপনার কোনো রোগ নেই, রোগটা মনের। ওমনি রোগী রেগে যান।

এটাই হল শরীর ঘিরে দুশ্চিন্তা অর্থাৎ হাইপোকনড্রিয়াকল্ অসুখ। এই অসুখের চিকিৎসার জন্য সাইকোথেরাপির প্রয়োজন।

বাতিক, উন্মাদগ্রস্ত (Mania)

আমার পরিচিত এক মহিলা কয়েক বছর ধরে দেখছি খুব হাসি-খুসি, ঝকঝকে কথাবার্তা, অসাধারণ কর্মক্ষম, সব সময় কাজ করছেন, কথা একটু বেশি বলেন। বলেন বেশি। শোনেন কম। মনে করেন উনি এতই সুন্দরী যে, কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য ফ্ল্যাটের বাইরে পা বাড়ালেই আশপাশের ফ্ল্যাটগুলোর জানলা খুলে উঁকি মারে রূপমুগ্ধ পুরুষরা।

একটু একটু করে মনে করতে শুরু করলেন, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, সৌন্দর্যে তিনি অ্যান-প্যারালাল। ওঁর লেবেল পরিচিতরা কেউ পরিমাপই করতে পারে না।

মধ্যমেধার এই রমণী বড় কোম্পানিতে মাঝারি মাপের ম্যানেজমেন্ট কর্মী। ঘুমের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

আত্মীয়-বন্ধুদের গিফট্ দিয়ে ইমপ্রেসড করতে চান। নিজের সমালোচনা সহ্য করেন না। এটা বাতিক বা ম্যানিয়া।

ম্যানিয়া রোগীদের মধ্যে অনেকেরই যৌন আগ্রহ বেশি হয়। একসময় তারা বহুজনের সঙ্গে মিলনে আনন্দ পান। একসময় আসে যখন বিষণ্ণতায় ভোগেন, নিজেকে অসহায় মনে করেন, প্রিয়জনরা আর আগের মতো ভালোবাসছেন না—মনে করতে থাকেন। এমনকি আত্মহত্যার ইচ্ছেও মনে আসে।

এই রোগ মুক্তির জন্য ওষুধের প্রয়োজন। যেসব ওষুধ হরমোনের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শরীরের নিউরো-কেমিক্যাল ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই ওষুধ ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অধ্যায় : পাঁচ

সাইকোসিস (Psychosis) উন্মাদ

* সাইকোসিস রোগী মনে করতে পারে, সে না দেখা মানুষদের কথা শুনতে পাচ্ছে।
* তার চিন্তা অন্য কেউ ধরে ফেলছে, জেনে ফেলছে।
* সে স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
* যা ঘটতে চলেছে, তা দেখতে পায়।

এই ধরনের অবাস্তব চিন্তার মানুষদের বলে সাইকিক পেসেন্ট বা পাগল অথবা উন্মাদ।

সাইকোথেরাপির সাহায্যে সুফল পাওয়া যায় না। এদের মনোরোগ চিকিৎসকদের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। ওষুধ ছাড়া রোগমুক্তির সম্ভাবনা প্রায় নেই। হাসপাতালে বা মনোরোগ চিকিৎসা কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়ার আশা করা যায়।

সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)

বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত কবি। বয়স বছর চল্লিশ। অবিবাহিত। হঠাৎ ওঁর মনে হতে লাগল—পাশের পাড়ার এক বিবাহিত সুন্দরী কবিকে অনবরত অনেক প্রেমের কথা শোনাচ্ছে। শ'দুয়েক গজ দূরের বাড়িতে বসে মেয়েটি যা বলেন, সবই শুনতে পান কবি।

ওঁর পত্রিকা অফিসের চারদিকের লোকেরা ওঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রের কথাই কবি নাকি শুনতে পান। পুলিশ কমিশনারের কাছে এক সহকর্মী কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কী বলেছেন, তাও ওঁর অজানা থাকেনি।

কবিকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি, এসবই তাঁর মানসিক রোগের ফল। চিকিৎসা করান। শেষ পর্যন্ত মানসিক ওয়ার্ডে ভর্তি করা হল। সাইকোলজিস্ট ও সাইক্রিয়াট্রিস্ট মত দিলেন কবি সিজোফ্রেনিয়ার শিকার।

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক। সিজোফ্রেনিয়া রোগে এই ইন্দ্রিয়গুলোর এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় ভুল-ভালো কাজ করে। ফলে রোগী ভুল শোনে, ভুল দেখে, ভুল গন্ধ পায়, ভুল স্বাদ পায়, ভুল স্পর্শ অনুভব করে।

সিজোফ্রেনিয়া শুরুতে চিকিৎসা করালে সুস্থ করে তোলা যায়। এই চিকিৎসায় ওষুধ ও সাইকোথেরাপির প্রয়োজন।

ভ্রান্তধারণা, মিথ্যাসন্দেহ (Delusion)

সন্দেহবাতিক। সব কিছুতেই সন্দেহ। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ, স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ, সহকর্মীরা ষড়যন্ত্র করছে বলে সন্দেহ, আত্মীয়-বন্ধুদের সন্দেহ—তারা নাকি ক্ষতি করতে চাইছে।

সময়মতো চিকিৎসা না করলে যত দিন যাবে, ততই সন্দেহ আরো দৃঢ় হবে।

আবার অন্যরকম ভ্রান্ত ধারণাও সৃষ্টি হতে পারে। Delusion রোগী ভাবতে লাগল তার সঙ্গে প্রিয়াংকা চোপড়ার প্রেম আছে। আবার কোনো মহিলা ভাবতে শুরু করলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বামী। আবার কেউ ভাবতে লাগলেন তাঁর মৃত গুরুদেব তাঁর সঙ্গে মাঝে-মধ্যেই শারীরিক সম্পর্ক গড়েন।

আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর অন্ধ-বিশ্বাস তার শ্বশুরমশাই পূর্বজন্মে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছিলেন। বন্ধুর সংসার বলতে নিজে, স্ত্রী, একটি ছোট্ট মেয়ে ও বাবা। বন্ধু অফিসে বেরোলেই ওর স্ত্রী ভয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। বাড়িতে সব সময়ই কাজের জন্য একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটি কখনো দু-চার দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেলে বন্ধু-পত্নী মেয়েকে নিয়ে চলে যেত বাপের বাড়ি। বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, ওর বদ্ধমূল ধারণা পূর্বজন্মে ওর শ্বশুর ছিলেন আকবর, আর ও ছিল আনারকলি।

রামকৃষ্ণদেব, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন মা কালী বা মা তারা তাঁদের সঙ্গে সব সময় কথা বলছেন, ঘুরছেন, ফিরছেন, দৈনন্দিন কাজকর্মে সাহায্য করছেন। দীর্ঘকাল ধরে লালিত বিশ্বাসই একসময় বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস বা delusion-এ পরিণত হয়েছে।

আমার এক মধ্যবয়স্ক সহকর্মী ছিলেন, যিনি delusion-এর রোগী। নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় ধরে নিচ্ছি তাঁর নাম যদুবাবু। যদুবাবুর দৃঢ় ধারণা সহকর্মীরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিহীন, হীনচরিত্র ও দুষ্ট প্রকৃতির। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে কথা বললে যদুবাবু ধরে নেন ওরা তাঁর সম্বন্ধেই কথা বলছে। কোনো দুই সহকর্মী নিজেদের দিকে তাকালে যদুবাবু ধরে নেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ওরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। ও কেন আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সিগারেটের প্যাকেট বের করল? আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কেন আমজাদ খাঁর গল্প করল এরা? আমি কি ভিলেন? অফিসের বিবেক ঘোষ কেন আমাকে হেমামালিনীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার দিল? আমি কি লম্পট? আমি সেকশনে ঢুকতেই ওরা সকলে হেসে উঠল। আমি কি ওদের হাসির রসদ? এই রকম নানা ধরনের আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি নিজের সঙ্গে জুড়ে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে রোগী। নির্যাতনমূলক এই delusion রোগী কিন্তু নিজের প্রতিটি ধারণা ও ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত বলে মনে করে।

পাভলভের মতে Delusion-এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে প্রথমত মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিকারগত অনড়ত্ব আর দ্বিতীয় কারণ হল, অতি স্ববিরোধী মানসিক অবস্থা। এই দুটি ব্যাপারই একসঙ্গে বা পরপর ঘটতে পারে। সেই অনুসারে delusion রোগীর উপসর্গেরও কিছু হেরফের হয়।

বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি (Paranoia)

'Paranoia' কথাটির অভিধানগত অর্থ 'বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি'। বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা না করে একে আমরা বরং বাংলায় 'প্যারানইয়া'ই বলি।

'প্যারানইয়া' রোগী delusion রোগীর মতোই অন্ধ ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয় বটে কিন্তু প্যারানইয়া রোগী তার এই বিশ্বাসের পেছনে এমন সুন্দর যুক্তি হাজির করতে থাকেন যে, একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পক্ষেও অনেক সময় বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে—উনি মানসিক রোগী অথবা বক্তব্যের যুক্তিগুলো সত্যি?

ধরুন, মধুবাবু একদিন আপনাকে বললেন, তাঁর স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত। শুধু এই কথাটাই বললেন না, তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে যেসব ঘটনা ও যুক্তি হাজির করলেন, তাতে আপনি প্রাথমিকভাবে হয়তো বিশ্বাসই করতে বাধ্য হবেন, মধুবাবুর স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত। মধুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সুবাদে আপনি আপনার পরিচিত প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগালেন, নিজেও লেগে পড়লেন বন্ধুকে নষ্টা স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচাতে। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন বন্ধুর প্রতিটি সন্দেহ ভিত্তিহীন।

নিজের ভুল বিশ্বাসকে যুক্তিসহ হাজির করার প্রচেষ্টাই প্যারানইয়া রোগীর বৈশিষ্ট্য। নিজের ওই বিশেষ ভ্রান্ত বদ্ধমূল বিশ্বাসের বাইরে প্যারানইয়া রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হয়।

এবার এক সুন্দরী রমণীর কথা বলছি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকায় এখানে তাঁর নাম দিলাম রাধা। রাধা শুধু সুন্দরীই নন, যথেষ্ট গুণীও। স্বামী, ধরা যাক নাম তাঁর সত্য, সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। রাধার বদ্ধমূল ধারণা সত্যর চরিত্র ভালো নয়। সুযোগ পেলেই আত্মীয়া-অনাত্মীয়া, কুমারী, সধবা, বিধবা, যে কোনো বয়েসের মেয়ের সঙ্গেই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যান। এই বিষয়ে রাধা যেসব যুক্তি হাজির করেন, যেসব ঘটনার অবতারণা করেন, সেসব শোনার পর রাধার বান্ধবীদের অনেকেরই ধারণা সত্য একটি 'প্লে-বয়'।

বেচারা সত্যকে রাধার তৈরি যুক্তি-তর্কের কালি মেখেই থাকতে হচ্ছে।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের মতে—প্যারানইয়া রোগীর গোপন মনে হীনমন্যতাবোধ বা পাপবোধ লুকিয়ে থাকার দরুন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে এক ধরনের শান্তি পায়। নিজের অন্যায় কাজকে 'জাস্টিফাই' করতে স্বামী বা স্ত্রীকে লম্পট প্রতিপন্ন করে প্রশান্তি পায়।

অধ্যায় : ছয়

দেহ–মনজনিত অসুখ (Psycho-somatic disorder)

রোগ সৃষ্টি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের শরীরে বহু রোগের উৎপত্তি হয় ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে। আমাদের মানসিক ভারসাম্য নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের ওপর। সমাজ জীবনে অনিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধর্মোন্মাদনা, জাত–পাতের লড়াই ইত্যাদি যত বাড়ছে দেহ–মনজনিত অসুখ বা Psycho-somatic disorder তত বাড়ছে। সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকে বলে এই সময় তাঁদের অনেকেই দেহ–মনজনিত অসুখের শিকার হয়ে পড়েন।

মানসিক কারণে যে–সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, মাথার ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, স্পন্ডালাইটিস, আরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেশার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি। মানসিক কারণে শারীরিক অসুখের ক্ষেত্রে ঔষধি–মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইনজেকশন বা ট্যাবলেট কার্যকর ওষুধ বলে প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভালো ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের বিশ্বাস–নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। Placebo কথার অর্থ "I will please." বাংলায় অনুবাদ করে বলতে পারি, "আমি খুশি করব।" ভাবানুবাদ করে বলতে পারি, "আমি আরোগ্য করব।"

একটি ঘটনা বলি ১৯৮৭–র মে মাসের এক সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটু সুপরিচিত পত্রিকার সম্পাদকের স্ত্রী এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক এক সাহিত্যিক–সাংবাদিক এবং জনৈক ভদ্রলোক।

চিকিৎসক জানালেন বছর আড়াই আগে সম্পাদকের স্ত্রীর ডান উরুতে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। ছোট অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন ও ওষুধে ফোঁড়ার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। কিন্তু এরপর ওই শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান নিয়ে শুরু হয় এক নতুন সমস্যা। মাঝে–মাঝেই উরুর শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত ও তার আশপাশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কখনো ব্যথার তীব্রতায় রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে যেসব চিকিৎসকদের দেখান হয়েছে ও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার শীর্ষস্থানীয়। ব্যথার

কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এঁরা খুঁজে পাননি। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র, এক্স-রে ছবি ও রিপোর্ট সবই দেখালেন আমাকে।

আমি পেশায় মানসিক চিকিৎসক না হলেও মাঝে-মধ্যে এই ধরনের কিছু সমস্যা নিয়ে কেউ কেউ আমার কাছে হাজির হন। কাউন্সিলিং করি বা পরামর্শ দিই। রোগিণীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে উরুর শুকনো ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললাম, "একবার খপুরে থাকতে দেখেছিলাম একটি লোকের হাতের বিষফোঁড়া, সেপটিক হয়ে, পরবর্তীকালে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস করুন, সামান্য ফোঁড়া থেকে এই ধরনের ঘটনাও ঘটে।"

রোগিণী বললেন, "আমি নিজেই এই ধরনের একটা ঘটনার সাক্ষী। মেয়েটির হাতে বিষফোঁড়া জাতীয় কিছু একটা হয়েছিল। ফোঁড়াটা শুকিয়ে যাওয়ার পরও শুকনো ক্ষতের আশপাশে ব্যথা হতো। একসময় জানা গেল, ব্যথার কারণ গ্যাংগ্রিন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে হাত বাদ দিতে হয়।"

যা জানতে গ্যাংগ্রিনের গল্পের অবতারণা করেছিলাম তা আমার জানা হয়ে গেছে। এটা এখন আমার কাছে দিনের মতোই স্পষ্ট যে, সম্পাদকের স্ত্রী ফোঁড়া হওয়ার পর থেকেই গ্যাংগ্রিন স্মৃতি তাঁর মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই ফোঁড়া থেকেই আবার গ্যাংগ্রিন হবে না তো? এই প্রতিনিয়ত আতঙ্ক থেকেই একসময় ভাবতে শুরু করেন, "ফোঁড়া তো শুকিয়ে গেল কিন্তু মাঝে-মধ্যেই যেন শুকনো ক্ষতের আশপাশে ব্যথা অনুভব করছি? আমারো আবার গ্যাংগ্রিন হল না তো? সেই মেয়েটির মতোই একটা অসহ্য কষ্টময় জীবন বহন করতে হবে না তো?"

এমনি করেই যত দুশ্চিন্তা বেড়েছে, ততই ব্যথাও বেড়েছে। বিশ্বাস থেকে যে ব্যথার শুরু, তাকে শেষ করতে হবে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই।

আমি আবারো একবার উরুর শুকনো ক্ষত গভীরভাবে পরীক্ষা করলাম শরীরের আর কোথায় কোথায় কেমনভাবে ব্যথাটা ছড়াচ্ছে, ব্যথার অনুভূতিটা কী ধরনের ইত্যাদি প্রশ্ন রেখে গম্ভীর মুখে একটা নিপাট মিথ্যে কথা বললাম, "একটা কঠিন সত্যকে না জানিয়ে পারছি না, আপনারও সম্ভবত গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে।"

আমার কথা শুনে রোগিণী মোটেই দুঃখিত হলেন না। বরং উজ্জ্বল মুখে বললেন, "আপনিই আমার অসুখের সঠিক কারণ ধরতে পেরেছেন।"

আমি আশ্বাস দিলাম, "আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, তবে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, আমার অনুমান ঠিক কি না। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে আপনার কর্তাটিকে একটু কষ্ট করতে হবে। বিদেশ থেকে ওষুধ-পত্তর আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখবেন, তারপর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

রোগিণীর পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে জানলাম, কোনো পরীক্ষাতে-ই রোগের কোনো কারণ ধরা পড়েনি। ডাক্তারদের অনুমান ব্যথার কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। রোগিণীর মনে সন্দেহের পথ ধরে একসময় বিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে তাঁর উরুর ফোঁড়া সারেনি, বরং আপাত শুকনো ফোঁড়ার মধ্যে রয়েছে গ্যাংগ্রিনের বিষ। রোগিণীর

বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কেমনভাবে প্ল্যাসিবো চিকিৎসা চালাতে হবে সে বিষয়ে একটা পরিকল্পনার কথা খুলে বললাম।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে রোগিণীর পারিবারিক ডাক্তার সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া উরুর ফোঁড়ার ওপর নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে একটা মেশিনের সাহায্যে রেখা-চিত্র তৈরি করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে আবার রেখা-চিত্র তোলা হল। দু-বারের রেখা-চিত্রেই রেখার প্রচণ্ড রকমের ওঠা-নামা লক্ষ্য করে স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, গ্যাংগ্রিনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। নিউ ইয়র্কে খবর পাঠিয়ে দ্রুত আনানো হল এমনই চোরা গ্যাংগ্রিনের অব্যর্থ ইন্‌জেকশন। সপ্তাহে দুটি করে ইন্‌জেকশন ও দুবার করে রেখা-চিত্র গ্রহণ চলল তিন সপ্তাহ্। প্রতিবার রেখা-চিত্রেই দেখা যেতে লাগল রেখার ওঠা-নামা আগের বারের চেয়ে কম। ওষুধের দারুণ গুণে ডাক্তার যেমন অবাক হচ্ছিলেন, তেমন রোগিণীও। প্রতিবার ইন্‌জেকশনেই ব্যথা লক্ষণীয়ভাবে কমছে। তিন সপ্তাহ্ ধরে দেখা গেল রেখা আর আঁকা-বাঁকা নেই, সরল। রোগিণীও এই প্রথম অনুভব করলেন, বাস্তবিকই একটুও ব্যথা নেই। অথচ মজাটা হল এই যে,বিদেশী দামি ইন্‌জেকশনের নামে তিন সপ্তাহ ধরে রোগিণীকে দেওয়া হয়েছিল স্রেফ ডিসটিলড্ ওয়াটার।

পঞ্চম সপ্তাহে 'আজকাল' পত্রিকার রবিবারের ক্রোড়পত্রে আমার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। শিরোনাম 'বিশ্বাসে অসুখ সারে'। মহিলার ঘটনাটির উল্লেখ করে লেখাটা শুরু করেছিলাম।

বছর পনেরো আগের ঘটনা। আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে দমদমের 'শান্তিসদন' নার্সিংহোমে ভর্তি হন। ওই সময় শান্তিসদনের অন্যতম কর্ণধার অতীন রায়ের সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। তিনি অতি সম্প্রতি আসা এক রোগিণীর কেস হিস্ট্রি শোনালেন। মাঝে মাঝেই রোগিণীর পেটে ও তার আশেপাশে ব্যথা হত। আশ্চর্য ব্যাপার হল, প্রতিবারই ব্যথাটা পেটের বিভিন্ন জায়গায় স্থান পরিবর্তন করত। এইদিকে আর এক সমস্যা হল, নানা পরীক্ষা করেও ব্যথার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ডাক্তার রোগিনীকে একটা ক্যাপসুল দিয়ে বললেন, এটা খান, ব্যথা সেরে যাবে। ক্যাপসুল খাওয়ার পর রোগিণীর ব্যথার কিছুটা উপশম হল। অথচ ক্যাপসুলটা ছিল নেহাতই ভিটামিনের। ব্যথা কিন্তু বারো ঘণ্টা পরে আবার ফিরে এলো।

আবার ভিটামিন ক্যাপসুল দেওয়া হল। এবারো উপশম হল সাময়িক। এভাবে আর কতবার চালানো যায়। ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত রোগিণীকে জানালেন, যে বিশেষ ইন্‌জেকশনটা এই ব্যথায় সবচেয়ে কার্যকর সেটি বহু কষ্টে তিনি জোগাড় করেছেন। এবার ব্যথা চিরকালের মতো সেরে যাবেই।

ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশনের নামে ডিসটিলড ওয়াটার পুশ করলেন। রোগিণীর ব্যথাও পুরোপুরি সেরে গেল।

বছর কুড়ি আগেও কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের আশপাশে এক গৌরকান্তি, দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ তান্ত্রিক ঘুরে বেড়াতেন। গলায় মালা (যতদূর মনে পড়ছে রুদ্রাক্ষের)। মালার লকেট হিসেবে ছিল একটি ছোট্ট রুপোর খাঁড়া। বৃদ্ধকে ঘিরে সব সময়ই অফিস-পাড়ার

মানুষগুলোর ভিড় লেগেই থাকত। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল তান্ত্রিকবাবার অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিয়ে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করা। বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখেছি এঁদের অসুখগুলো সাধারণত অম্বলের ব্যথা, হাঁপানি, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, বুখ ধড়ফড়, অর্শ, বাত ইত্যাদি।

সাধুবাবা রোগীর ব্যথার জায়গায় লকেটের খাঁড়া বুলিয়ে জোরে-জোরে বার কয়েক ফুঁ দিয়ে বলতেন, "ব্যথা কমেছে না?"

রোগী ধন্দে পড়ে যেতেন। সত্যিই ব্যথা কমেছে কি কমেনি? বেশ কিছুক্ষণ বোঝার চেষ্টা করে প্রায় সকলেই বলতেন, "কমেছে মনে হচ্ছে।"

এই আরোগ্য লাভের পিছনে তান্ত্রিকটির কোনো অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করত না, কাজ করত তান্ত্রিকটির অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি রোগীদের অন্ধ বিশ্বাস।

এবারের ঘটনাটা আমার শোনা। বলেছিলেন প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বিশ্বনাথ রায়। ডা. রায়ের সার্জারির অধ্যাপক ছিলেন ডা. অমর মুখার্জি। তাঁর কাছে চিকিৎসিত হতে আসেন এক মহিলা। মহিলাটির একান্ত বিশ্বাস, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। এর আগে কয়েকজন চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন পেটে ব্যথার কারণ গলস্টোন নয়। চিকিৎসকদের এই ব্যাখ্যায় মহিলা আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

ডা. মুখার্জি মহিলার গল-ব্লাডারের এক্স-রে করালেন। দেখা গেল কোনো স্টোন নেই। তবু ডা. মুখার্জি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়ে দিলেন রোগিণীকে বলতে, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। এক্স-রে-তে দুটো স্টোন দেখা গেছে। অপারেশন করে স্টোন দুটো বার করে দিলেই ব্যথার উপশম হবে।

রোগিণীকে জানানো হল অমুক দিন অপারেশন হবে। নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান করে পেটের চামড়া চর্বিস্তর পর্যন্ত কাটলেন এবং আবার সেলাই করে দিলেন। ও.টি. স্টাফের হাতে ছোট্ট দুটো রঙিন পাথর দিয়ে ডা. মুখার্জি বললেন, রোগিণী জ্ঞান ফেরার পর স্টোন দেখতে চাইলে পাথর দুটো দেখিয়ে বলবেন, এ-দুটো ওর পিত্তথলি থেকেই বেরিয়েছে।

রোগিণী কয়েকদিন হাসপাতালেই ছিলেন। সেলাই কেটেছিলেন ডা. রায়। রোগিণী হৃষ্টচিত্তে রঙিন পাথর দুটো নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। যে ক-দিন হাসপাতালে ছিলেন সে ক-দিন গলব্লাডারের কোনো ব্যথা অনুভব করেননি। অথচ আশ্চর্য, সাজানো অপারেশনের আগে প্রতিদিনই নাকি রোগিণী গলব্লাডারে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতেন।

এবার যে ঘটনাটি বলছি, তা শুনেছিলাম চিকিৎসক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির একসময়ের সভাপতি ডা. বিষ্ণু মুখার্জির কাছে। ঘটনাস্থল জামশেদপুর। ডা. মুখার্জি তখন জামশেদপুরের বাসিন্দা। নায়িকা তরুণী, সুন্দরী, বিধবা। ডা. মুখার্জির কাছে তরুণীটিকে নিয়ে আসেন তাঁরই এক আত্মীয়া। তরুণীটির বিশ্বাস তিনি মা হতে চলেছেন। মাসিক বন্ধ আছে মাস তিনেক। ডা. মুখার্জির আগেও অন্য চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, মাতৃত্বের কোনো চিহ্ন নেই। ডাক্তারের স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে মেয়েটির পরিবারের আর সকলে বিশ্বাস স্থাপন করলেও, মেয়েটি কিন্তু তাঁর পূর্ব বিশ্বাস থেকে নড়েননি। তাঁর এখনো দৃঢ় বিশ্বাস, মা হতে চলেছেন। এবং মা হলে তাঁর

সামাজিক সম্মান নষ্ট হবে। ইতোমধ্যে সম্মান বাঁচাতে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

পূর্ব ইতিহাস জানার পর ডা. মুখার্জি পরীক্ষা করে মেয়েটিকে জানালেন, "আপনার ধারণাই সত্যি। আপনি মা হতে চলেছেন। যদি অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি চান নিশ্চয়ই তা পেতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে অ্যাবরশন করতে হবে।

মেয়েটি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। সাজানো অ্যাবরশন শেষে জ্ঞান ফিরতে রোগিণীকে দেখানো হল অন্য এক রোগিণীর দু'মাসের ফিটাস ট্রেতে রক্তসহ সাজিয়ে।

মেয়েটি সুখ ও স্বস্তি মেশানো নিশ্বাস ছাড়লেন। পরবর্তীকালে মেয়েটি তাঁর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন।

যেসব রোগ নিজে থেকেই বাড়ে-কমে

অনেক পুরনো বা Chronic রোগ আছে যেসব রোগের প্রকোপ বিভিন্ন সময় কমে-বাড়ে। যেমন গেঁটে বাত, অর্শ, হাঁপানি, অম্বল। আবার হাঁপানি, অম্বলের মতো কিছু পুরনো রোগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে সেরে যায়। অলৌকিক বাবাদের কাছে কৃপা প্রার্থনার পরই এই ধরনের অসুখ বিশ্বাসে বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুটা কমলে বা সেরে গেলে অলৌকিক বাবার মাহাত্ম্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি অমিয় সেন একবার আমাকে বলেছিলেন, "মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও আমি কিন্তু অলৌকিক শক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। দীঘার কাছের এক মন্দিরে আমি এক অলৌকিক ক্ষমতাবান পুরোহিতের দেখা পেয়েছিলাম। আমার স্ত্রী গেঁটে-বাতে পায়ে ও কোমরে মাঝে-মাঝে খুব কষ্ট পান। একবার দীঘায় বেড়াতে গিয়ে ওই পুরোহিতের খবর পাই। শুনলাম উনি অনেকের অসুখ-টসুখ ভালো করে দিয়েছেন। এক সন্ধ্যায় আমরা স্বামী-স্ত্রীতে গেলাম মন্দিরে। পুজো দিলাম। সন্ধ্যারতির পর পুরোহিতকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে আসার উদ্দেশ্য জানালাম। পুরোহিত বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ে আমার স্ত্রীর কোমর ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। একসময় জিজ্ঞেস করলেন, "কি, এখন ব্যথা কমেছে না?" অবাক হয়ে গেলাম আমার স্ত্রীর জবাব শুনে। ও নিজের শরীরটা নাড়া-চাড়া করে বলল, "হ্যাঁ, ব্যথা অনেক কমেছে।" এইসব অতি-মানুষেরা হয়তো কোনো দিনই আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হাজির হবেন না। কিন্তু এদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়ার পর তা অস্বীকার করব কীভাবে?"

আমি বলেছিলাম, "যতদূর জানি আপনার স্ত্রীর বাতের ব্যথা এখনো আছে।"

আমার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি জবাব দিয়েছিলেন, "পুরোহিত অবশ্য আরো কয়েকবার ঝেড়ে দিতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। কাজের তাগিদে আর যাওয়া হয়নি। ত্রুটিটা আমাদেরই।"

এই সাময়িক আরোগ্যের কারণ পুরোহিতের প্রতি রোগিণীর বিশ্বাস, পুরোহিতের অলৌকিক কোনো ক্ষমতা নয়। অথবা, পুরনো রোগের নিয়ম অনুসারেই স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় গেঁটে-বাতের প্রকোপ কিছুটা কম ছিল।

বিশ্বাসে কাজ হয়

কেস হিস্ট্রি : এক

সালটা সম্ভবত ১৯৮৪। সে সময়কার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক 'বিশ্ববাণী'র মালিক ব্রজ মণ্ডলের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। হোটেলে পৌঁছতেই রাত দশটা পার হয়ে গেল। এগারোটায় খাবারের পাট চুকানোর পর প্রকাশক বন্ধুটির খেয়াল হল সঙ্গে ঘুমের বড়ি নেই। অথচ প্রতি রাতেই ঘুম আনে ঘুমের বড়ি। বেচারা অস্থির ও অসহায় হয়ে পড়লেন। "কী হবে প্রবীর? এত রাতে কোনও ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া অসম্ভব। তোমার কাছে কোনো ঘুমের ওষুধ আছে?" বললাম, "আমারো তোমার মতোই ঘুম নিয়ে সমস্যা। অতএব সমাধানের ব্যবস্থা সব সময়ই সঙ্গে রাখি। শোবার আগেই ওষুধ পেয়ে যাবে।"

শুতে যাওয়ার আগে প্রকাশকের হাতে একটা ভিটামিন ক্যাপসুল দিয়ে আমিও একটা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্যাপসুলটা নেড়ে-চেড়ে দেখে প্রকাশক বললেন, "এটা আবার কী ধরনের ওষুধ? ক্যাপসুলে ঘুমের ওষুধ? নাম কী?"

একটা কাল্পনিক নাম বলে বললাম, "ইউ.এস.এ'র ওষুধ।" কলকাতার এক সুপরিচিত চিকিৎসকের নাম বলে বললাম, "আমার হার্টের পক্ষে এই ঘুমের ওষুধই সবচেয়ে সুইটেবল বলে প্রতি তিন মাসে একশোটা ক্যাপসুলের একটা করে ফাইল এনে দেন। যে চিকিৎসকের নাম বলেছিলাম তিনি যে আমাকে খুবই স্নেহ করেন সেটা প্রকাশক বন্ধুটির জানা থাকায় আমার কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন ঘুম হল?"

"ফাইন। আমাকেও মাঝে-মধ্যে এক ফাইল করে দিও।"

প্রকাশকের বিশ্বাস হেতু এক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধহীন ক্যাপসুলই ঘুম আনতে সক্ষম হয়েছিল।

কেস হিস্ট্রি : দুই

গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ার কথা। আমার কাছে এসেছিলেন এক চিকিৎসক বন্ধু এক বিচিত্র সমস্যা নিয়ে। বন্ধুটি একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে এক রোগিণী ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে নিয়েই সমস্যা। তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন গলায় কিছু আটকে রয়েছে। এই সময় তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়। এক্স-রেও করা হয়েছে, কিছু মেলেনি। দেহ-মনজনিত অসুখ বলেই মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে রোগিণী তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন বলে আমি মনে করি, সেটা জানতেই আসা।

পরের দিনই নার্সিংহোমে রোগিণীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন বন্ধুটি। নানা ধরনের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে রোগিণী তাঁর উপসর্গের কারণ হিসেবে কী ভাবছেন, এইটুকু জানতে চাইছিলাম। জানতেও পারলাম। চিকিৎসক বন্ধুটিকে জানালাম, রোগিণীর ধারণা তাঁর পেটে একটা বিশাল ক্রিমি আছে। সেটাই মাঝে-মাঝে গলায় এসে হাজির হয়। অতএব রোগিণীকে আরোগ্য করতে চাইলে একটা বড় ফিতে কৃমি জোগাড় করে তারপর সেটাকে রোগিণীর শরীর থেকে বার করা হয়েছে এই বিশ্বাসটুকু রোগিণীর মনের মধ্যে গেঁথে দিতে পারলে আশা করি তাঁর এই সাইকো-সোমাটিক ডিস্অর্ডার ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েক দিন পরে বন্ধুটি আমাকে ফোনে খবর দিলেন রোগিণীর গলা থেকে পেট পর্যন্ত এক্স-রে করে তাঁকে জানানো হয়েছিল একটা বিশাল ফিতে কৃমির অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। অপারেশন করে কৃমিটাকে বের করা প্রয়োজন। তারপর পেটে অপারেশনের নামে হালকা ছুরি চালিয়ে রোগিণীর জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে কৃমিটা দেখানো হয়েছে। এরপর চারদিন রোগিণী নার্সিংহোমে ছিলেন। গলার কোনো উপসর্গ নেই। রোগিণীও খুব খুশি। বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাক্তার বন্ধুটিকে।

অনিশ্চয়তা থেকে অসুখ

১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালের ঘটনা, আমি তখন হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়াই। কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান করি গুপি-সঞ্জয়কে প্রধানত সঙ্গী করে। মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরা হত না। রাতে এখানে ওখানে। গামছা পেতে পয়সা তোলা হত দর্শকদের কাছ থেকে। যাঁরা আমন্ত্রণ করতেন, তাঁরা রাতে রুটি তরকারি বা ভাত, ডাল, আলুভাতে দিতেন খেতে। এক সঙ্গে আড্ডা-খাওয়া। আমরা তো মজায় কাটাতাম, এনজয় করতাম।

আর ওদিকে বাড়িতে একা একা থাক তো সীমা ও পিনাকী। গভীর রাতে সীমার হাঁপানির টান উঠতো। পাশের বাড়ির মল্লিকদা পাড়ারই এক ডাক্তারকে ডেকে আনতেন। এটা আমি বাইরে থাকলেই হত। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব সময়ই হত। আর আমি রাতে বাড়ি থাকলে হাঁপানির সমস্যা হত না।

এক মনোবিদের সাহায্য নিয়ে সারালাম। আমার পক্ষে ওকে সম্মোহন করা সম্ভব ছিল না। কারণ ওকে সম্মোহন করি, আমার সাধ্য কোথায়! ওর ভয় ছিল সম্মোহন করে যদি ওর মনের অনেক গোপন কথা...

বিশ্বাসবোধকে যে শুধুমাত্র চিকিৎসকেরাই কাজে লাগান, তা নয়। অনেক তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাধরেরাও বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় ঘটিয়ে অলৌকিক 'ইমেজ' বজায় রাখেন অথবা বর্ধিত করেন।

পর্ব : তিন

মনোবিদ ও মনোরোগ চিকিৎসার বিভিন্ন থেরাপি

অধ্যায় : এক

মনোবিদ (Psychologist) ও মনোরোগ চিকিৎসক (Phychiatrist)

কিছু পার্থক্য ও কিছু সম্পর্ক

মনোবিদের কাজ মনোরোগীর সঙ্গে কথা বলে তার বিশ্বাস অর্জন করে ধৈর্যের সঙ্গে মনোরোগের কারণ খুঁজে বের করা।

মনোরোগ বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে 'পাগল'। মনোরোগ মানেই 'উন্মাদ' বা 'পাগল' নয়। মনোরোগের পরিধি আরো বিস্তৃত। হতাশা, অবসাদ, উৎকণ্ঠা, শারীরিক কোনো কারণ ছাড়া শুধুমাত্র মানসিক কারণে শ্রবণ ইন্দ্রিয় ও দর্শন ইন্দ্রিয় ঠিকমতো কাজ না করা, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, পেটের গোলমাল, পরীক্ষার আগে হঠাৎ সব পড়া ভুলে যাওয়া, পরীক্ষার আগে আঙুলের লেখার ক্ষমতা হারান ইত্যাদি বহু রোগের কারণ হতে পারে মানসিক। এইসব রোগের উৎস খুঁজতে মনোবিজ্ঞানী বা মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট)-এর সাহায্য নিলে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সাধারণভাবে একজন মনোবিদের ডাক্তারি ডিগ্রি থাকে না। তিনি যখন বোঝেন রোগীর সঙ্গে কিছু সিটিং দেওয়ার প্রয়োজনের পাশাপাশি রোগীর ওষুধ খাওয়ারও প্রয়োজন আছে, তখন তিনি ওষুধ প্রেসক্রাইব না করে কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের (Phychiatrist) কাছে পাঠিয়ে থাকেন। কারণ **ডাক্তারি ডিগ্রি না থাকলে ওষুধ প্রেসক্রাইব করা যায় না।**

যারা ওষুধের সাহায্যে মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন তাদের বলা হয় মনোরোগ চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট)।

অনেক সময় মনোরোগ চিকিৎসক রোগীকে পাঠান মনোবিদের কাছে মনোবিশ্লেষণের জন্য। সাইকোলজিস্ট রোগীর সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে, প্রশ্ন করে রোগীর বিষয়ে তাঁর

ফাইনডিংস বা বিশ্লেষণ পাঠান সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। সেই রিপোর্টের সাহায্যে সাইকিয়াট্রিস্ট ওষুধ নির্বাচন করেন।

মনোচিকিৎসা (Psychotherapy)

মনের রোগের চিকিৎসাকেই বলে মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি। প্রধানত এই চিকিৎসা করেন মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট) এবং মনোরোগ চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট)। ধর্মগুরুরাও অনেক সময় সাইকোলজিস্টের ভূমিকা পালন করে কিছু কিছু মনের রোগীদের সারিয়ে তোলেন।

মনের রোগ সারাতে গেলে যে চিকিৎসক বা থেরাপিস্ট রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, ধৈর্যশীল, দ্রুত বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম ও দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারেন তিনিই ভালো থেরাপিস্ট।

থেরাপিস্ট প্রয়োজনে রোগীকে তার সমস্যার কারণগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন। এবং রোগী তা বুঝলে ও বিশ্বাস করলে তার মনের রোগ থেকে মুক্ত হতে পারে। কখনো 'হিপনোটিক সাজেশন থেরাপি' (Hypnotic suggestion therapy)-র সাহায্যে সাইকোথেরাপি করতে পারেন। আবার প্রয়োজনে হিপনোটিক সাজেশন দেওয়ার পাশাপাশি ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন।

সাইকিয়াট্রিস্টরা শুধুমাত্র ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন। এই ওষুধের সাহায্যে থেরাপিও সাইকোথেরাপি।

মনোরোগ চিকিৎসার ওষুধ ফ্রান্সেই প্রথম আসে। সালটা ১৯৫৪। এরপরই সাইকোথেরাপিতে ওষুধের ব্যবহার বাড়তে থাকে। তার আগে সাইকোথেরাপি বলতে ছিল শুধুই হিপ্‌নো-থেরাপি। কিন্তু বর্তমানে 'সভ্য জগৎ'-এর মানুষদের জীবনে কর্মব্যস্ততা অত্যন্ত বেড়েছে। জীবনে জটিলতা বেড়েছে। অনিশ্চয়তা ও টেনশন বেড়েছে। বেড়েছে মনের রোগ এবং সাধারণের মধ্যে মনোরোগ বিষয়ে সচেতনতা।

ইউরোপ, আমেরিকার মতো উন্নত দেশের মানুষ তাদের মানসিক সমস্যা নিয়ে হাজির হন সাইকোলজিস্টের কাছে। থেরাপিস্ট দীর্ঘ সময় ও ধৈর্য দিয়ে সমস্যাকে বিশ্লেষণ করেন। রোগীর কাউনসেলিং করেন বা সাইকোথেরাপি করেন।

ভারতের মতো মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকা দেশের মানুষ নিজের বা পরিবারের মানসিক সমস্যা নিয়ে থেরাপির বা চিকিৎসার প্রয়াজনই মনে করেন না। রোগীর প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি হলে গ্রামে-গঞ্জের মানুষ এখনো ওঝা, গুণিন, পীরদের কাছে ছোটে। পায়ে শিকল বেঁধে রাখে। তুক-তাক-ঝাড়ফুঁক করায়।

মধ্যবিত্ত পরিবারে এখনো 'মানসিক রোগী' মানে 'পাগল' মনে করার মানুষই বেশি। ওরা ভয় পায়—পরিবারের কেউ পাগল শুনলে ওই পরিবারে কেউ বিয়ে দিতে চাইবে না। অতএব মানসিক রোগীকে গোপনে লুকিয়ে রেখে দাও।

এদের মধ্যে কেউ যদি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়, তবে চটজলদি রেজাল্ট পেতে চায়। সাধারণত ওরা রোগীকে নিয়ে যায় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। সাইকিয়াট্রিস্টরাও দ্রুত রোগী দেখতে ব্যস্ত। দ্রুত রোজগারের জন্যে এই সময়াভাব।

মনের অসুখে ওষুধ খাওয়ার ফল পাওয়া যায় দ্রুত। কিন্তু প্রায়শই এতে ওষুধটির প্রতি মানসিক নির্ভরতা গভীর হয়। এমনকি এইসব ওষুধ কর্মচঞ্চলতা কমিয়ে দেয়, ঘুম-ঘুম অলসতা আসে। ওষুধের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে না এসে আরো ওষুধের মাত্রা বাড়াবার প্রবণতা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন ওষুধ খাওয়ার ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

আবার রোগী ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ খান না—এমনটাও হয়। চিকিৎসক বললেন—এই ওষুধটা এক মাস খেয়ে আমার কাছে আসবেন।

অনেক সময় রোগী এক মাস না খেয়েই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন সবজান্তা আত্মীয় বন্ধুদের উপদেশে।

অথবা আর ডাক্তার না দেখিয়ে ওষুধটা মাসের পর মাস খেয়ে বিপদ ডেকে আনেন।

হাইস্কুলের টিচার দীপ তার মানসিক সমস্যা নিয়ে একের পর এক সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়ে যাচ্ছে বছর দুই ধরে। ওর সমস্যা হল, যে-ওষুধ ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেন, ইন্টারনেটে সেই ওষুধের সম্বন্ধে সার্চ করে এবং ধরে নেয়, এটা ঘুমের ওষুধ, স্মৃতি দুর্বল করার ওষুধ ইত্যাদি। দীপ এমন চালালে 'লস্ট-কেস'।

ভালো থেরাপিস্ট হতে

ভালো থেরাপিস্ট হতে গেলে জানতেই হবে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য, ধর্ম-ভাষা-শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য, নারী-পুরুষ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, পেশাগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বহু কিছু। এইসব বিষয়ে যত বেশি স্পষ্ট ধারণা থাকবে, ততই সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

কলকাতার রাজাবাজার, খিদিরপুর, কসবা অঞ্চলের অবাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে বঙ্গবাসী কৃষক পরিবারের মুসলমানদের একটা মূলগত চারিত্রিক পার্থক্য থাকে। এই বঙ্গের অবাঙালি মুসলমানেরা যতটা উগ্র, যতটা সমাজবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, বঙ্গবাসী কৃষক পরিবারের মুসলমানেরা ততটাই সুশীল, অতিথিবৎসল।

বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের হিন্দিভাষী জোতদার বা ধনী কৃষকরা চরিত্রগতভাবে কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন তাদের পরিবারের বিয়ে-উৎসবে নাচনেওয়ালী আনবে। সদ্য-কিশোরও নাচনেওয়ালীর স্তন সবার সামনে টিপে দেবে নির্দ্বিধায়। পুরুষরা হৈ হৈ করে হাসবে ঘটনা দেখে, নারীদের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ।

এইসব ধনী পুরুষরা কথা কথায় হরিজন বস্তিতে হামলা চালায়, হরিজন মহিলাদের ধর্ষণ করে। গ্রামে ফিরে পুরুষরা এইসব 'পৌরুষের' গল্প বলে। ধর্ষকদের বউরাও তার মরদের এমন কাজে ক্রুদ্ধ বা লজ্জিত না হয়ে গর্ব অনুভব করে।

পাঞ্জাব-হরিয়ানার একটি ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বহুগামিতা বেশ জনপ্রিয়। এইডস রোগীর সংখ্যাও খুব বেশি।

ভারতের কিছু পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে মদ-জুয়া-বহুগামিতার প্রচলন রয়েছে।

মডেল, সিনেমা স্টার, ক্রিকেট স্টার, পাইলট ও এয়ারহোস্টেসার সাধারণভাবে দেহশুচিতাহীন।

লং-রুটের ড্রাইভার ও লরির ড্রাইভাররা বেশ্যালয়ে যাবে। পুলিশ ঘুষ খাবে। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কারবারিরা কাস্টমারদের খুশি করতে কলগার্ল পাঠিয়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে নিজেরাও মুখ পাল্টায়—এটাই স্বাভাবিক।

সেনাদের বড়কর্তারা লম্পট হবে। মন্ত্রীরা সমাজবিরোধী হবে—এটাই স্বাভাবিক।

কোলিয়ারি এলাকার সর্বত্র কয়লা মাফিয়া ও রেলের বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে ওয়াগেন মাফিয়ারা রাজত্ব চালাচ্ছে। সমুদ্র উপকূল ও দেশের বর্ডারে স্মাগলার, সুপারি কিলার ও বেশ্যালয় থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

বাঙালি নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারে অজাচার প্রায় শূন্য। যা অজাচার তা মধ্যবিত্ত পরিবারেই বাসা বাঁধে। যেসব মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক বন্ধু হতে পারে না, সেই পরিবারেই অজাচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছোট পরিবার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিঃসঙ্গতা বেড়েছে, বিষণ্ণতা বেড়েছে। বেড়েছে মানসিক রোগ।

একজন থেরাপিস্ট যত বেশি সমাজ সচেতন হবেন, যত বেশি বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, জাতপাত, অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলো জানবেন, ততই তাঁর কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

কেস-হিস্ট্রি ১

এক উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত বাঙালি ছাত্রী শান্তিনিকেতনের কলাভবনে পড়তে পড়তে কলাভবনের এক সাঁওতাল ছাত্রের প্রেমে পড়ে ও দুজনে বিয়েও করে। সাঁওতাল পরিবারে থাকতে গিয়ে মেঠো ইঁদুর পুড়িয়ে খাওয়ার সঙ্গে নিজের খাদ্যাভ্যাসকে মেলাতে পারেনি। খেয়ে বমি-টমি করে একশা। তারপর মেয়েটি দ্রুত অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হয়ে পড়ে। তার থেকেই গলায় ব্যথা। কোনো কিছু গিলতে না পারার সমস্যা তৈরি হয়। বোলপুর ও কলকাতায় গলা পরীক্ষা করান হয়। ডাক্তাররা সমস্যার কোনো কারণ খুঁজে পাননি। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি আমার কাছে আসায়, তাকে কারণ বিশ্লেষণ করে বোঝাই, বিবাহ বিচ্ছেদই ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মেয়েটি বিবাহ বিচ্ছেদের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

কেস-হিস্ট্রি ২

১৯৮৭-র ঘটনা। নাম পাল্টে ধরে নিলাম ও টিংকু। বর চন্দন। থাকে দমদম জংশনের কাছে রেললাইনের পাশে গজিয়ে ওঠা ঝুপড়িতে।

চন্দন এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। বলল, ওর বউ টিংকুকে ভূতে ধরেছে। সকলের সামনে আপনা-আপনি শাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। গায়ের গয়না অদৃশ্য হয়েছে। টিংকু জল খেতে গেলেই গ্লাসে চুল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

টিংকু ও চন্দনের সঙ্গে আলাদা-আলাদা করে কথা বললাম। বছর চারেক আগে দুজনের আলাপ। চন্দন তখন পাড়ায় পাড়ায় আবৃত্তি করে বেড়ায়। টিংকু ওর আবৃত্তি, কথাবার্তায় আকর্ষিত হয়েছিল। চন্দন একটা ছোট্ট কারখানার লেবার।

টিংকুর বাবা ব্যবসায়ী। গাড়ি বাড়ি সবই আছে। বাড়ির তীব্র অমতে বিয়ে করল টিংকু। বাবা গয়না, খাট ও কিছু নগদ অর্থ দিয়েছিলেন।

চন্দনের কারখানা বন্ধ হল একদিন। আর্থিক সমস্যা মেটাতে নগদ টাকায় হাত দিল। পুঁজি শেষ হতে টিংকুর গয়নায় হাত দিতে হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূতের সমস্যা। ভূত তাড়াতে তান্ত্রিকের পিছনে খরচ হয়ে গেছে হাজার সাতেক টাকা। গত বছর টিংকুর গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। টিংকু আবার গর্ভবতী। চার মাস চলছে। ভূতের উপদ্রবের শুরু দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার পর।

চন্দনের এখনো কোনো স্থায়ী রোজগার নেই। টিংকু মাঝে-মধ্যে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকে। তখন ভূতের উপদ্রব বন্ধ থাকে।

বুঝলাম, ন্যূনতম প্রয়োজন না মেটায় অবদমিত বিষণ্ণতা থেকে ওর এই ভূতের উপদ্রব সৃষ্টি করা। চেতনে বা অবচেতনে এইসব ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে টিংকু। শুধু মানসিক চিকিৎসার সাহায্যে রোগীকে সুস্থ করে তোলা অসম্ভব।

আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির এক সভ্যের সহৃদয় সাহায্যে চন্দনকে একটা কাজে লাগাবার পর টিংকু আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিল।

কেস-হিস্ট্রি ৩

কলকাতার একটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ভালোবেসে বিয়ে করে তার ইউনিভার্সিটির এক সহপাঠী বিহারের উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেকে। ছেলের প্রচুর জমিজমা।

ছেলেরা বিয়ে করতে এলো ব্যান্ডপার্টি আর হিজড়ে নাচের মিছিল নিয়ে। নতুন বউ দেখল বউভাতে নাচনেওয়ালীদের আগমন। সেই নাচ নাকি মেয়েদের দেখতে নেই। কারণ নাচনেওয়ালীদের সঙ্গে শ্বশুর থেকে ভাসুর সব্বাই একটু-আদটু ফস্টি-নস্টি করবে।

বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে দলিত সম্প্রদায়ের উপর হামলা করল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ফিরে এসে বাড়ির পুরুষদের বুক-চিতিয়ে আস্ফালন কতজন মেয়েকে কীভাবে ধর্ষণ করেছে—এসবই শুনে সিঁটিয়ে গেল বাঙালি বাড়ির মেয়ে।

তারপর বিশাল রুচির পার্থক্যে অবদমিত বিষণ্ণতা থেকে মেয়েটি মানসিক রোগে পড়ল।

এইক্ষেত্রে সাইকোথেরাপির সাহায্যে মেয়েটিকে সুস্থ করে তোলা কখনই সম্ভব নয়। রোগমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ডিভোর্স না করলে শূন্য।

কেস-হিস্ট্রি ৪

আমি তখন স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করি। আমাদের অফিসেরই এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর বাড়ি উড়িষ্যার এক গ্রামে। একদিন সে আমাকে এসে জানাল, কিছুদিন হল ওর স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। অনেক ওঝা, তান্ত্রিক, গুণিন দেখিয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই এরা দেখার পর খুব সামান্য সময়ের জন্য ভালো থাকে অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হয়নি। সহকর্মীটিকে বললাম, স্ত্রীকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে। নিয়েও এলো।

ওর স্ত্রীকে দেখে মনে হল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কুড়ি বছরের কম নয়। বউটির বয়স বছর পঁচিশ। ফর্সা রঙ, দেখতে স্বামীর তুলনায় অনেক ভালো। দেশের বাড়িতে আর থাকে ওর দুই ভাসুর, এক দেওর, তাদের তিন বউ, তাদের ছেলেমেয়ে ও নিজের দুই মেয়ে, এক ননদ ও শাশুড়ি। বিরাট সংসারে প্রধান আয় ক্ষেতের চাষ-বাস। স্বামী বছরে দুবার

ফসল তোলার সময় যায়। তখন যা স্বামীর সঙ্গ পায়। হাত-খরচ হিসেবে স্বামী কিছু দেয় না। টাকার প্রয়োজন হলে যৌথ-পরিবারের কর্ত্রী মা অথবা বড় জায়েদের কাছে হাত পাততে হয়।

প্রথম ভূত দেখার ঘটনাটা এইরকম। একদিন সন্ধ্যার সময় ননদের সঙ্গে মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল। অথচ আশপাশে দুর্গন্ধ ছড়াবার মতো কিছুই চোখে পড়েনি। সেই রাতে খেতে বসে রুটিতে গরুর মাংসের গন্ধ পায় বউটি। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে হল। গা-গুলিয়ে বমি। সেই রাতেই একসময় ঘুম ভেঙে গেল। জানলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে। বীভৎস একটা প্রেতমূর্তি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওকেই দেখছিল। পরের দিনই ওঝা আসে। মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। কিন্তু কাজ হয় না। এখন সব সময় একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছে। খেতে বসলেই পাচ্ছে গরুর মাংসের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তিটি দর্শন দিয়ে যাচ্ছে।

বউটির মুখ থেকেই জানতে পারি তার মা ও বোনকেও একসময় ভূতে ধরেছিল। ওঝারাই সারিয়েছে। বউটির অক্ষর জ্ঞান নেই। গরুর মাংসের গন্ধ কোনো দিনও শুঁকে দেখেনি। প্রতিদিন অন্য তিন বউয়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় ওকে। তাদের স্বামীরাও দেশেই থাকে, দেখাশুনা করে পরিবারের। অথচ বেচারি বউটিকে কোনো সাহায্য করারই কেউ নেই। বরং মাঝে মধ্যে অন্য কোনো বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কর্তামাও আমার সহকর্মীর বউটির বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দেন।

সব মিলিয়ে বউটির কথার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় : অন্য জায়ের স্বামীরা যে চাষ করে ঘরে ফসল তোলে। আমার বর কী করে? টাকা না ঢাললে সবাই পর হয়। তা আমার উনি একটি টাকাও কস্মিনকালে উপুড়হস্ত করেন না। কিছু বললেই বলেন, দুই মেয়ের বিয়ের জন্য জমাচ্ছি।

বুঝলাম, অবদমিত বিষণ্ণতাই মহিলাটির মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মহিলাটি অলীক বীভৎস মূর্তি দেখছেন, পাচ্ছেন অলীক গন্ধ। মহিলাটি গরুর মাংসের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করে নিয়েছেন তাঁর নাকে আসা গন্ধটি গরুরই।

সহকর্মীটিকে তাঁর স্ত্রীর এই অবস্থার কারণগুলো বোঝালাম। জানালাম চিরকালের জন্য স্ত্রীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখতে চাইলে স্ত্রী-কন্যাদের কাছে এনে রাখতে হবে, তাদের দেখাশুনো করতে হবে, স্ত্রীর সুবিধে-অসুবিধেয় তার পাশে দাঁড়াতে হবে।

সহকর্মীটির টাকার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকা সোনাগাছিতে ওড়িশা থেকে আসা কিছু লোকেদের নিয়ে সামান্য টাকায় মেস করে থাকে। চড়া সুদে সহকর্মী ও পরিচিতদের টাকা ধার দেয়। দেশের সংসারে সাধারণত টাকা পাঠায় না। কারণ হিসেবে আমাকে বলেছিল, দেশের চাষের জমিতে আমারও ভাগ আছে। চাষ করে যা আসে তাতেই আমার পরিবারের তিনটি প্রাণীর ভালো মতোই চলে যাওয়া উচিত। মেয়েমানুষের হাতে কাঁচা টাকা থাকা ভালো নয়, আর দরকারই বা কী? শাশুড়ি, ননদ, জায়েদের সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকাঠুকি হবেই। ওসব কিছু নয়। মেয়েদের ও-সব কথায় কান দিতে নেই।

হয়তো সহকর্মীটি এই মানসিকতার মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর নেশাতেই আমার যুক্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। জানে আমার যুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থই খরচ বাড়ানো।

তবু শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে বউকে কলকাতায় মাস চারেকের জন্য এনে রেখেছিল। বউটিকে সম্মোহিত করে তার মস্তিষ্ক কোষে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম দু-মাসে, দুটি সিটিং-এ। স্ত্রী ভালো হতেই সহকর্মী তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বউটি আমাকেও অনুরোধ করেছিল, আমি যেন ওর স্বামীকে বলে অন্য পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিতে বলি। পাড়াটা বড় খারাপ। নষ্ট মেয়েরা খিস্তি-খেউড় করে, ওদের এড়াতে দিন-রাত ঘরেই বন্দি থাকতে হয়।

অনুরোধ করেছিলাম। খরচের কথা বলে সহকর্মীটি এক ফুঁয়ে আমার অনুরোধ উড়িয়ে দিল। পরিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবার দেড় মাসের মধ্যেই বউটি আবার অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিল। সহকর্মীটিই আমাকে খবর দেয়, বউকে আবার ভূতে ধরেছে চিঠি এসেছে। কবে আপনি ওকে দেখতে পারবেন জানালে, বউকে সেই সময় নিয়ে আসবো।

বলেছিলাম, 'আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমার অত নষ্ট করার মতো সময় নেই যে, তুমি দফায় দফায় বউকে অসুস্থ করাবে, আর আমি ঠিক করব। তুমি যদি তোমার বউ ও মেয়েদের এখানে এনে স্থায়ীভাবে রাখ, তবে ওকে স্থায়ীভাবে সুস্থ করা সম্ভব এবং তা করবও।'

সহকর্মীটি আমার কথায় অর্থ-খরচের গন্ধ পেয়েছিল, কলকাতায় আলাদা সংসার পাতা মানেই খরচ।

কেস-হিস্ট্রি ৫

ছেলেটি ব্যাঙ্গালোরের একটি কর্পোরেট হাউজে কাজ করেন। মাস মাইনে দু'লাখ টাকার মতো। ইয়ং সুদর্শন। মাস পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছিল টালিক্লাবে। সে এলাহি বিয়ে।

বাবা ছিলেন বড় টি কোম্পানির গার্ডেন ম্যানেজার। এখন থাকেন লেকটাউনে পাত্রী বনেদি পরিবারের মেয়ে।

পাঁচ মাস পরে মেয়ে ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে কলকাতায় বাপের বাড়ি ফিরে এলেন। মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হল।

ছেলেরা বড় ল-ইয়ার দিলেন। জামিন পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ—ছেলেটি সমকামী। বউকে পায়ু মৈথুনে বাধ্য করতো। সোজা কথায় ধর্ষণ।

বহু লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স হয়েছিল।

আমার রোলটা ছিল কিছুটা মধ্যস্থতাকারীর। কারণ—এ ছাড়া অন্য কোনো পথ আমার জানা ছিল না। দুজনের ভালোর জন্য ডিভোর্সই ছিল সেরা পথ।

সমাজের এইসব বিভিন্ন শ্রেণি বিন্যাসের বিচিত্র সব জীবনযাপন পদ্ধতি জানা থাকলে তবে তো থেরাপিস্ট সঠিক পথ দেখাতে পারবেন।

অধ্যায় : দুই

প্রধান কয়েকটি সাইকোথেরাপি নিয়ে আলোচনায় যাব

(১) বিহেভিয়র থেরাপি

কোনো মানুষ যখন স্বাভাবিক আচরণ না করে অস্বাভাবিক আচরণ করে তখন তাকে স্বাভাবিক আচরণে ফেরাতে বিহেভিয়র থেরাপি খুবই কার্যকর ভূমিকা নেয়।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে (adolescence) অথবা প্রথম যৌবনে যদি দেখেন আপনার সন্তানের লেখাপড়ায়, খেলাধুলায়, কাজকর্মে অবনতি হচ্ছে। বাড়িতে লোকজন আত্মীয়বন্ধু এলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ঠিকমতো স্নান করে না। অপরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে চায় না। স্নেহ-মমতা-শ্রদ্ধার প্রকাশ কমে যাচ্ছে—তবে বুঝবেন ওর কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। হয়তো ও ড্রাগ নিচ্ছে, সঙ্গে সমকামিতার শিকার। বয়স্কা মহিলা যেমন বন্ধুর মা, মাসি, পিসি এমনকি মায়ের কথা ভেবে হস্তমৈথুন করে বা তাদের কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িত হয়ে পড়েছে। রোগী মেয়ে হলে একইভাবে ড্রাগ, সমকামিতা ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে বাবা-কাকা-মেসো কিছুই বাচ-বিচার করে না।

একদম গোড়ার দিকে যখনই দেখবেন বয়ঃসন্ধিক্ষণে কেউ অপরিচ্ছন্ন থাকছে, কাজকর্মে দ্রুত অবনতি হচ্ছে ওমনি ওকে নিয়ে যান সাইকোলজিস্টের কাছে। তিনিই পারবেন আচরণ পাল্টে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে।

বিহেভিয়র মেডিসিন প্রয়োগের জন্য কোনো কোনো থেরাপিস্ট অভিজ্ঞ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠান।

(২) হিপনোথেরাপি

যখন সম্মোহন করে তারপর মনোরোগীকে প্রয়োজনীয় সাজেশন দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়, তখন সেই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে হিপনোথেরাপি।

(৩) সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল থেরাপি

যেসব সাইকোথেরাপি প্রচলিত আছে, তার প্রায় সবই মনোসমীক্ষণের উপর নির্ভর করে।

মনোসমীক্ষণ মনোনচিকিৎসার পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর। এই পদ্ধতিতে সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল থেরাপির সাহায্যে একজন থেরাপিস্ট রোগীকে তার বর্তমান অবস্থার কারণগুলো বোঝাবেন, রোগী নিজের যুক্তি দিয়ে সমস্যাগুলো বুঝতে পারবেন। এমনটা হলে রোগী সমস্যামুক্ত হয়ে যায়।

(৪) গ্রুপ সাইকোথেরাপি

যুক্তিবাদী সমিতির কনফারেন্সে কল্লোল আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সাহস বাড়ান যায় কী করে?

উত্তরে বলেছিলাম, যারা ওয়াগন ব্রেকার, যারা সুপারি কিলার—তারা সাহসী, না ভিতু?

কল্লোল—সাহসী।

আমি—ওরা তো সাহসী হয়েই জন্মায়নি। যে গ্রুপে বেশি সময় কাটাবে, সেই গ্রুপের ভালো-খারাপ দোষ-গুণ সবই ওদের প্রভাবিত করবে। সবই একটু একটু করে হয়ে ওঠার ব্যাপার।

তুমি যুক্তিবাদী সমিতির নানা কর্মকাণ্ডে নানা অ্যাকশনে যোগ দাও, দেখবে গ্রুপ সাইকোথেরাপির কল্যাণে তুমিও ভয়শূন্য একজন প্রতিবাদী সাম্যকামী মানুষ হয়ে উঠবে।

এক একটা গ্রুপের ছেলেমেয়েদের এক এক রকম সমস্যা অনুসারে ভাগ করে তারপর তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি, নেশাহীনতা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে থেরাপি দিলে রোগীর সমস্যা ও পরনির্ভরতা কেটে যায়।

(৫) ফ্যামিলি থেরাপি

পরিবারের মধ্যে সমস্যা আছে। মানসিক সমস্যা। সমাধান করতে থেরাপিস্ট প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলেন। আবার একসঙ্গেও কথা বলেন।

তারপর চেষ্টা করেন বোঝাবার মধ্য দিয়ে পরিবারের সবার সম্পর্ককে মজবুত করতে। বোঝাপড়া বাড়াতে।

সমস্যাগুলোর কারণ পরিবারের সদস্যদের বোঝাতে পারলে এবং উত্তরণের উপায় বাতলাতে পারলে সমস্যার সমাধানও হয়।

(৬) কাপেল থেরাপি

বিয়ের পর কিছু দম্পতির মধ্যে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মনের গড়মিল হতে পারে। তার থেকে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রাচীর তৈরি হতে পারে। দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের কারণে এমনটা হতে পারে। দুজনে কতটা ছাড়বে, কতটা আপস করবে—বুঝতে হবে। দুজনে অনড় ও বিপরীত মেরুর হলে থেরাপিস্ট চাইবেন দুজন ডিভোর্স নিক।

অনেক সময় সেক্স অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাবে মনের অমিল হয়, খিটিমিটি লেগেই থাকে। আবার মনের ও রুচির মিল না থাকলেও সেক্স অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব হতে পারে।

ধ্বজভঙ্গ থাকলে পুরুষ যৌনসঙ্গমে সক্ষম হয় না। আবার নারী কামশীতল হলে যোনি স্ফীত হয় না এবং যোনিপথ পিচ্ছল হয় না। ফলে সঙ্গম কষ্টদায়ক ও আনন্দহীন হয়।

সাধারণভাবে ধ্বজভঙ্গ ও কামশীলতার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মানসিক কারণে হয়।

এর কারণ খুঁজে বার করতে পারলে কাপেল থেরাপি সার্থক হতে পারে।

(৭) ব্রিফ সাইকোথেরাপি

আধুনিক নাগরিক জীবনের প্রয়োজনে কম সময়ে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষটির সমস্যা শোনেন থেরাপিস্ট এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্যা বিশ্লেষণ করে ক্লায়েন্টের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। এইসব ক্লায়েন্টরা সাধারণভাবে কর্পোরেট হাউজের হোমরাচোমরা।

(৮) গ্রুপ পার্সোনালিটি থেরাপি

'পার্সোনালিটি' বা 'ব্যক্তিত্ব' হল একজন ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যের ধারণা। ব্যক্তিত্বের বহিরঙ্গ হল পোশাক ক্যারি (বহন) করার ক্ষমতা, বাচনভঙ্গি, সুদর্শন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি।

কিন্তু দেখতে খারাপ এমন উচ্চমেধার মানুষ প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেনই। তাঁর জ্ঞান তাঁর ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে।

টেনশনে ভোগা মানুষ ব্যক্তিত্বহীন হবেন—যতই বহিরঙ্গে চাকচিক্য থাকুক।

এমনি হাজারো উদাহরণসহ পার্সোনালিটি বাড়াবার ক্লাসকে বলা হয় গ্রুপ পার্সোনালিটি থেরাপি।

বর্তমানে আরো নানা ধরনের সাইকোথেরাপি চালু হয়েছে।

অধ্যায় : তিন

টেনশন

মন থাকলে মনের চাপ থাকবে-ই। চাপ থাকে না মানসিক প্রতিবন্ধীর। সকাল থেকেই চিন্তা তাড়িত করে আমাদের—দাঁত মাজতে হবে, পটি করতে হবে। চা খেয়ে ব্যাগ হাতে বাজারে। কী কিনি? বাজার থেকে ফিরে খবরের কাগজ পড়া। পড়তে পড়তে কিছু কিছু খবর মনের চাপ বাড়িয়ে দেয়। সলমন খান একগাদা ভয়ংকর ও ঘৃণ্য মামলায় অভিযুক্ত। অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধীদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখার। তারপরও তাকে নিয়ে মিডিয়াগুলোর কী আদিখ্যেতা! জেলে কী খেল, কীভাবে ঘুমালো, মা অসুস্থ—এ'খবরটা পেলে সলমন নাকি জেল ভেঙে বেরিয়ে আসত। ভারতে এমন কোনো জেল তৈরি হয়নি যাতে সলমনকে আটকে রাখতে পারে! এসব কথা নাকি সলমন প্রেসকে বলেছে। কী কুৎসিত ক্রিমিনাল। কপালের মাঝখানে একটা গুলি করে শেষ করে দিলে দেশের আবর্জনা একটু পরিষ্কার হয়—এমনটাও আপনার ভাবনায় আসতে পারে।

আপনি চূড়ান্ত ক্যারিয়ারিস্ট এবং খাও-পিও-জিও মার্কা মানুষ না হয়ে চিন্তাশীল মধ্যবিত্ত হলে সলমনের খবর যথেষ্ট টেনশন তৈরি করতে পারে। তারপরও পড়ে থাকে সারাটা দিন। কর্মক্ষেত্র থেকে ঘুম পর্যন্ত নানা পর্যায়ে দেখা দিতে পারে নানা টেনশন।

১ বৈশাখ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ। সময় বিকেল চারটে। স্থান : কলকাতার সবচেয়ে বড় গ্রন্থ প্রকাশক সংস্থা 'দে'জ পাবলিশিং'। একটি টিভি চ্যানেলের তরফ থেকে কয়েকজন লেখকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন এক তরুণী। এক প্রবীণ লেখক তাঁর সাক্ষাৎকারে বললেন, "নতুন বছরে আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা যাকে-তাকে 'চিন্তাবিদ্' 'বুদ্ধিজীবী' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা থেকে বিরত হন এবং তা আজ থেকেই। গত কয়েকদিন ধরে আপনারা খেলোয়াড়, গায়ক, অভিনেতা, তবলচি ইত্যাদি পেশার মানুষদের গায়ে 'চিন্তাবিদ্' ও 'বুদ্ধিজীবী' ছাপ্পা মেরে হাজির করছেন। তাঁদের কাছে জানতে চাইছেন—ভোট বয়কট বিষয়ে মতামত। গতকাল মতামত জানালেন এক নামি তবলচি। বললেন, 'ভোট-দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের মহান কর্তব্য। যাঁরা ভোট বয়কটের কথা বলেন, তাঁরা কী করে এমন কথা বলেন ভেবে অবাক হই?' তবলচির এসব ফালতু কথা

শুনতে শুনতে চড়চড় করে টেনশন বেড়ে গেল। একটা অন্ধ আমাদের পথ দেখাবার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

'চিন্তাবিদ' ছাপ্পা মারা তবলচি এও জানেন না, বিধানসভায় সংসদে এমনকি রাষ্ট্রসঙ্ঘেও বিধায়ক, সাংসদ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের ভোট দেওয়া অথবা না দেওয়ার অধিকার আছে। 'কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস' অনুসারে কাউকে ভোট না দেওয়ার অধিকার ভারতের ভোটারের আছে। তবে নাগরিকদের ভোট না দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করার উনি কে?

"চিন্তার চর্চা না করা একটা মানুষকে 'চিন্তাবিদ্' বলে আপনারা প্রচার করলে তাঁর ভুল মতামত সাধারণ মানুষকে ভুল পথে-ই নিয়ে যাবে। এই ভুলের শুরু আপনারা মিডিয়ারা-ই আরম্ভ করেছেন। আপনারা আজ থেকে-ই এই ভুল বন্ধ করুন।"

প্রবীণ লেখকটির কথা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিচ্ছিল—টেনশন স্বাভাবিক নেই। বেড়ে গেছে।

সুজিতবাবু স্ট্রোকে মারা গেলেন। তাঁর ছেলে বলল, বাবার ব্লাডপ্রেশার ছিল। আরে...কোনো মানুষ বেঁচে আছে মানে-ই তার ব্লাডপ্রেশার আছে। ব্লাডপ্রেশার অস্বাভাবিক রকম কম বা বেশি মানে-ই খারাপ। একইভাবে টেনশন অস্বাভাবিক রকমের কম মানে হতে পারে মানসিক প্রতিবন্ধী, অস্বাভাবিক বেশি মানে শারীরিক ও মানসিক নানা রোগের সম্ভাবনা।

কেউ আপনাকে পাঁচ টাকা ঠকালে আপনি রেগে যান। চোখের সামনে কোনো অন্যায় দেখলে রিঅ্যাক্ট করেন। আমার এক বান্ধবী যাচ্ছিলেন অফিস, বাস আচমকা ব্রেক কষলো। এক মহিলা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। নাক ফেটে প্রবল রক্তপাত। উনি মহিলাকে নিয়ে নামলেন। হ্যাঁ, একা-ই নামলেন। বাসযাত্রীদের শুকনো সহানুভূতি বাসের সঙ্গেই বিদায় নিল। আহত মানুষটিকে নিয়ে এতো ডাক্তারের চেম্বারে গেলেন। ড্রেসিং করিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে মানুষটিকে তাঁর অফিসে পৌঁছে দিয়ে নিজের অফিসে গেলেন। মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় স্টপেজে নামতে দেখেও সাহায্য না করে অফিস উনি যেতে পারতেন না। সারা দিন আহত মানুষটির কথা ভাবতে ভাবতে টেনশন বাড়াতেন। কারণ উনি সুসমাজের বিবেক।

সবাই ওঁর মতো নন। সত্যি বলতে কী; বান্ধবী বর্তমান সমাজে ব্যতিক্রম। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাটাই শহর কলকাতার মূল চরিত্র। আহত মানুষ, স্ট্রোকে আক্রান্ত মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থেকে থেকে মারা যান। হাজার মানুষ পড়ে থাকা মানুষটিকে দেখেও দেখেন না। এসব তুচ্ছ ঘটনা কলকাতার পাবলিকের মনে দাগ কাটে না, টেনশন তৈরি করে না। বান্ধবীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য এইটুকু যে, তিনি সংবেদনশীল, সমাজ সচেতন। অন্যেরা স্বার্থচিন্তায় মগ্ন, অসামাজিক মানুষ। এই বিবেকবানের সংখ্যা বড় বেশি রকমের কম।

যখন বাড়তি টেনশন লড়াইয়ের জন্য তৈরি করে

মানসিক চাপ বাড়লে বাড়তি টেনশন তৈরি হয়। কে কতটা চাপ সহ্য করতে পারে, তা মানুষে মানুষে যেমন পার্থক্য তৈরি করে তেমন-ই অবস্থা, সিচুয়েশন, চাপের ধরন, সেই বিশেষ ধরনের চাপকে গ্রহণ করার শক্তি ইত্যাদি বহুতর বিষয়ের উপর টেনশনের পরিমাপ নির্ভর করে।

ফুটবল ম্যাচটা যখন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে, তখন দেখা যায় দু'দলের খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা—প্রত্যেকেই বাড়তি টেনশনে কাবু। এই স্নায়ুযুদ্ধে যে জেতে, সে খেলাও জেতে।

স্নায়ুতন্ত্র ও টেনশন

টেনশনের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হল 'অটোনমিক নারভাস সিস্টেম'। এর আবার দুটো অংশ। (এক) 'সিমপ্যাথেটিক', (দুই) 'প্যারাসিমপ্যাথেটিক'।

যখন আপনি কোনো বিপদের মুখোমুখি অথবা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি, তখন আপনার শরীরের 'অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি' 'অ্যাড্রেনালিন' হরমোনের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে সক্রিয় হয়ে ওঠে 'সিমপ্যাথেটিক' স্নায়ুতন্ত্র।

৯০ মিনিট তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা বাঘের মতো লড়ে যাচ্ছে। রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই লড়াইয়ের সেনানীরা মাঠের পাশে এসেই শরীর এলিয়ে দেয়। উঠে দাঁড়াবার শক্তি বা ইচ্ছে নেই। লড়াইয়ের শেষে এই যে শরীর এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম বা আরাম পায় শরীর ও মন—এটা 'প্যারাসিমপ্যাথেটিক' স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। 'প্যারাসিমপ্যাথেটিক' স্নায়ুতন্ত্র শরীর ও মনের উপর নার্ভের বাড়তি চাপকে কমিয়ে আনে এবং আবার লড়াইয়ের আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

মাঝারি টেনশন কর্মদক্ষতা বাড়ায়

গাড়ি চালাচ্ছেন রিলাক্সড় মুডে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, একটুও টেনশন নেই। ট্রাফিক আইন মেনে, রাস্তার গাড়ি ও পথচারি মানুষদের বাঁচিয়ে গাড়ি চালাতে সচেতন তো হবে-ই। হালকা টেনশন তো থাকবে-ই। এটুকুও না থাকলে দুর্ঘটনা অনিবার্য।

**সৃষ্টিশীল কাজে, যে কোনও বিষয়ে গভীর গবেষণায়
চিন্তা ও শরীরকে ক্রিয়াশীল করতে হালকা বা
মাঝারি টেনশন জরুরি। আবার বেশি রকম
টেনশন সব সময় এইসব কাজকে
ভণ্ডুল করে দেয়।**

একটানা বাড়তি স্নায়ুচাপ, মানেই শরীর ও মনের ক্ষতি

বাড়তি স্নায়ুচাপ বা টেনশন যদি দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে, তবে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, দক্ষতা হ্রাস পায়, ব্যক্তিত্ব খর্বিত হয়, মেধা-বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়, অলীক নানা

ভয়ের শিকার হওয়াও সম্ভব। যেমন বাড়ি থেকে বেরতে ভয়, মনোযোগ দিতে না পারার সমস্যা, ভুলে যাওয়ার সমস্যা, বাসে-ট্রামে-প্লেনে চড়তে ভয়, রাস্তা পার হতে ভয়, মানুষের সঙ্গে মিশতে ভয়, উর্ধ্বতন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তোতলামো, দূরে কোথাও যাওয়ার জন্যে ট্রেন ধরতে যাবার আগে পেটখারাপ, ঘন-ঘন হিসি করতে যাওয়া, পরিবারের লোকদের ছেড়ে অফিসের কাজে কিছু দিন বাইরে থাকতে হবে শুনে-ই হাঁপানির টানে সোজা নার্সিংহোমে যাওয়া, দিন-রাত নানারকম কাজের মধ্যে ডুবে থাকার পাগলামি, অন্যের মতামত ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, অতি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠা, বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মিশতে ভয়, নারভাসনেস থেকে মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, কপালের দুপাশে দপ্‌দপ্ ব্যথা, মাংসপেশিতে মাঝে-মাঝেই টান, গলায় কিছু আটকে আছে মনে করা ইত্যাদি হতে পারে।

বাড়তি টেনশন বা স্নায়ুচাপে মেয়েদের কামশীলতা, ছেলেদের যৌন অক্ষমতা দেখে দিতে পারে। কাজে না গিয়ে অজুহাত খাড়া করে বাড়িতে বসে থাকার চেষ্টা করতে পারে।

একটা কথা আরো একবার স্পষ্ট করে দিই। 'বাড়তি টেনশন' মানে—একজন মানুষ যতটা টেনশন সহ্য করতে পারে, তার চেয়ে বেশি টেনশন। বাড়তি টেনশনে যেসব শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় বলে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সেসব প্রতিক্রিয়া একই সঙ্গে দেখা যাবে—এমনটা নয়। এক বা একাধিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

টেনশন রোগ তৈরি করে। আবার রোগ টেনশন বাড়ায়। এটা চক্রাকারে চলতেই থাকে। এই চক্রের গতি থামাতে পারে 'রিল্যাকসেশান'।

বাড়তি টেনশন যেসব রোগ তৈরি করতে পারে

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ যতটা এগিয়েছে তাতে মানুষের গড় আয়ু গত পঞ্চাশ বছরে দেড়গুণ বেড়েছে। বেশিরভাগ রোগ থেকে মুক্তির ওষুধ মানুষ আবিষ্কার করেছে। ব্লাডপ্রেশার, ব্লাডসুগার, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের মতো রোগকে কনট্রোলে রেখে আনন্দের সঙ্গে বাঁচাটা এখন কোনো ব্যাপার নয়। এমন একটা অবস্থায় টেনশন বা স্ট্রেস মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে কাবু করুক—এটা কখনই অভিপ্রেত নয়। এই তিন অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়ও বিজ্ঞান বের করেছে। উপায়—'রিল্যাকসেশান'।

টেনশন বা স্ট্রেস যেসব শারীরিক রোগ তৈরি করে সেগুলো হল :

শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। মাংসপেশিতে খিঁচ, পাকস্থলীতে জ্বালা ধরা যন্ত্রণা, পেপটিক আলসার, গ্যাসট্রিক আলসার, কোলাইটিস, হার্ট-অ্যাটাক, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, বাত, ব্লাডপ্রেশার, ডায়াবেটিস, স্কিন ডিজিস, নারীদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব, যৌন-শীতলতা, গর্ভপাত, পুরুষদের যৌন-অক্ষমতা ইত্যাদি।

মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি রোগও আসে লাগাতার টেনশন বা স্ট্রেস থেকে। মানসিক অবসাদ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে মানসিক রোগ, আত্মহত্যার প্রবণতা। তৈরি করে নানা 'ফোবিয়া'।

টানা উদ্বেগ বা টেনশন মনঃসংযোগ, বুদ্ধি, স্মৃতি, জ্ঞান, বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা—সবের-ই ক্ষতি করে।

একটানা টেনশনে ভুগলে যে রোগগুলো সবচেয়ে বেশি হয়

কোমরে ব্যথা, পিঠের নিচের দিকে ব্যথা (Low backpain), পেটে ব্যথা, মাথার ব্যথা। এইসব টেনশন থেকে তৈরি রোগ সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে দৌড়ানো, তাঁদের নির্দেশ মতো ওষুধ খাওয়ার পরও সমস্যা মেটার লক্ষণ দেখা যায় না। তখন শুরু হয় রোগ নির্ণয়ের জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাতেও রোগ ধরা পড়ে না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার জানান—রোগটা 'সাইকোসোমাটিক'। অর্থাৎ মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ। মানসিক কারণটা এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই স্নায়ুচাপ, টেনশন বা স্ট্রেস।

কোনো রোগকে 'সাইকোসোমাটিক' রোগ অর্থাৎ মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ বলে ডাক্তার যদি চিহ্নিত করেন তবে মনোরোগ-চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়াটা জরুরি। মনোরোগ-চিকিৎসক যদি মনোবিদের সাহায্য নিতে বলেন, তবে অবশ্যই তা নিতে হবে। নতুবা এইসব মনোশারীরিক রোগ থেকে মুক্তি নেই।

সবচেয়ে ভালো হল টেনশন দেখা দিলে 'রিল্যাকসেশান' করে টেনশনকে নির্মূল করা। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে রাখতে হবে—'রিল্যাকসেশান' টেনশন কন্ট্রোলে রাখার অতি কার্যকর পদ্ধতি হলেও সব সময় অসাধারণ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে না।

যে হতদরিদ্র, বেকার, বিনা বিচারে জেলের ভিতর অত্যাচারিত, যে মুসলিম ধর্মের গুজরাটবাসী মানুষটি চোখের সামনে দেখেছে স্ত্রী ও বোনকে ধর্ষিতা হতে, বাবা ও ভাইকে জীবন্ত পুড়ে মরতে সেইসব মানুষ 'স্ট্রেস ডিসঅর্ডার'-এর শিকার হতে-ই পারে। এসব ক্ষেত্রে 'স্ট্রেস ডিসঅর্ডার' ঠিক করতে প্রয়োজন গরিবি হটানো, বেকারদের কর্মসংস্থান, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পার্টি সন্ত্রাস বন্ধ করা, বিনা বিচারে বন্দিদের মুক্তি, মনোরোগের চিকিৎসা ইত্যাদি। শুধু রিল্যাকসেশানে এইসব সমস্যাক্লিষ্ট মানুষদের টেনশনমুক্ত করা সম্ভব নয়। আবার এও ঠিক যে, রিল্যাকসেশান এদেরও শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তোলে, কষ্ট কিছুটা কমায়, স্ট্রেস কমায়।

অর্থাৎ রিল্যাকসেশানের কার্যকারিতা প্রায় কোনো জায়গাতেই একেবারে মূল্যহীন নয়।

টেনশনের কারণ ও চাপ সহ্যের ক্ষমতা

'টেনশন' বলতে আমরা আলোচনায় টেনশন বৃদ্ধিকেই ধরবো। মানসিক চাপ বা টেনশন অথবা স্ট্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উৎকণ্ঠা বা অ্যাংজাইটি এবং মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশন। আট থেকে আশি, অনিল আম্বানি থেকে ছাতু-পানি বিক্রেতা সবাই এখন টেনশনের শিকার। টেনশন বা স্ট্রেসের থাবার নিচে পুরুষ থেকে নারী।

শহর ও শহরতলির মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের লাইফস্টাইল, আচার-ব্যবহার, রুচি, ধ্যান-ধারণা সব-ই পাল্টে গেছে। জীবনযাত্রা দ্রুততর হচ্ছে। ভোগ সামগ্রীর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। এই দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে মানসিক চাপ

বাড়ছে। একই সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিতে কারো কারো চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ছে। মানসিক দৃঢ়তা বাড়ছে।

একজন সফল খেলোয়াড়, অভিনেতা, গায়ক ইত্যাদিরা সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব ও চাপ সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে। সানিয়া মির্জা থেকে সচিন তেণ্ডুলকর প্রত্যেকেই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে-ই চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ও মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন।

আবার চোর–পুলিশ করতে করতে বড় মাপের ক্রিমিনালদের মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা অসম্ভব রকমের বেশি। একজন মানুষ টেনশনে কতটা কাবু হবে অথবা হবে না, তা অনেকটা নির্ভর করে জীবনযাত্রার ধরন, পেশা, বয়স, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক চাপ, কর্মক্ষেত্রের চাপ, কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক সম্পর্ক, রোজগারের পথ খুঁজে না পাওয়া, সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তা, অর্থচিন্তা, সময়ের অভাব, রোগভোগ ইত্যাদি এবং সেইসঙ্গে এইসব চাপ সহ্য করার ক্ষমতার উপর।

অধ্যায় : চার

রিল্যাকসেশান পদ্ধতি

'মেডিটেশন', 'রিল্যাকসেশান' বা 'স্বসম্মোহন' যে নামেই ডাকুন, সব একই।

রিল্যাকসেশান করার প্রয়োজন তাঁদের, যাঁরা অত্যন্তবেশি রকমের মস্তিষ্কচর্চা করেন। হতে পারেন, তাঁরা রাজনীতিক, বহুজাতিক সংস্থার কর্তা–ব্যক্তি, বিজ্ঞানী, লেখক, চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ইত্যাদি। মস্তিষ্কচর্চাকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিয়ে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে মেডিটেশন করা অবশ্যই ভালো।

কীভাবে মেডিটেশন বা রিল্যাকসেশান করবেন

মেডিটেশন বা রিল্যাকসেশানের সময় বাছুন এমন, যখন নিস্তব্ধ। বাইরের দুম–দাম আওয়াজ বা গাড়ি যাতায়াতের হর্ন ও আওয়াজ বিঘ্ন ঘটাবে না। আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে পরিবেশটাই নিরিবিলি। এমনটাও আদর্শ পরিবেশ।

পোশাক হবে অত্যন্ত ঢিলে–ঢালা। অন্তর্বাসকে বিদায় দিন। দেখবেন, পোশাক যেন আরামদায়ক হয়।

বিছানা হবে আরামদায়ক এবং অবশ্যই ধোপদুরস্ত। চাদর সাদা অথবা হাল্কা রঙের হলে ভালো হয়। মাথার বালিশ হবে অল্প উঁচু। পাশ বালিশ চলবে না। মশারি চলবে না। মশার উপদ্রব থাকলে জানলায় নেট লাগান। মশা তাড়াবার জন্য ধূপ না ব্যবহার করে লিকুইড ব্যবহার করুন। এতেও মশা না গেলে সাদা, উঁচু, নাইলনের মশারি টানাতে পারেন।

রিল্যাকসেশানের ঘরে আসবাবপত্রের ভিড় লাগাবেন না। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ঘর রিল্যাকসেশানের পক্ষে আদর্শ।

ঘরে হালকা রঙের নাইটল্যাম্প জ্বালতে পারেন। নাইটল্যাম্প এমনভাবে লাগাবেন, যাতে আপনি বিছানায় শুলে ল্যাম্পের আলো চোখে না পড়ে।

লো ভলিউমে, মনকে আরাম দেওয়ার মতো ক্যাসেট বা সিডি বাজতে দিন। বাজাবেন রিল্যাকসেশান শুরু হওয়ার সামান্য আগে থেকে।

ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসুন। চোখে–মুখে ভালো করে জল ছিটিয়ে আসুন। খুবই ভালো হয় স্নান সেরে রিল্যাকসেশান করলে।

শুধুমাত্র নাইটল্যাম্পটা জ্বালুন। মিউজিক চালিয়ে দিন। হালকা পোশাক পরে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। শোয়ার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিন। ল্যান্ডফোন ও মোবাইল বন্ধ রাখুন।

বালিশে মাথা রেখে চিত হয়ে শোবেন। দু'পায়ের মধ্যে ফাঁক থাকবে এক ফুটের মতো। হাত দুটো পায়ের দিকে লম্বা করে রাখুন। হাত থাকবে শরীর থেকে সামান্য দূরে। অর্থাৎ শরীরে হাত ছুঁয়ে আড়ষ্ট হয়ে শোবেন না। একদম রিল্যাক্স মুডে শোবেন।

চোখ বন্ধ করুন। এবার এক মনে ভাবতে থাকুন, আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘু...ম পাচ্ছে। চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। ঘুম আসছে। ঘু...ম...। আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। এভাবে চিন্তা-শূন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে আপনার ভালো লাগছে। আপনার কপালের চিন্তার রেখাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। কপালের পেশিগুলো নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার গালের পেশি নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনার চোয়ালের পেশি নরম, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। ঘু...ম...।"

"আপনার চোখের পাতা ভারী হয়ে গেছে। দু'চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। আপনার ডান কাঁধটা নিয়ে ভাবুন। ডান কাঁধের পেশি শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। আপনার ডান কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত পেশিগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত ভাবুন। কনুই থেকে কবজির পেশিগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। হাতের তালু ও আঙুলগুলোর পেশি শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটা ভারী হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। ডান হাতটা ভারী হয়ে গেছে।"

একইভাবে বাঁ কাঁধ থেকে সাজেশন দেওয়া শুরু করে হাত ভারীতে শেষ করুন।

"আপনার বুকের কথা ভাবুন। বুকের পেশিগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ধীরে ও গভীরভাবে হচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। এভাবে চিন্তা-শূন্য হয়ে ঘুমোতে আপনার ভালো লাগছে।"

"আপনার পেটের পেশিগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার কোমরের পেশি শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে।"

"ডান পায়ের থাইয়ের পেশি নিয়ে ভাবতে থাকুন। থাইয়ের পেশি শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পায়ের কাফের পেশি নিয়ে ভাবুন। পেশিগুলো শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পায়ের পাতা ও আঙুলগুলোর পেশি শিথিল, নরম হয়ে যাচ্ছে। ডান পা'টা ভারী হয়ে যাচ্ছে। ভারী হয়ে বিছানার উপর পড়ে আছে।"

একইভাবে বাঁ পা নিয়ে সাজেশন দিতে থাকুন।

যে কথাগুলো ভাবতে বললাম, সে কথাগুলো তিনবার করে ভাবতে থাকুন।

এবার আপনি ভাবতে থাকুন, চিন্তা-শূন্য হয়ে এভাবে পড়ে থাকতে ভালো লাগছে। এক চিন্তা-ভাবনাহীন আনন্দের জগতে আপনি এখন আছেন। আনন্দ...আনন্দ...শুধুই আনন্দ...। এ হল 'মেডিটেশন' বা 'রিল্যাকসেশান'।

আপনি এমন ভাবতে ভাবতে, আধা ঘুম-আধা জাগরণের অবস্থা থেকে একসময় পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। অথবা ধীরে ধীরে জেগে উঠতে পারেন। স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে যা হতে চায় তাই হতে দিন। যতক্ষণ বিশ্রাম নিতে চায় নিতে দিন। কখনই জোর করে ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করবেন না।

এই যে এতক্ষণ আপনি মনে মনে ভাবলেন—ঘুম পাচ্ছে থেকে পেশিগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি, এই ভাবনা আপনার মস্তিষ্ক কোষে এই ধারণাগুলো সঞ্চার করছে। এই ধারণা সঞ্চারকেই বলে 'সাজেশন'।

শিথিলায়নের সাজেশন হবে পা থেকে মাথায় নয়, মাথা থেকে পায়ে

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে ঘুম। হাইপোথ্যালামাসকে ঘুমের বিষয়ে সাহায্য করে চোখ, পিনিয়াল গ্রন্থি ও পন্‌স।

চোখের রেটিনা থেকে হাইপোথ্যালামাস খবর পায় দিন কি রাত। ঘুমের জৈব ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে তখন হাইপোথ্যালামাস কাজ করতে শুরু করে।

পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে 'মেলাটনিন' হরমোনের নিঃসরণ হতে শুরু হলে আমাদের ঝিম আসে, আধা-জাগরণ আধা-ঘুমের মতো অবস্থা আসে। তারপর আসে ঘুম।

পন্‌স পশ্চাত মস্তিষ্কে সংকেত পাঠিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডকে তার কাজকর্মকে কমিয়ে দিতে সংকেত পাঠায়। ফলে হার্ট রেট, পাল্‌স রেট, ব্লাডপ্রেশার, শ্বাস-প্রশ্বাসের ডিউরেশন কমে যায়।

আমরা যখন ঘুমোতে শুরু করি তখন মস্তিষ্কের কাছাকাছি পেশিগুলো শিথিল হতে থাকে। মুখের পেশি শিথিল হওয়ার জন্য অনেকের মুখ থেকে লাল গড়ায়। মুখের পরেই ঘাড়, পিঠ, বুক, হাতের উপরের দিকের পেশি, হাতের নিচের দিকের পেশি, হাতের পাতা, পেটের পেশি, পায়ের পেশি এবং তারপর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশিগুলো শিথিল হতে থাকে।

তাই রিল্যাকসেশানের সময় পেশিগুলো শিথিল হওয়ার সাজেশন দেওয়া হয় চোখ থেকে পায়ের দিকে। পা থেকে চোখের দিকে নয়।

মেডিটেশনে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বিশ্রাম পায়। সঙ্গে দেহের স্নায়ুকোষ, শরীরের বিভিন্ন পেশি বিশ্রাম পায়। টেনশন, উত্তেজনা বা উদ্বেগ দূর হয়। রক্তচাপ বৃদ্ধি স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে। উদ্বেগ বা টেনশন থেকে ব্লাডসুগার ও হাঁপানি হয়ে থাকলে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শরীর ক্লান্তিহীন ও ঝরঝরে লাগে।

যোগী-সন্ন্যাসী-স্বামীজি-মাতাজিরা যেভাবে যোগকে, মেডিটেশনকে রহস্যময় করে রেখেছেন, আসলে আদৌ তেমন নয়। বরং অত্যন্ত সরজ-সরল একটি পদ্ধতি।

অনেকেই আছেন, যাঁরা সহজ-সরল পদ্ধতির চেয়ে কঠিন,
অবোধ্য বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হন বেশি। জ্ঞানী কিন্তু
সহজ-সরল মানুষের মুখোমুখি হলে জ্ঞানী মানুষটির
বিষয়ে আমাদের মনে তৈরি হওয়া
মুগ্ধতা মুহূর্তে খসে পড়ে।

ঘ্যামওয়ালা, দূরত্ব বজায় রাখা মধ্যমেধার মানুষকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচি। এটা আমাদের মূল জাতীয়-চরিত্র। সুতরাং আমরা সহজ-সরল রিল্যাকসেশান তত্ত্বকে ছেড়ে যোগীদের পিছনে দৌড়তেই ভালোবাসি। এই জাতীয় ঐতিহ্যকে আমরা কি বিসর্জন

দিতে পারবো? সাদাকে 'সাদা' এবং কালোকে 'কালো' বোঝার ও বলার মতো মেধাশীল ও সাহসী হতে পারবো?

সময়ই তা বলে দেবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে—রিল্যাকসেশান, মেডিটেশন বা যোগ আসলে যাকে বলা যায় 'রিল্যাকসেশান', তা পাশ্চাত্যের কর্মব্যস্ত মানুষের জন্য যতটা প্রয়োজন, আমাদের মতো আয়েশি, অলস প্রজাতির জন্য ততটা নয়। **খেটে খাওয়া দীন মজুরদের ব্যায়ামের কোনো অভাব হয় না। তারা দিনের শেষে পেট ভরে খেয়ে টেনে ঘুম দিলেই তাদের রিল্যাকসেশান হয়ে যায়।** শহুরে মানুষরা যাঁরা বসে কাজ করেন, কাজের ফাঁকে আড্ডা, ক্যারাম, পরচর্চা চলে, তাদের দরকার স্রেফ ব্যায়াম। জগিং অথবা কোনো আখড়া বা 'জিম'-এ গিয়ে সঠিক ঘাম-ঝরানো ব্যায়াম। মিতাহারী না হলে রোগভোগ নিশ্চিত। বাকি রইল প্রচুর মাথার কাজ, পড়াশোনা, কম ঘুম, কাজের চাপ, টেনশন এর শিকার আধুনিক শিক্ষিত প্রজন্ম এবং বিভিন্ন সংস্থার বড় সাহেব বা রাজনৈতিক নেতারা। তাঁদেরই সত্যি দরকার, মানসিক টেনশন কমাতে ও শরীর ঠিক রাখতে হালকা ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম বা যোগব্যায়াম বা মেডিটেশন নামক রিল্যাকসেশান পদ্ধতি।

মনে পড়ছে খুশবন্ত সিংহের একটা কথা। উনি বলেছেন—"Work is worship but worship is not work" অর্থাৎ কর্মই সাধনা, কেবলমাত্র সাধনা বা পুজো কোনো কর্ম নয়।

ধর্মের নামে মনকে চিন্তাশূন্য, নির্লিপ্ত করা একটা বোকামি, কারণ পৃথিবীর যত মহান কাজ—শিল্প, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সবেরই মূলে আছে চঞ্চল, কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু মন।

মনকে স্থবির, অনড় করে ধ্যান বা যোগসাধনা করার মধ্যে মহৎ কিছু দেখতে পান না এই নব্বই-উত্তীর্ণ রসিক সাংবাদিক, যাঁর লেখার ধার, স্মৃতিশক্তি, মেধা, বুদ্ধি আমাদের এখনো অবাক করে।

অধ্যায় : পাঁচ

যৌনতা এবং যৌন-সমস্যা

যৌনতা হল মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। যৌনতা বা sex হল অন্যতম প্রধান জৈব আকর্ষণ বা biological tendency যা জীবনের বহু কিছুকেই চালিত করে।

মনোরোগীদের মনোসমীক্ষণ করলে দেখা যায় এইসব রোগীদের অনেকেরই যৌনজীবনে কোনো না কোনো সমস্যা রয়েছে।

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আদিম সমাজে প্রতিটি নারী প্রতিটি পুরুষের এবং প্রতিটি পুরুষ প্রতিটি নারীর যৌনসঙ্গী ছিল। যৌনতাবোধ ও যৌনশক্তি আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের এই যৌথ যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একসময় যৌথ যৌন সম্পর্ক থেকে দ্বন্দ্ব, ঝগড়ার শুরু হল। এল যৌন সম্পর্ক ঘিরে পরিবারের চিন্তা। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে পরিবারের পাঁচিল তুলে সমাজে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা হল।

এই পাঁচিল ছিল আরোপিত সম্পর্কের পাঁচিল। এরপরও নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক মাঝে-মধ্যেই সমাজের সম্পর্ক ভেঙেই স্থাপিত হতে লাগল।

আজো আমাদের সমাজে নারী-পুরুষদের মধ্যে বহুগামিতা আছে। নারী ও পুরুষ দেহব্যবসায়ী আছে। কামের জন্য কাম আছে, অজাচার আছে।

প্রেম চিরন্তন না হতেই পারে। গভীর বন্ধুত্বে প্রেম আসে। প্রেম এলে কাম আসবেই। সেই কাম একগামী হবে—এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের সমাজের অবক্ষয়ের জন্য সামাজিক পরিবেশই দায়ী। আমাদের মা-বাবা-আত্মীয়-প্রতিবেশী-শিক্ষক-বন্ধু-ধর্মগুরু-বইপত্তর-সিনেমা-ব্লুফিল্ম, থিয়েটার ইত্যাদি সবই ছোটবেলা থেকে আমাদের প্রভাবিত করতে থাকে, আমাদের শেখাতে থাকে। আমাদের যেমন শেখায় আমরা তেমনই শিখি।

আমরা ব্লুফিল্ম দেখবো, কী সমকামী হব, ড্রাগের নেশা করবো, কী সমাজ বিরোধী হব—সবই আমাদের বিশৃঙ্খল-দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ ব্যবস্থাই শেখায়।

প্রেম ও যৌনতা নিয়ে ধর্মগুরু রজনীশের প্রবচন থেকে কিছু প্রবচন তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

রজনীশের প্রবচন থেকে কিছু নির্যাস

- সব ধর্ম-ই মুখে প্রেমের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে প্রেমকে জোর করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শেখায়।
- ধর্মগুরুরা-ই মনকে বিষময় করেছে। প্রেমকে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে উৎসারিত হওয়াকে কীভাবে বাঁধ দিয়ে আটকাতে হয়, তা শিখিয়েছে।
- যে ধর্ম ব্রহ্মচর্য পালনকে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে শেখায়, সে ধর্ম প্রেমের শত্রু।
- প্রেমের সঙ্গে কাম মিলে-মিশে থাকে। কামকে বাদ দিয়ে প্রেম হয় না। আর, প্রেমহীন কাম লাম্পট্য হতে পারে, প্রেম নয়। সব ধর্মগুরু ও মহাত্মারা কামকে পাপ, অধর্ম, বিষ বলে ঘোষণা করেছেন।
- কামকে আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার সর্বপ্রথম চেষ্টা তান্ত্রিকরা-ই করেন। তাঁরা-ই প্রথম বলেছিলেন, কাম তৃপ্তিতে যে আনন্দ তা-ই ব্রহ্ম, তা-ই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তথাকথিত হিন্দু ধর্মগুরুরা কি তন্ত্রের এই সার কথাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবেন?
- পরমাত্মা কাম শক্তিকে-ই সৃষ্টির মূল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের জন্ম-ই কামনা থেকে। পরমাত্মা যাকে 'পাপ' বলে মনে করেন না, মহাত্মা, ধর্মগুরুরা তাকে 'পাপ' বলে থাকেন। এরপর বলতে-ই হয়, যে ধর্মগুরুরা পরমাত্মার বিধান উল্টে দিতে চায়, তাদের চেয়ে পাপী এ'জগতে আর কেউ নেই।
- মনে রাখা দরকার, ব্রহ্মচর্য পালন করা সংযমীরা খুব বিপজ্জনক লোক। তাদের ভিতরে রয়েছে কামনার আগুন, বাইরে সংযমের মুখোশ। তাই শত-শত বছর ধরে এইসব মুখোশধারী ধর্মগুরুদের দ্বারা ধর্ষণের ঘটনা চলে আসছে এবং আসবে।
- সমস্ত ধর্ম-ই মৃত্যুবাদী, জীবনমুখী নয়। ধর্মের দৃষ্টিতে-মৃত্যুর পর যা কিছু তা-ই মহত্বপূর্ণ। জীবিত অবস্থার কোনো কিছুই মহত্বপূর্ণ নয়।
- পৃথিবীর একশ জন পাগলের মধ্যে আটানব্বই জন হয়েছে কাম দমনের জন্যে। পৃথিবীর একশ হিস্টিরিক রোগী নারীর মধ্যে নিরানব্বই জনের মূর্ছা রোগের কারণ অবদমিত যৌনতা।
- বাচ্চারা যখন দেখে মা-বাবারা যৌনতাকে নোংরা বলছেন মুখে এবং সুযোগ পেলেই সেই যৌনতায় মেতে উঠছেন; তখন তারা মা-বাবাকে প্রতারক, ভণ্ড, নোংরা ইত্যাদি মনে করে। শ্রদ্ধা যায় শেষ হয়ে।
- যারা জীবনে প্রেম করার সঙ্গী পায়নি, তারা-ই কামুক। টাকা খরচা করে কাম মেটায়।
- ভালবাসা এক স্বভাব, 'রিলেসনশিপ' বা সম্পর্ক নয়।
- মনে মনে যৌনক্রিয়া বা স্বমৈথুন বিকৃত মনের লক্ষণ। সম্ভোগ করুন শারীরিকভাবে। এই সম্ভোগ কখন-ই ধর্ষণ হবে না। হবে নারী-পুরুষের মিলিত ইচ্ছায়।
- যে দেশে প্রেম ছাড়া বিয়ে হয়, সেই দেশে যৌনতা শরীরের স্তরে-ই থেকে যায়। তার বেশি উঠতে পারে না।

- যে ধরনের ভালবাসার বিয়েতে পণ্ডিত, জ্যোতিষ, জাত, ধর্ম, অর্থের বিচার প্রধান্য পায় না, সেখানে ভালোবাস-ই প্রাধান্য পায়।
- বিয়ে কখনই দুটি নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ার ব্যবস্থা হতে পারে না। কেননা, মন চঞ্চল, রুচি পরিবর্তনশীল। তাই পতি-পত্নীর শারীরিক মিলন কখন-ই চিরস্থায়ীভাবে গভীর হতে পারে না।
- প্রেম ছাড়া সামাজিক যেসব বিয়ে হয়, তাতে পতিনির্ভর পত্নীর অবস্থা বেশ্যার মতো। তফাত খুব-ই সামান্য। বেশ্যাকে একদিনের জন্যে কেনেন। পত্নীকে সারা জীবনের জন্যে।

রজনীশের এই প্রবচনগুলো বিকৃতি না ঘটিয়ে তুলে দিলাম।

যৌন সমস্যা

যৌন সমস্যা নিয়ে আলোচনা দুভাবে হতে পারে। **(এক)** শালীনতা বজায় রেখে, মানে আরকি 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' করে। **(দুই)** যৌন সমস্যাগুলো নিয়ে সহজ করে আলোচনা করা। এতে অবশ্য কেউ কেউ আলোচনায় যৌনতার আঁশটে গন্ধ পেতে পারেন।

'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' মার্কা আলোচনার একটা বিপদ আছে। এমনটাই বিপদে নাকি পড়েছিল সঞ্জয় গান্ধীর পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি।

উত্তরপ্রদেশের পরিবার পরিকল্পনা-কর্মীরা গ্রামের মানুষদের নিরোধ ব্যবহার নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালালেন এবং ফ্রি নিরোধ বিলি করলেন।

বছর দেড়েক পরে কর্মীরা গ্রামগুলোতে সার্ভে করতে গিয়ে অবাক। জন্মহার একটুও কমেনি। আবার গ্রামে গ্রামে গিয়ে কর্মীরা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নিরোধ ব্যবহার করনি?

গ্রামের লোকরা সমস্বরে জানালেন, হ্যাঁ, যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই আঙুলে নিরোধ পরে করেছি।

এই হল অস্বচ্ছতা রেখে বোঝাবার বিপদ।

আমরা সহজ করে স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনায় যাবো।

যৌন সমস্যাকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) যৌন অক্ষমতা (Sexual dysfunction) এবং (২) বিকৃতকাম (Sexual deviation)।

যৌন অক্ষমতা প্রধানত দু'রকম। ছেলেদের ক্ষেত্রে ধ্বজভঙ্গ (লিঙ্গ শক্ত না হওয়া) বা (impotence) অথবা দ্রুত বীর্য পতন এবং মেয়েদের বেলায় কামশীতলতা (frigidity)।

ধ্বজভঙ্গ দুটি কারণে হতে পারে। (এক) শারীরিক কারণে, (দুই) মানসিক কারণে।

শারীরিক কারণগুলো হতে পারে :

১) ডায়াবিটিস
২) থাইরয়েড সমস্যা
৩) কিডনির সমস্যা
৪) রক্তহীনতা

৫) হার্টের বা লিভারের সমস্যা

৬) হাই ব্লাডপ্রেশারের ওষুধ খাওয়া

৭) টেনশনের ওষুধ খাওয়া

৮) স্টেরয়েড গ্রহণের অভ্যাস

৯) বার্ধক্যের কারণে

এইসব শারীরিক কারণে ও উল্লিখিত ওষুধ গ্রহণের কারণে ধ্বজভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ রোগীর।

আর মানসিক কারণে ধ্বজভঙ্গ হয় শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ রোগীর।

কিছু কিছু স্বামীজি-মার্কা ধর্মগুরুদের লেখাপত্তরে আছে—চল্লিশ দিনে এক ফোঁটা বীর্য তৈরি হয়। হস্তমৈথুন ধ্বজভঙ্গ ঘটায় ইত্যাদি।

এমন ভুল ও মিথ্যে কথায় বিশ্বাস করার কারণে কোনো বিবাহিত যদি বীর্যস্খলনের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, তবে তার ধ্বজভঙ্গ হতে পারে।

স্ত্রীর তুলনায় নিজেকে খুব ছোট, হীন মনে করলে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় লিঙ্গ উত্থিত নাও হতে পারে অথবা দ্রুত পতন হতে পারে।

মিলন স্থায়িত্ব যেখানে ১০-১৫ মিনিট হওয়াটা স্বাভাবিক সেখানে ২-৩ মিনিটে স্খলনকে দ্রুত পতন বলব।

পায়ুমৈথুন প্রিয় পুরুষ স্ত্রীযোনির প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করতে পারার কারণে ধ্বজভঙ্গের শিকার হতে পারে।

পশুদের সঙ্গে সঙ্গম-প্রিয় মানুষ নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করতেই পারে।

বয়স ৫০ বছর পার হলে ধ্বজভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। ৬০-এর পর এই সম্ভাবনা বাড়ে।

নারীর কামশীলতার কারণ

১) পুরুষ সঙ্গীকে কুৎসিৎ-দর্শন মনে করলে

২) মনের মিল এবং রুচির মিল একটুও না থাকলে

৩) মিলনকালে যন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা

৪) গর্ভবতী হওয়ার ভয়

৫) থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা

৬) যোনির প্রদাহ

৭) কিডনি, হার্ট ও লিভারের সমস্যা থাকলে

৮) উচ্চ রক্তচাপ থাকলে

৯) বিষণ্নতার ওষুধ বেশি খেলে

১০) ড্রাগের নেশা থাকলে

১১) পুরুষসঙ্গী যদি সঙ্গমের এক-দু মিনিটের মধ্যেই বীর্যপাত করে ফেলে প্রতিবারই, তবে নারী সঙ্গম সুখ লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হতে কামশীতল হয়ে পড়ে।

১২) নারী সক্রিয় সঙ্গমে ইচ্ছুক কিন্তু পুরুষসঙ্গী একতরফাভাবে নিজের কাজটি করেই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে নারী কামশীতল হতে পারে।

১৩) আদর–শৃঙ্গারের আগেই পুরুষ এক তরফা সঙ্গম করতে থাকলে নারী আবেগহীন, কামশীতল হয়ে পড়ে।

বিকৃতকাম (Sexual Perversion)

প্রাপ্তবয়স্ক নারী–পুরুষ ভালোবেসে অথবা দুজনেই যৌন তাড়নায় মিলিত হলে সেটাকে বলবো স্বাভাবিক কাম।

কিন্তু এর বাইরে বহুরকম বিকৃতকাম রয়েছে, যেগুলোর খবর আমরা কমবেশি জানি অথবা জানি না। বিকৃতকাম বহু ধরনের হতে পারে। তাদের মধ্যে প্রধানতমগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনায় যাব।

১) লুকিয়ে যৌনতা দেখে যৌন উত্তেজনা (Scopophilia) : বাথরুমে বা ঘরে বিপরীত লিঙ্গের স্নান করার সময় অথবা পোশাক পাল্টানোর সময় অথবা সঙ্গমের সময় লুকিয়ে দেখে অনেকেই যৌন উত্তেজনা অনুভব করে এবং স্বমৈথুন করে উত্তেজনা প্রশমিত করে।

সাধারণভাবে মা, বোন, বউদি, ভাই, বাবা–কাকা, মাসি–পিসিদের নগ্নতা দেখে থাকে এই বিকৃতকামীরা। এজন্য তারা বাথরুম বা ঘরের দরজায় গোপনে ফুটোও করে রাখে।

২) যৌনাঙ্গ দেখিয়ে উত্তেজনা (Exhibitionism) : পুরুষ ও নারীদের মধ্যে অনেকেই সুযোগ পেলে বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে স্তন, উরু, লিঙ্গ ইত্যাদি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে।

৩) ধর্ষকাম (Sexual sadism) : এরা ধর্ষকের ভূমিকা নিতে পছন্দ করে। যৌনসঙ্গীর উপর শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে ধর্ষকের ভূমিকা নেয়।

৪) অন্তর্বাসকামী (Fetishism) : নারীদের ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি ইত্যাদিতে লিঙ্গ ঘষে, চেটে, চুমু খেয়ে কিছু পুরুষ উত্তেজনা অনুভব করে এবং পরিসমাপ্তি ঘটে হস্তমৈথুনে।

৫) শিশুকামী (Paedophilia) : অল্পবয়সি শিশু ও কিশোর–কিশোরীদের যৌন নিপীড়নের মধ্য দিয়ে এই বিকৃতকামীরা কাম চরিতার্থ করে। এই যৌন অপরাধীরা সাধারণভাবে কিশোর, যুবক অথবা বৃদ্ধ এবং অপরাধপ্রবণ। মধ্যবয়স্কদের মধ্যে এই প্রবণতা কম।

আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোরী কাকা-মামা-মেসোদের হাতে কিছু কিছু সময় যৌন-শোষণের শিকার হয়। মা-বাবার নজরহীনতাই এর জন্য দায়ী।

বাড়ির শিশুশ্রমিক মেয়ে হলে ওই বাড়ির পুরুষদের দ্বারা যেমন শোষিত হতে পারে; তেমন বালক-কিশোররাও বাড়ির মেয়েদের যৌন শোষণের শিকার হতে পারে।

৬) স্পর্শকামী (Touch-sexual disorder) : ভিড় বাস–ট্রাম–ট্রেন অথবা অন্য কোনো ভিড়ে নারী শরীর স্পর্শ বা নিষ্পেশন করার জন্য সুযোগ–সন্ধানী অনেক পুরুষ

আছে। এরা সব বয়সের পুরুষ হতে পারে। আবার নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা পুরুষের হাতে নিষ্পেশিত হয়ে অথবা লিঙ্গ স্পর্শ করে উত্তেজনা অনুভব করে।

৭) আত্মীয় মৈথুনকামী (Fimily-sexual disorder) : এরা তরুণ-তরুণী। বন্ধুদের সামনে মা বা বোনের শারীরিক বর্ণনা দিতে দিতে হস্তমৈথুন করে যৌন আনন্দ পায়।

অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি কলেজে এবং ইউনিভার্সিটিতে হোস্টেল জীবনে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের উপর সিনিয়র ছাত্ররা নানা ধরনের র‍্যাগিং চালায়। তারই একটি হল মা বা বোনের সঙ্গে নিজের সঙ্গম করার বর্ণনা দিতে দিতে হস্তমৈথুন করা। এই কুৎসিত র‍্যাগিং কোনো কোনো ছাত্রকে এতটাই প্রভাবিত করে যে একসময় সে বিকৃত কামের শিকার হয়ে পড়ে। আবার সমকামীদের কেউ কেউ গ্রুপের পরিবেশের প্রভাবে কৈশোর থেকেই আত্মীয় মৈথুনকামী।

সাধারণত এই বিকৃতকামের শিকার ছেলেরা। তবে কম হলেও মেয়েদের মধ্যে এই যৌনবিকৃতির দেখা মেলে। উৎপত্তিস্থল সেই হোস্টেলের র‍্যাগিং।

(৮) অজাচার (Incest) : ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে বলে অজাচার।

ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, কাকা-ভাইঝি, বউদি-দেওর, পিসি-ভাইপো, মাসি-বোনপো ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে কোনো সমাজই মান্যতা দেয় না। 'ঘৃণ্য' ঘটনা বলে চিহ্নিত করে। তারপরও সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, অজাচার আমাদের সমাজে কোনো বিরল ঘটনা নয়।

কেস ডায়েরি : ১

বদলির চাকুরে বাবা ট্রান্সফার হয়ে মাকে নিয়ে কুচবিহারে গেলেন। নিজের মফঃস্বলের বাড়িতে রেখে গেলেন ক্লাস এইটের মেয়ে ও সদ্য ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সরকারি কাজে যোগ দেওয়া ছেলেকে। মেয়েটি লেখা-পড়ায় ভালো ছিল। কিন্তু দাদার তত্ত্বাবধানে থেকে ফেল করল পরপর দু-বছর।

বাবা-মা এসে দেখলেন, মেয়ের মাথায় গণ্ডগোল। একজন সাইকোলজিস্ট দেখালেন। কাউন্সিলিং, হিপনোটিক সাজেশন দেওয়া—সবই হল কিন্তু মেয়েটি ঠিক হল না। তারপর রাঁচিতে নিয়ে গিয়ে ওখানে মেন্টাল হসপিটালে রেখে এক বছর চিকিৎসা হল। কিন্তু মেয়েটি যেই-কে-সেই।

মেয়েটির দাদা আমার সঙ্গে দেখা করে সাহায্য প্রার্থনা করে। মেয়েটিকে সম্মোহিত করে যখন জিজ্ঞেস করি, তোমার দাদা তোমাকে ভালোবাসে? আদর-টাদর করে?

মেয়েটি জানায়, ও প্রায় প্রতিদিনই বোনকে সঙ্গম করে।

—ভালো লাগে? উত্তেজনা অনুভব কর?

—প্রথম প্রথম ভালো লাগতো। এখন একটুও ভালোলাগে না। দাদা আমাকে ভয় দেখায় ও আমার প্রেমিককে সব বলে দেবে, যদি ওকে না দিই।

—তোমার প্রেমিক কী করে?

—দাদারই বন্ধু। একটা চাকরি করে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে।

আমি মেয়েটিকে শেষ সাজেশনে জানাই, ওর দাদাকে বলে দেবো—তোমাকে আর যেন বিরক্ত না করে।

—ওকে চেনেন না। দাদা তাও করবেই।

—তুমি দাদাকে বলবে, এমন করলে থানায় কমপ্লেন করবে। তাতে দাদার ১০ বছর জেল হবেই। তুমি নিশ্চিন্তে থাক। তোমার দাদার কীর্তি তোমার মা-বাবা বা কেউই জানতে পারবে না।

দাদাকে আলাদা করে বলেছি, তোমার বোন সব বলেছে। সব টেপ করেছি। তুমি যদি ভুলেও আর বোনকে বিরক্ত কর তো তোমার জেল হবেই।

বোন এখন ঠিক। গ্রাজুয়েট হয়েছে। ওর প্রেমিককেই বিয়ে করেছে। সুখী দম্পতি।

কেস ডায়েরি : ২

একটি যুবতী। এমএ পাস। সরকারি চাকুরে। সরকার গাড়ি দিয়েছে। পরিবারে আছেন মেয়েটি ছাড়া মা ও বাবা। মা অসুস্থা। দীর্ঘবছর ধরে প্রায় বিছানায় শুয়েই কাটছে। বাবা সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদে কর্মরত।

তিন ঘরের ফ্ল্যাটে মা, বাবা ও মেয়ে তিন ঘরে থাকেন। মেয়েটি আমাকে ফোনে বেশ কয়েকদিন জানান, ও যখন রাতে ঘুমোয় তখন বাবা এসে মেয়েটির শরীরের নানা জায়গায় হাত বোলায়। গালে ও হাতে লিঙ্গ ঘষে দেন।

আমার একটাই উত্তর বারবার দিয়ে গেছি—ব্যাপারটা আন্তরিকভাবে অসহ্য মনে হলে মেয়েটির উচিত অন্য কোথাও ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে চলে যাওয়া। বাবার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে আমার সমর্থন চাওয়ার চেষ্টায় এইসব গল্প বললে আমি নেই। আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সংকেত পাঠিয়ে থাকলে জানিয়ে দিচ্ছি—"তুমি ভুল করেছ।"

তারপর এখন বাবা-মেয়ে কয়েক বছর ধরে অজাচার সম্পর্ক স্থাপন করে দিব্বি আছে। সম্পর্ক নেই আমার সঙ্গে। না আর ফোন পাইনি।

কেস ডায়েরি : ৩

প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুনেছিলাম একবছর পঁয়তাল্লিশ বছরের এক মহিলার কাছে। দেখলে পঁয়ত্রিশ মনে হতে পারে। তিনজনের সংসার। মহিলা, বর ও বাইশের জোয়ান ছেলে। কাজে বাবাকে মাঝে-মাঝে বাইরে যেতে হয়। সেই সময় ঘুম ভেঙে গেল একদিন। কে যেন সারা শরীরে হাত বোলাচ্ছে। আবছা আলোয় বুঝতে পারেন হাতের মালিক ছেলে। মা সিঁটিয়ে থাকেন।

তারপর একদিন চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে ওর ওটা চেপে ধরতেই পরিসমাপ্তি ঘটে দুরন্ত মিলনে। এই মিলন প্রায়ই চলছে।

মহিলা আমাকে বললেন, উনি এই সম্পর্ক আর টানতে চাইছেন না। আমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে চান।

বললাম, সম্পর্কে ছেদ টানতে চাইলে ছেলেকে সে কথা বুঝিয়ে বলুন। যা হয়ে গেছে গেছে আর নয়। জোর করে মিলনে বাধ্য করলে থানায় কমপ্লেন করবেন। ধর্ষণের অভিযোগ আনবেন, ছেলেকে জানান। দেখবেন ছেলে জেলের গন্ধ পেলে গুটিয়ে যাবে।

তারপরও মাঝে-মধ্যে মহিলাটি আমাকে বিরক্ত করায় বললাম, আপনি সত্যি বলুন তো-ছেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি চান? নাকি ছেলের প্রক্সি চান? নাকি সেক্স পার্টনার বাড়াতে চান?

আর ফোন পাইনি। ফোন থেকে বাঁচতে এই আঘাত দেওয়াটা জরুরি ছিল।

৯) সমকামিতা (Homosexuality) : অবশ্যই এটি একটি কাম-বিকৃতি। নারী-পুরুষের মিলন হল স্বাভাবিক কাম। নারীতে-নারীতে, পুরুষে-পুরুষে যে যৌনাচার—তাকে বলে অস্বাভাবিক-কাম বা বিকৃত-কাম।

কেউ কেউ মনে করেন 'সমকামিতা' সহজাত প্রবৃত্তি। এদের মধ্যে 'বুদ্ধিজীবী', বিজ্ঞান পেশার মানুষও আছেন। এ বিষয়ে একটু ওয়েবসাইট ঘাটলে এমন বিজ্ঞানবিরোধী কথা তাঁরা নিশ্চয়ই বলতেন না। **বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় দোষ হল—অহংভাব যতটা বেশি, জানার আগ্রহ ততটাই কম।**

সমকামিতা আসে সাধারণভাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে। এইসব হোস্টেলে সাধারণভাবে মদ্যপান, নেশা, ব্লুফিল্ম দেখা ও ফ্রিসেক্স যথেষ্ট বেশি।

হোস্টেলে নারী-পুরুষের মিলন সম্ভব হয় না বলে ছেলেতে-ছেলেতে, মেয়েতে-মেয়েতে সমকামে লিপ্ত হয়।

জেলখানায়, পুলিশ ব্যারাকে, সেনা ব্যারাকে সমকামের প্রয়োগ যথেষ্টই বেশি।

আবার স্কুলজীবন থেকেই সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে সমকামী গ্রুপ তৈরি করা নামি স্কুলের কিছু কিছু কিশোরী ও কিশোরদের দেখেছি। এরা পর্নোবই, পর্নো-নেট দেখে উত্তেজনার উন্মাদনায় ভেসেছে। বিপরীত লিঙ্গের যৌনসঙ্গীর অভাব মিনিয়েছে বন্ধুরাই।

সাধারণভাবে এইসব সমকামীরা সমাজজীবনের মূলস্রোতে ফিরে এলেই অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে ফিরে এলেই বিপরীত লিঙ্গকামী হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সামান্যই সমকামী থেকে যায়।

যারা সমকামী থেকে যায় তাদের সম্পর্ক হয় খুবই ক্ষণস্থায়ী বা বহুগামী।

অনেক সময় শারীরিক আকর্ষণহীন নারী-পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী না পেয়ে সমকামী হয়।

যাঁরা সমকামীতা স্বাভাবিক-কাম মনে করেন, তাঁরা পশুকামীতা থেকে অজাচার—সবকিছুকেই স্বাভাবিক-কাম মনে করবেন আশা করি।

১০) লিঙ্গ পরিবর্তনকামীতা (Trans-sexualism) : যৌন-বিকৃতির মধ্যেই পড়ে। শারীরিকভাবে পুরুষ কিন্তু মানসিকভাবে নারী—এমন মানুষদের বলে লিঙ্গ পরিবর্তনকামী। আবার শারীরিকভাবে নারী, কিন্তু মানসিকভাবে পুরুষের দেখা মেলে।

শিশুপালন পদ্ধতির দোষে এমন হতে পারে। ছোট্ট ছেলেটিকে বাড়ির মহিলারা শাড়ি পরিয়ে, টিপ পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে যে মজার খেলা শুরু করলেন, সেই চলমান খেলাই একটু একটু করে ছোট ছেলেটিকে মননে মেয়ে করে তুললো। এমনটাই ঘটনার ফলে একজন মেয়েও একটু করে মননে পুরুষ হয়ে ওঠে।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ পরিবর্তনের স্পৃহা এতটাই বেড়ে যায় যে কেউ কেউ ডাক্তারের সাহায্য নেয়।

১১) পশুকামীতা (Zoophilia) : পশুকামীতার প্রচলন বহু প্রাচীন আমল থেকেই চলে আসছে। পশুকামীতার ব্লু-ফিল্মের চাহিদা কম নয়। গৃহপালিত পশুদেরই সঙ্গমের কাজে ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী-পশুদের পুরুষরা ও পুরুষ-পশুদের মেয়েরা সঙ্গমের কাজে ব্যবহার করে। কুকুর, বাঁদর, বিড়াল ইত্যাদি পশুদের ব্যবহারই প্রধানত হয়, কারণ এইসব পশুরা সঙ্গমপটু এবং ঘরে পোষ মানে।

১২) ধর্ষণ (Rape) : বলপ্রয়োগের সাহায্যে মৈথুন করাকে বলে ধর্ষণ। ধর্ষণ। 'ধর্ষণ' সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা নেশা করিয়ে বা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অথবা বলপ্রয়োগ করে একজনের অনুমতি ছাড়া তাকে মৈথুন করাই ধর্ষণ। সাধারণত মেয়েরাই পুরুষদের দ্বারা ধর্ষিত হয়।

একজন নারীকে যখন একাধিক পুরুষ ধর্ষণ করে তখা তাকে বলে গণধর্ষণ। এই ধর্ষকরা সাধারণত অল্পবয়স্ক থেকেই নেশারু, অপরাধপ্রবণ ও বেপরোয়া চরিত্রের হয়।

এটা কোনো মানসিক রোগ নয়। এরা অশিক্ষিত, অমার্জিত এবং প্রভূত ধরনের অধিকারী হতেই পারে। সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পর তাকে সুস্থ সমাজে ফিরিয়ে আনার কোনো মনোচিকিৎসা নেই।

১৩) লাম্পট্য (Hyper-sexual disorder) : বাচবিচারহীনভাবে যৌন সম্পর্ক গড়ার তীব্র লালসা যাদের আছে, তাদের বলে লম্পট। এদের কাছে 'দেহসূচিতা' একটা কুসংস্কার। সেক্স হল এনজয় করার ব্যাপার।

সাধারণভাবে মেধাহীন, কর্মহীন সুন্দরী পুরুষদের মাথা চিবানোর নেশায় বুঁদ থাকে। সন্তান থেকে পিতার বয়সিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে নেয় দ্রুত। প্রথম আলাপেই বিছানায় শুতে পারে।

বার্ধক্যেও এরা ফোনের মাধ্যমে চুটিয়ে 'সেক্স' এনজয় করে অচেনাদের সঙ্গেও।

সংস্কৃতিহীন ধনী অথবা সুদর্শন পুরুষরাও মেয়ে পটানোতে চ্যাম্পিয়ান হয়। এরা বাকপটু, টার্গেট করা মেয়েটির প্রশংসায় বানভাসি করিয়ে দেয়।

আবার পত্রিকা বা টিভির কর্মকর্তা গোছের কেউ হলে, মডেলগার্ল বা মডেলবয় হলে, সিনেমা বা টিভি সিরিয়ালের অভিনেত্রী-অভিনেতা হলে লম্পট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বাড়ে খেলার জগৎ থেকে সঙ্গীত জগতের নক্ষত্র বা আধা-নক্ষত্র হলেও।

যৌন সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে এরা হয় বিচারহীন।

ধর্ষক আর লম্পট ছাড়া প্রথম ১০টি বিকৃত-কামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাইকোথেরাপির সাহায্যে বিকৃতকামীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সমস্যার শুরুতেই সাইকোথেরাপির সাহায্য নিলে সুস্থ করে তোলার সম্ভাবনা প্রবল।

অধ্যায় : ছয়

'যোগ' মস্তিষ্ক-চর্চা বিরোধী এক স্থবির তত্ত্ব

বিভিন্ন কালের বিভিন্ন যোগীদের যোগ তত্ত্ব বিভিন্ন রকমের। পার্থক্যটা অবশ্য শুধু কালের নয়। প্রাচীনকালেও 'যোগ' নিয়ে নানা যোগী ঋষির নানা মত ছিল। একালের যোগীরাও এক একজন এক এক রকমের যোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যোগ সাধনার পদ্ধতিতে তাই বিশাল গরমিল—এসবই আমরা আগের আলোচনা দেখেছি।

প্রাচীনকাল থেকে এখনকার কাল পর্যন্ত যোগীরা যোগকেই পরমব্রহ্ম পাওয়ার একমাত্র পথ বলেছেন। এইসব যোগীরা 'হিন্দু' হিসেবেই পরিচিত। আবার হিন্দুদের মধ্যেই বহু ধর্মীয় গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী রয়েছেন যাঁরা নানারকম আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে, পূজাপাঠের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর উপাসনা করেন। এবং সেই পরমব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে অনেকেই দেখেন বলে দাবি করেন। অনেকের উপর ঈশ্বরের ভর হয়। *ঈশ্বর বা ভূত কেউ কেউ নাকি দেখে। দু'য়ের ভরও হয়। আবার ঈশ্বর দেখতে যেসব ঈশ্বর-ভক্ত সত্যিই আগ্রহী, তাদের ঈশ্বর দেখাতে পারেন অনেক মনোবিদ সম্মোহন বিশেষজ্ঞরা। কীভাবে? জানতে পড়তে পারেন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' '১ম এবং ২য় খণ্ড। 'ঈশ্বর' একটা বিশ্বাস অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তাই ঈশ্বর দেখাটা সব সময়ই মানসিক একটা বিকার। কিছু মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ চিকিৎসক, সম্মোহন বিশেষজ্ঞরা কিছু কিছু আবেগ-প্রবণ ব্যক্তির উপর সেই বিকার এনে ঈশ্বর থেকে ভূত সবই দেখাতে পারেন শুধু নয়, আবার ঈশ্বরে ভরগ্রস্তদের, ঈশ্বর দেখতে থাকা মানুষদের ঠিক করেও দিতে পারেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।')*

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষরা নামগানেই ভরগ্রস্ত (মনোবিজ্ঞানের মতে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত) হয়ে পড়েন। সুফি সম্প্রদায়ের ভক্তরাও মাথা দুলিয়ে গান গাইতে গাইতে ভরগ্রস্ত হন। এই অবস্থায় আরাধ্য দেবতাকে দেখতে পান, আল্লাকে অনুভবে পান, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এমন ভক্তও আছেন, যাঁরা অলীক অনুভব করেন যে, দেবতা তাঁর সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হচ্ছেন। তন্ত্রে এমন মন্ত্র আছে, যা উচ্চারণে নাকি যে দেবীকে চাওয়া যায়, সেই দেবীকেই ভার্যা হিসেবে পাওয়া যায়। *(এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ৫ম খণ্ড)।*

তা'হলে এ কথা আমরা বলতে পারি—ঈশ্বর দর্শনের জন্য যোগই একমাত্র পথ বলে যা বলা হয়েছে, তা ভুল। নানা উপাসনা ধর্ম পদ্ধতিতে গভীর আস্থাশীল আবেগপ্রবণ মানুষ পুজো করতে করতে 'ঈশ্বর' দেখেন—যেমন দেখেছিলেন রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদরা। আবার মনোবিজ্ঞানী এবং সম্মোহনকারীও ঈশ্বর দেখাতে পারেন। এই ঈশ্বর দর্শনগুলোর মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। কিন্তু ঈশ্বরে কোনো পার্থক্য নেই। সবই অলীক দর্শন। যার অস্তিত্ব নেই, তাকে দেখা।

ধরে নিলাম, কোনো এক স্বামীজী বা মাতাজি পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে যোগী করে তুললেন, আশ্রমবাসী করে তুললেন। ভাবুন তো, ফলে ফসল উৎপাদন বন্ধ, পোশাক উৎপাদন বন্ধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের উৎপাদন বন্ধ, বন্ধ বিলাস দ্রব্য, বন্ধ সিনেমা-থিয়েটার-গান-নাচ-যাত্রা-পেইনটিং ভাস্কর্য, বন্ধ টেলিভিশন, সাহিত্যচর্চা, বাস-গাড়ি-লরি-ট্রেন, লোকসভা থেকে বিধানসভা, পুলিশ থেকে কোর্ট, সেলট্যাক্স থেকে ইনকামট্যাক্স দপ্তর, দোকান-পাট-বাজার-হাট সব বন্ধ। ভাবুন তো, গভীরভাবে ভাবুন, সবাই যোগী। না খেয়ে ন্যাংটো হয়ে শুধুই উপাসনা করে যাচ্ছেন। কেমন লাগল চিত্রটা! আমরা সভ্যতা থেকে আবার অসভ্যতায় ফিরে যাবো? আপনার উত্তর যদি 'না' হয়, সেটাকেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলুন। প্রচারের দৌলতে যোগ-ব্যবসায়ীদের সুরে সুর না মিলিয়ে নিজের বিচার শক্তিকে প্রয়োগ করে বলুন।

যোগ আমাদের স্বাভাবিক মস্তিষ্কচর্চার বিরোধী চিন্তাচর্চার বিরোধী, প্রশ্ন, তোলার বিরোধী কোনো সৃষ্টিশীল কাজেই এইসব যোগ-চিন্তায় বিভোররা অচল। বিজ্ঞানে-শিল্পে-সাহিত্যে এমনকি প্রত্যেকটি সৃষ্টিশীল কাজে যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে উজাড় করে দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ-ই 'আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন'কে জীবনের লক্ষ্য করে নেননি। আর, নেননি বলেই নিজেরা এগিয়ে ছিলেন, সমাজকে এগিয়ে দিয়েছেন।

আজো সমাজের অগ্রগতি এইসব চিন্তাশীল মানুষদের উপর নির্ভরশীল। এঁরা সমাজবিজ্ঞানী, পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, ভূতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি যাই হোক না কেন কেউ-ই 'যোগী' নন।

এঁরা অনেকেই মন ও শরীরকে 'রিলাকস্' করার জন্য, মস্তিষ্ক কোষকে বিশ্রাম দিয়ে আবার সতেজ করার জন্য স্ব-সম্মোহন বা 'মেডিটেশন' করেন। কিন্তু সেই স্বসম্মোহন বা 'মেডিটেশন' যোগীদের 'মেডিটেশন' থেকে পৃথক কিছু। এখানে মনোবিজ্ঞান আছে, ঈশ্বর নেই।

মস্তিষ্ক চর্চার কারণে অতি সক্রিয় মস্তিষ্ক কোষকে বিশ্রাম দিতে এবং সঙ্গে শরীরের কোষগুলোকে সাময়িক বিশ্রাম দিতে স্বসম্মোহন বা মেডিটেশন করা হয়। বিশ্রামের পর সতেজ মস্তিষ্ক কোষ আবার মস্তিষ্কচর্চার জন্য সতেজ হয়ে ওঠে। **যোগীদের মেডিটেশনে চিন্তার চর্চাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে মস্তিষ্ককোষগুলো নানারকম অস্বাভাবিক আচরণ করে।** ফলে তাঁরা অনেকেই ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বরের বাণী শোনেন, ঈশ্বরের সঙ্গে

কথা বলেন ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানী ও মনোরোগ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে (observation) ওঁরা মানসিক রোগী। ঠিকমতো মানসিক চিকিৎসা হলে এই ধরনের মানসিক রোগ সেরে যওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মনোবিজ্ঞান এবং মনোরোগ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এইসব ঈশ্বর দেখার মতো ভ্রান্ত অনুভূতিকে বলা হয় 'ইলিউশন' (illusion), 'হ্যালিউসিনেশন' (hallucination), 'ডেলিউশন' (delusion) এবং প্যারানয়া (paranoia)।

ইলিউশন হচ্ছে—প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা। দেখছি কালীঠাকুরের মূর্তি, কৃষ্ণের ছবি বা কোনো মাতাজির ছবি। একমনে দিনের পর দিন দেখছি। এবং আমার আবেগ ভাবছে, মূর্তি বা ছবি নড়ে-চড়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে। একসময় আমি যেমনটা গভীরভাবে ভাবছি, তেমনটাই দেখলাম। মাতাজি বা মাকালী নড়ে-চড়ে উঠলেন অথবা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এই ভ্রান্ত অনুভূতিকেই বলে ইলিউশন। আসলে মাতাজির ছবি বা কালীমূর্তিকে হয়তো নাড়িয়েছে টিকটিকি বা ইঁদুর। নাড়লে ছবি নড়েছে। ছবির ঠোঁট নড়েছে। ঠোঁট নড়াই হাসি বলে অনুভব করেছি।

'হ্যালিউসিনেশন' কথার মানে অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে অলীক ইন্দ্রিয়ানুভূতি। ধরা গেল রামবাবু মাতাজি নির্মলাদেবীর সহজযোগে গভীর বিশ্বাসী। তিনি মাতাজির ছবির সামনে যোগে বসলেন এবং মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এটা অনুভব করলেন। এটা অবশ্যই হ্যালিউসিনেশন। মাতাজির ছবির সামনে সহজযোগে বসলে এমনটা হয়, এই গভীর বিশ্বাস থেকেই এই অলীক ইন্দ্রিয়ানুভূতি এসেছে।

'ডেলিউশন' রোগীর মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা থাকে। যেমন, একজন 'ডেলিউশন' রোগী ভাবলো তার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হয়ে গেছে। কৃষ্ণ তাঁর স্বামী। মীরাবাঈ থেকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নারী থেকে পুরুষ অনেকেই ভেবেছিলেন কৃষ্ণ তাঁদের স্বামী। এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে তাঁদের আচরণে নানা মানসিক অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল।

'প্যারানয়া' রোগের অর্থ—বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি। কিন্তু তারা বিশ্বাসের পিছনে সুন্দর যুক্তি সাজাতে খুব ভালোই পারেন।

ধরুন শ্যামবাবুর কথা। তিনি যোগ নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। অনেক যোগীদের কাছে গিয়েছেন যোগ শিখতে। এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান যোগ সাধনা। তিনি একটা যোগ-কক্ষ তৈরি করেছেন। যোগে বসলে একসময় বুঝতে পারেন অর্থাৎ অনুভব করতে পারেন, তাঁর বীর্য ছটি চক্র অতিক্রম করে মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মের কুঁড়িতে উঠেছে। ফণা মেলে থাকা সাপ ফণা গুটালো। হাজার পাপড়ি মেলে ফুটে উঠলো পদ্মা-কুঁড়ি। প্রতিটি পাপড়ির ভিন্ন ভিন্ন রঙ। পদ্মের উপর আছেন শিব-শক্তি। ঈশ্বর দর্শনের অপার আনন্দে চেতনা রহিত হয়ে গেছে। গোটা চেতনা জুড়েই শুধু আনন্দ।

শ্যামবাবু প্যারানইয়া রোগী। ধর্ম ব্যবসায়ী নন, প্রতারক নন। এই রোগী যখন ভক্তদের মাঝে যোগের নানা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা বলবেন, তখন

তাঁর অনেক শিষ্য জুটে যাবেই। কারণ এখনো আমাদের সমাজের প্রথাগত শিক্ষা পাওয়া মানুষদের জ্ঞান (wisdom)-এর লেভেল অত্যন্ত কম। মস্তিষ্ক–চর্চার অভাবেই কম।

শ্যামবাবুর মতো কিছু কিছু প্যারানইয়া রোগী সাধারণের চোখে 'অবতার' বা 'মহাপুরুষ' বলে পূজিত হচ্ছে।

(হেলিউশন, হ্যালিউসিনেশন, ডেলিউশন এবং প্যারানয়া বিষয়ে বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ১ম খণ্ড)।

আমাদের আলোচনাকে এবার গুটিয়ে নিলে দেখতে পাচ্ছি,

যোগ সাধনা শুধুমাত্র স্থবির এক তত্ত্ব নয়, মস্তিষ্ক-চিন্তা বিরোধী তত্ত্ব নয়, মানসিক রোগী তৈরি করার এক শক্তিশালী তত্ত্ব-ও।

তা হলে 'যোগ' এর এত জনপ্রিয়তার কারণ কী?

পিয়ের ম্যুর ইংলন্ড থেকে এসেছেন। বছর খানেক হল ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। কেরলে 'আম্মা', কর্ণাটকে জ্যান্ত মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারানো, সাঁইবাবার হাতসাফাই—এসবই জানেন বা প্রত্যক্ষ করেছেন। বই লিখেছেন, বিষয় 'মিরাক্‌ল্‌' বা অলৌকিক ঘটনা। বললেন, ওদেশে ব্রিটিশ সাহেবদের মধ্যে কেউ কেউ—সাঁইবাবার ভক্ত। ওঁর পরিচিত এক সাহেব, সাঁই এর পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। সাঁইবাবা নাকি মনে মনে অলৌকিক উপায়ে ওঁকে গাইড করেন। পিয়ের বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ভারতে গিয়ে, সাঁইবাবাকে দেখার পর থেকে সাহেবটি পাগলই হয়ে গেছে।" আরো বলল— 'আমি জানতে চাইছিলাম, ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল রহস্যটা কী? কিসের জন্য পাশ্চাত্যের সচ্ছল পরিবারের মানুষজনও ভারতে এসে এত আনন্দ পায়?"

পিয়ের ম্যুরের মতে তিনি যত ঘুরছেন, যত দেখছেন—ততই বুঝছেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিকতা মনগড়া একটা ব্যাপার। এখনো পর্যন্ত কোনো মিরাক্‌ল্‌–এর দেখা পাননি। এই অল্পবয়সি যুবকটি ইন্টারনেট থেকে আমার নাম ও ফোন নম্বর জোগাড় করে সামনাসামনি সাক্ষাৎকার নিলেন। বললেন, যোগ পাশ্চাত্যে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। টেনশন থেকে মুক্তি পেতে পাশ্চাত্যের মানুষ যোগ শিখতে চাইছে। যোগ কতটা কার্যকর কে জানে? এসব জানতেই আপনার কাছে আসা।

গত পনেরো বছরে টেলিভিশন ইন্টারনেট বিপ্লব সারা পৃথিবীর মানুষকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে। যেমন এদেশের মানুষ বিশেষত তরুণ প্রজন্ম তাদের পড়াশোনা, জ্ঞানচর্চা, ফ্যাশন, জীবনযাপন–পদ্ধতি, প্রেম–বিবাহ বিষয়ক ধারণা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সব ব্যাপারেই পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন (এটাকে খারাপ, ভালো যাই বলুন)। **তেমনি পশ্চিমে অনেক অল্পশিক্ষিত, গ্রামের মানুষ আছেন যাঁদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি একটা নতুন, অজানা কিছু। তাঁরা অল্প খরচে ভারতে বেড়াতে আসতে পারেন। এখানকার স্থাপত্য, তাজমহল, আটশ বছরের পুরনো কোনারকের মন্দির তাঁদের কাছে পরম বিস্ময়কর। তাঁরা সাঁইবাবার কোটির উপর ভক্তসংখ্যা দেখে হতচকিত। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, ভারতের সাধুরা ভয়ঙ্কর রকম ক্ষমতাশীল (রাজনীতিকদের**

কল্যাণে প্রভাবশালীও বটে) অসাধারণ অলৌকিক শক্তিধর। আবার আমাদের এখানকার আমজনতা তাদের সাহেবপ্রীতির কারণে, সাদা চামড়ার ভক্ত দেখে ততোধিক উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই ভাবেই চলতে থাকে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন এবং তার সঙ্গে হুজুগ, বিভ্রান্তি, ঠকানো, বোকা বানানো এবং সচেতন শোষণ প্রক্রিয়া।

এই উপরোক্ত কারণেই গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি হিন্দু তন্ত্র, মন্ত্র, যোগের জনপ্রিয়তা। প্রোমোট করছেন ব্যবসায়ীরা, কাজে লাগাচ্ছেন এবং টিকিয়ে রাখছেন রাজনীতিকরা। মিডিয়ার প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে একবার একটু জনপ্রিয়তার আভাস এলেই হুড়মুড় করে প্রচার তুঙ্গে। প্রথমে তাই শুরু হয় খুব সাধারণ, মোলায়েম, হাসিখুশি চেহারার মানুষদের নিয়ে। এদের চেহারা সাধাসিধে, আচরণ হাসিখুশি, কথাবার্তা জনমুখী। লক্ষ্য করুন আম্মা, মা নির্মলা, রামদেবদের চেহারা। অত্যন্ত সাধারণ। টিভি মিডিয়া গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ায় এই পরিবর্তন। আর আগে হোমড়া-চোমড়া গুরু হতেন। রজনীশ বা মোহনানন্দের মতো হাই-ফাই গুরু এই গরিব দেশে সাধারণের মধ্যে ততটা ছাপ ফেলেননি। এইসব গুরুরা সত্যজিৎ রায়ের মহাপুরুষ ছবির বিরিঞ্চিবাবার মতো ভক্তদের মনস্তত্ত্ব বুঝে ধীরে ধীরে লাটাইয়ের সুতো ছাড়তে থাকেন। তাই এদের কথায় কিছু কিছু ভালো কথা, সত্যি তথ্যও থাকে।

আমার আগের অধ্যায়গুলো লক্ষ্য করুন। রজনীশের প্রবচনগুলোর মধ্যে প্রথম আটটি-পয়েন্ট একেবারে সত্যি এবং সেযুগে বৈপ্লবিক সত্যভাষণ। পরের পাতায়ও প্রেম-কাম-মানসিক রোগ সম্পর্কিত বক্তব্য বেশ বিজ্ঞানসম্মত। মা নির্মলার সহজযোগও বেশ সহজ। ওঁর রিল্যাকসেশানের পদ্ধতিও বেশ আরামদায়ক। কোনো কর্মব্যস্ত মানুষ বা সারা দিন সংসারের ঝক্কি সামলানো গৃহিণী যদি অন্তত আধঘণ্টা নিজের আরামের জন্য রাখেন (সে গরমজলে পা ডুবিয়েই হোক), তা হলে শরীর মন ঝরঝরে তো লাগবেই। আবার রামদেবের—বয়স হলে হালকা খাওয়া ও ঘুমের সময় ঠিক রাখা, মহাজাতকের শিথিলায়তন প্রক্রিয়া—এ সবের মধ্যেই তো কিছু সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা লুকিয়ে আছে। তাই এরা প্রাথমিকভাবে বেশকিছু মানুষকে প্রভাবিত করে। তারপর শুরু হয় টিভি'র কল্যাণে টাকার খেলা। শুরু হয় বিজ্ঞাপনে-বিজ্ঞাপনে মানুষকে বোকা বানানোর খেলা। যে কোনো অসুখ সারানোর প্রতিশ্রুতি। সদস্য চাঁদা ছয় অঙ্ক ছাড়ায়। আশ্রম তৈরি হয় একরের পর একর জমি নিয়ে। অতবড় মানুষ। বাব্বা। রাজনীতিকদের পোয়াবারো। সাঁইবাবা ভক্তি পড়তির দিকে, এবার রামদেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আমজনতাকে গাধা-গরু বানিয়ে নিজেদের সুবিধে করে নেওয়া।

সবকিছুর মূলে রয়েছে টেকনোলজির উন্নতি এবং মানুষের মনে সুপ্ত বা ব্যক্ত অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ। এযুগে পাশ্চাত্যেও এখনো মিরাকলে বিশ্বাস করা মানুষ কম নেই। (মনে করুন মাদার টেরেসার ঘটনা)। বুদ্ধিমান, শিক্ষিতরাও অলৌকিককে বিশ্বাস করেন এবং 'ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন' নামক সৃষ্টি রহস্যের কচ্ছপ-মার্কা থিয়োরি নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যে স্বয়ং জর্জ বুশও আছেন।

তাই বিজ্ঞাপনে না ভুলে, সঠিক বিজ্ঞানকে জেনে, ঠিক ভুল বেছে নেওয়ার ক্ষমতাকে বাড়াতে হবে। আমাদের ম্যাজিক-প্রীতি ও ভক্তিগদগদ হওয়ার অভ্যাস ছাড়তে হবে। এসবের মূল ভিত্তি যে ধর্মবিশ্বাস (প্রতিষ্ঠানিক উপাসনা ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস) তাকেই আঘাত করতে হবে।

পর্ব : চার

বিভিন্ন রোগের সম্মোহনের সাজেশন পদ্ধতি

অধ্যায় : এক

সম্মোহন চিকিৎসা এবং...

সম্মোহন করে কোন কোন রোগীকে কীভাবে সাজেশন দিতে হয়, এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনায় যাব। তার আগে জেনে নেওয়া ভালো, **যাদের সম্মোহিত করা যায় না :**

১) যার মস্তিষ্ককোষে ধারণা সঞ্চার করতে চাই, তার ভাষাটা জানা একান্তই জরুরি। ধরুন আমি আরবি জানি না। সেক্ষেত্রে শুধু আরবি জানে এমন কাউকে সম্মোহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

২) জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সম্মোহন করা সম্ভব নয়।

৩) বধিরকে সম্মোহিত করা সম্ভব নয়।

৪) মানুষ ছাড়া প্রাণিজগতের কারুকে সম্মোহন করা সম্ভব নয়।

৫) বস্তুকে সম্মোহন করা সম্ভব নয়।

যারা সম্মোহিত হতে নারাজ তাদের সম্মোহিত করতে হলে...

১) এমন কিছু রোগী আছেন, যারা মনোবিদ বা হিপনোথেরাপিস্টের সাজেশন মন দিয়ে শোনেন না। কান দিয়ে সাজেশন ঢুকছে, আর তখন মন দিয়ে ভাবছেন—আমি কি সত্যিই সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছি?

এক মনে সাজেশন না শুনলে সম্মোহিত হবেন না।

২) কেউ কেউ 'সম্মোহন' বিষয়টির কার্যকারিতা নিয়ে অতিমাত্রায় অবিশ্বাসী। সেই কারণে 'সাজেশন' মন দিয়ে শোনায় তাদের কোনো আগ্রহ-ই থাকে না।

৩) তিনি হয়তো কোনো কারণে চিকিৎসকটির সম্মোহন করার ক্ষমতা থাকার বিষয়ে সন্দিগ্ধ।

৪) রোগীর মানসিক অবস্থা হয়তো এতই বিক্ষিপ্ত যে মনঃসংযোগ করতে চাইলেও করতে পারছেন না।

৫) যিনি সম্মোহন করবেন, তাঁর ক্ষমতার উপর রোগীর একটা চ্যালেঞ্জের মানসিকতা রয়েছে।

এই সব অবস্থায় সাধারণ উপায়ে সম্মোহন করা অনেক সময় সম্ভব না-ও হতে পারে। কারণ 'সম্মোহন' বিষয়ে রোগীর মনে বিশ্বাস বা প্রত্যাশা তৈরি করতে না পারলে, তাঁর সহযোগিতা পাওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করতে না পারলে সম্মোহিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। তাই সম্মোহন করার আগে 'সম্মোহনপূর্ব ধারণা সঞ্চার' বা 'প্রি-হিপনটিক সাজেশন'-এর প্রতি সম্মোহনকারীদের গুরুত্ব আরোপ করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি বলে আর বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকলাম না।

১ নম্বর থেকে ৪ নম্বর রোগীদের ক্ষেত্রে সম্মোহন করার আগে উত্তেজনা নাশক বা ঘুম আনা ওষুধ খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আপনি কোনো মানসিক রোগের চিকিৎসক না হলে এইসব ওষুধ রোগীদের উপর প্রয়োগ করতে যাবেন না।

৫ নম্বর রোগীদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাঁরা কিনা সম্মোহনকারীর সম্মোহন ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য চমক সৃষ্টি সবচেয়ে ভালো উপায়।

আমাকে অনেক সময় এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এমনি চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে আমি আমার সমস্যা সমাধান করেছি প্রতিটি ক্ষেত্রেই চমক সৃষ্টি করে। চ্যালেঞ্জকারীর সঙ্গে কোনো তর্কে যাইনি। কারণ তর্ক স্পষ্টতই চ্যালেঞ্জকারীর মানসিকতাকে আরো বেশি করে আমার প্রতি বিরূপ করে তুলবে। তাঁর সঙ্গে সহজভাবে আলোচনা চালিয়েছি মানুষের মন ও বিচিত্র ক্ষমতা সম্পর্কে আমার জানা সামান্য জ্ঞান নিয়ে। জানিয়েছি, "আমার জানাকে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করি না। আমি কোনো কিছুকে প্রমাণ করতে চাই না। চাই সত্যে পৌঁছতে। এ বিষয়ে আপনি-ই হয়তো আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পরবেন।"

"এই ধরুন আপনি যা দেখছেন, তার অনেক কিছুর ব্যাখ্যা আপনার জানা নেই, অনেক কিছুর ব্যাখ্যা আমার-ও জানা নেই। এই যে আপনার কোটের বাঁ পকেটে একটা দু-টাকার নোট আর খুচরো দুটি ৫০ পয়সা পড়ে আছে, তা আমি যে মানসিক শক্তিতে জানতে পারছি, সেই শক্তির হদিশ ও তার প্রয়োগ আপনার জানা নেই। আমার জানা নেই আপনার অনেক ক্ষমতার গোপন রহস্য।"

চ্যালেঞ্জ জানানো মানুষটি এবার তাঁর কোটের বাঁ পকেটে হাত দেবেন-ই এবং পাবেন দু-টাকা ও দুটি ৫০ পয়সা, যা চমক সৃষ্টির জন্যে আমিই ঢুকিয়ে দিয়েছি অথবা কাউকে দিয়ে ঢোকানোর কাজটা সেরেছি। বিভিন্ন সময় অপ্রচলিত ম্যাজিক প্রয়োগ করে আমি চমক সৃষ্টি করেছি। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জারকে শেষ পর্যন্ত ভাবতে বাধ্য করেছি—এটা দেখালাম সম্মোহন করে।

ফলে সত্যি সম্মোহনের সময় চ্যালেঞ্জার তার মানসিকতা পাল্টে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

সম্মোহন যখন সেমিনারে

যখন কোনো সভায় বা সেমিনারে সম্মোহন করি, তখন সম্মোহন নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা সেরে নিই। এই আলোচনা সাধারণত চলে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত।

বিপুল শ্রোতা ও দর্শকদের সামনে কয়েকজনকে সম্মোহন করে দেখাবার আগে এই সময়টা ব্যয় করা প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়। কারণ আলোচনা শেষে দর্শকদের কাছে আমি আবেদন রাখি, যারা বাস্তবিকই সততার সঙ্গে আমার কথা বা 'সাজেশন' গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনবেন, তারা মঞ্চে উঠে আসুন।

উঠে আসাদের মধ্যে থেকেই প্রথম আসা দু-তিনজনকে প্রথম দফায় বেছে নিই। সভার সময় দর্শকদের মুড ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে কত রকমের সম্মোহন দর্শকদের সামনে হাজির করব, তা ঠিক করি। তারপর প্রয়োজনমতো দফায় দফায় কয়েকজন করে দর্শককে মঞ্চে ডেকে নিই।

ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্যে যখন কাউকে সম্মোহন করার প্রয়োজন হয় তখন তাঁর সঙ্গে সম্মোহন বিষয়ে কিছু আলোচনা সেরে নিই। উদ্দেশ্য :

ক) সম্মোহন সম্পর্কে অলীক ভয় দূর করা।

খ) সম্মোহনের কার্যকারিতা ও উপকারিতা।

গ) সম্মোহনের ক্ষেত্রে রোগীর চূড়ান্ত মনোযোগ ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা।

প্রয়োজনে দু-একটি সম্মোহনের ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। আর এই প্রয়োজনটা সাধারণভাবে হয় সেমিনার বা সভায়।

এটা গেল যাকে সম্মোহিত করব, তাকে মানসিকভাবে তৈরি করার প্রথম ধাপ। এবার আসছি দ্বিতীয় ধাপে।

সম্মোহিতের হাত অসাড় করতে...

পাশাপাশি গোটা তিনেক চেয়ার স্টেজে পাতা থাকে আগে থেকেই, তাতেই বসিয়ে দিই উঠে আসা দর্শকদের। বলি, "চোখ বুজে একমনে শুধু আমার কথা শুনতে থাকুন। আপনি ভাবতে থাকুন ঘুম আসছে, চোখের পাতাগুলো একটু একটু করে ভারী হয়ে আসছে।"

বার পাঁচেক এই কথাগুলো টেনে টেনে বলতে থাকি। তারপর বলতে থাকি, "আমি আপনার ডান কাঁধ থেকে বাহু হয়ে হাতের আঙুল পর্যন্ত ধীরে ধীরে আমার হাত বুলাতে থাকবো। এবং যা বলবো, তা একমনে শুনতে থাকবেন।"

কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত বুলাতে বুলাতে ধীরে ধীরে বলতে থাকি, "আপনার ডান হাতটা অবশ হয়ে যাচ্ছে, ভারী হয়ে যাচ্ছে।"

এই কথাটা ধীরে ধীরে কম ভলিউমে একটু সুরেলা করে বলতে থাকি। বার পাঁচেক কথাটা বলার পাশাপাশি কাঁধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত আমার হাতের আঙুল বুলোতে থাকি। তারপর হাতে চিম্‌টি কাটি। জিজ্ঞেস করি, "এই যে চিমটি কাটছি, কোনো ব্যথা অনুভব করছেন?"

সম্মোহিত যখন বলেন, ব্যথা অনুভব করছেন না, তখন একটা ইঞ্জেকশনের ডিসপোজাল সিরিঞ্জের নিড্‌লের পুরোটাই হাতে ঢুকিয়ে দিই। ঢোকাবার সময় শুধু এটুকু খেয়াল রাখি, সিরিঞ্জের নিড্‌ল যাতে ধমনিতে না ঢোকে। নিড্‌ল ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করি, "এবার যে চিম্‌টি কাটলাম, ব্যথা পেয়েছেন?"

সব সময় একই উত্তর পেয়ে আসছি, "না।"

এবার বলি, "চোখ খুলুন। দেখুন, আপনার হাতে একটা সিরিঞ্জের নিড্‌লের পুরোটাই ঢুকিয়ে দিয়েছি কিন্তু আপনি কোনো ব্যথা অনুভব করছেন না।"

এবার চোখ খোলেন। হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখতে থাকেন।

অবাক হওয়ার ঘোর কাটার আগেই বলতে শুরু করি, "আপনি নিড্‌লটা নিজেই তুলে ফেলুন। তারপর আবার নিজের হাতেই পুরোটা ফুটিয়ে দিন। একটুও ব্যথা লাগবে না।"

সম্মোহন ঘুম থেকে ওঠা মানুষটি ছুঁচ তোলেন, আবার পুরোটা ঢুকিয়ে দেন। ব্যথা অনুভব করেন না।

এইভাবে সাজেশন দিয়ে শরীরের যে কোনো অঙ্গকে যেমন অসাড় করা যায়, তেমনই উল্টোটাও অনেক সময় করি। যাকে সম্মোহিত করব, তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে বলতে থাকি, "রিল্যাক্স মুডে আপনি বসে থাকুন। চোখ বুজুন। একমনে ভাবতে থাকুন আপনার চোখ ভারী হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনার হাতে একটা পিন ফোটাবো। ব্যথা লাগল কি লাগল না, জানাবেন।"

বার পাঁচেক এই কথাগুলোই বলে যাই। তারপর একটা রেলের টিকিট বা বাসের টিকিট নিয়ে হাতে ছোঁয়াই।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সম্মোহিত চেঁচিয়ে ওঠেন পিন ফোটানোর ব্যথায়।

একইভাবে সাজেশন দিয়ে মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয়কেই চালনা করা যায়। একই সিগারেট টেনে কেউ আমার সাজেশনমতো মিষ্টি অনুভব করেন, তো কেউ ঝাল, আবার কেউ বা টক।

এভাবে আমাদের প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়কেই সাজেশন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অধ্যায় : দুই

রোগীকে সাজেশন দেওয়ার পদ্ধতি

৩য় পর্বের অধ্যায় চার–এ সম্মোহন করার পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

যেভাবে সম্মোহন করা হয়, সেভাবেই সম্মোহন করতে হবে, একই পদ্ধতিতে। সম্মোহন করা আর সহজ হয় যদি শরীরের যে যে অঙ্গ শিথিল বলে সাজেশন দেওয়া হচ্ছে সেই সময় সেই সেই সঙ্গে সম্মোহনকারী হালকা করে আঙুল বুলিয়ে দেন।

এই প্রক্রিয়া চলবে কম–বেশি ৩০ মিনিট ধরে।

রোগীকে সম্মোহিত করে তাঁর অবচেতন মনে যে সাজেশন দেওয়া হবে সেই সাজেশন বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা অত্যন্ত জরুরি। পরিকল্পনাহীন উল্টো–পাল্টা সাজেশনে রোগ আরোগ্যের পরিবর্তে নতুন ধরনের রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে।

সাজেশন দেওয়ার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় পৌঁছানোর আগে প্রয়োজন রোগীর রোগ সমস্যা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা, তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব, রোগ উৎপত্তির কারণ আবিষ্কার। অনেক সময় অনেক মানসিক রোগের ক্ষেত্রে রোগীর সঙ্গে দীর্ঘ খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়েই রোগীর ভ্রান্তধারণা থেকে গড়ে ওঠা রোগ সারিয়ে তোলা সম্ভব। সেখানে খুব বেশি হলে সম্মোহনের সামান্যতম প্রয়োগই রোগমুক্তির পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে।

সম্মোহন চিকিৎসায় ভালো ফল পেতে রোগীকে সবচেয়ে আগে ভালোমতো রিল্যাক্স করাতে হবে। সম্মোহনের সাহায্যে রিল্যাক্স করানোর মতো ভালো আর কোনো পদ্ধতি এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। রিল্যাকসেশানই সম্মোহন চিকিৎসার প্রথম ধাপ।

সম্মোহিত ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়ার পর সাজেশনের সাহায্যে নির্দেশ পাঠান। একসময় সপ্তাহে অন্তত দুদিন রোগীকে সাজেশন নিতে চিকিৎসকের কাছে আসতে হত। রেকর্ড যন্ত্র

আবিষ্কার হওয়ার পর, বিশেষ করে ছোট রেকর্ড যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পরে চিকিৎসক তাঁর সুরেলা গলার সাজেশনগুলো ক্যাসেট বন্দি করে দেন। রোগী একটা ফাঁকা ঘরে হালকা আলো জ্বেলে যেন শুনতে থাকেন, পারলে প্রতিদিনই। রোগী হালকা পোশাক পরে শুনবেন। নিজে থেকেই একসময় আধা ঘুমের অবস্থায় চলে যাবেন। আবার নিজে থেকেই ঘুম ভাঙবে।

এবার প্রসঙ্গ সাজেশনে কোন রোগে কী নির্দেশ দেওয়া হবে? এবার সেসব নিয়ে আলোচনায় ঢুকবো।

অধ্যায় :তিন

রকমারি রোগ, রকমারি সাজেশন

বহু রোগের কারণ উদ্বেগ

বর্তমান জটিল সমাজব্যবস্থায়, অনিশ্চিয়তার সমাজব্যবস্থায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বা 'অ্যাংজাইটি'র শিকার বহু মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগের মধ্যে থাকলে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন—

১) বুক ধড়ফড় করে। হৃদস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়। একটুতেই হাঁপিয়ে পড়েন।

২) শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হতে থাকে। অল্পতে ক্লান্তি আসে। গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঘাম হয়।

৩) ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। বারবার ঘুম ভাঙে অথবা অনিদ্রার শিকার হয়।

৪) রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়।

৫) সবসময় একটা অস্থিরতা দেখা দেয়।

৬) হজমে গোলমাল দেখা দেয়। সে গোলমাল যেমন বারবার পায়খানায় যাওয়া হতে পারে। তেমনই হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য।

৭) মাথা ধরে। মনে হয় স্মৃতি ঠিকমতো কাজ করছে না।

৮) মাথায় যন্ত্রণা হয়।

এক্ষেত্রে সম্মোহিত করার আগে রোগীকে নিশ্চিত করা হয়, সম্মোহিত করার পর শরীর মন পরিপূর্ণভাবে বিশ্রাম পাবে। আপনার উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা কেটে যাবে 'রিল্যাকস্' করানোর পর। এই রিল্যাকসেশন বা শরীর ও মনের বিশ্রাম আপনার বুক ধড়ফড় ও ঘুমে ব্যাঘাতের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলবে। উদ্বেগ থেকে যেসব রোগ হয়েছে রোগীর, তা দূর করতে রিল্যাকসেশন দেওয়া খুবই কার্যকর।

এই রিল্যাকসেশনের পর রোগীর স্নায়ুকোষে নির্দেশ পাঠাতে পারেন, "আপনার ভালো লাগছে। এইভাবে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। এই মুহূর্তে আপনার শরীর ও মন

পরিপূর্ণভাবে বিশ্রাম নিচ্ছে। মন এই মুহূর্তে চিন্তা-শূন্য, উদ্বেগ-শূন্য, ভালো লাগছে। এইভাবে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। আনন্দ। গোটা মন জুড়ে এই মুহূর্তে আনন্দের ছোঁয়া। আপনি ভালো আছেন, ভালো থাকবেন।"

ড্রাগ বা নেশায় আসক্তি বা 'অ্যাডিক্‌শন'

ড্রাগ বা নেশায় আসক্তি বা 'অ্যাডিক্‌শন' বলতে বোঝায় কোন ওষুধ বা নেশা করার জিনিস বারবার গ্রহণ করার ফলে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছানো, যখন ওই ওষুধ বা নেশার দ্রব্য ছাড়া ব্যক্তিটির জীবন অচল ও কষ্টময় হয়ে ওঠে।

একবার আসক্তি বা অ্যাডিক্‌শন তৈরি হয়ে গেলে সময়মতো ওষুধ বা নেশার জিনিসটি না পেলে নানা ধরনের শারীরিক উপসর্গ হতে থাকে। যেমন— খিঁচুনি, কাঁপুনি, অনিদ্রা, মাথায় যন্ত্রণা ইত্যাদি।

এইক্ষেত্রে রোগীকে সম্মোহিত অবস্থায় নিয়ে গিয়ে যে ধরনের সাজেশন দেওয়া প্রয়োজন, তা হল :

ড্রাগ বা নেশার জিনিসটির নাম উল্লেখ করে (উদাহরণ হিসেবে ধরলাম মদ) বলতে লাগলাম, "মদের প্রতি আপনি বেশিমাত্রায় আসক্ত হওয়ায় আপনার শরীর দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। অনিদ্রার শিকার হয়ে পড়ছেন। সমাজে আপনার সম্মান ছিল। কিন্তু নেশা সে সম্মান অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে। নেশার জন্য আপনি যেটুকু পেয়েছেন ভাবছেন, হারিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি।"

"আপনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথাগুলো শুনতে থাকুন। আপনার সামনে একটা টেবিল। টেবিলে আপনার প্রিয় নেশার বস্তু ম্যাকডাওয়েলস রাম। টেবিলে কাচের গ্লাস রয়েছে। রয়েছে 'ক্লাব' সোডা, কাজু। আপনি বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে মোচড় দিয়ে ছিপিটা খুললেন (এইক্ষেত্রে বাস্তবিকই কোনো শিশির ছিপির সিল খুললে আরো ভালো হয়)। গ্লাসে রাম ঢাললেন (গ্লাসে বোতল থেকে কোনো পানীয় ঢালুন। এই আওয়াজ সাজেশনকে আরো কার্যকর করতে বিশেষ ভূমিকা নেবে)। এবার গ্লাসটাকে নিয়ে এলেন ঠোঁটের কাছে। একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ। উ-ফ্-। গা গুলিয়ে উঠল। গা গুলোচ্ছে। গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে (গ্লাস নামিয়ে তার শব্দ তুলুন)। বমি আসছে।"

মিনিট খানেকের বিরতি দিয়ে আবার সাজেশন দেওয়া শুরু করুন—"আবার মদের গ্লাসটা ডান হাতে তুলে নিয়েছেন আপনি। ঠোঁটের কাছে আসতেই...ওঃ টিকতে পারা যাচ্ছে না। পচা দুর্গন্ধ। মদের গ্লাসটা নাকের কাছে এনে গন্ধটা শুঁকলেন। গা গুলিয়ে উঠল। বমি আসছে। তাড়াতাড়ি গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন (গ্লাস টেবিলে নামিয়ে শব্দ তুলুন)। বমি আসছে; গা গুলোচ্ছে; পেট গুলোচ্ছে।"

এরপর সম্মোহন থেকে রোগীকে তোলার পালা। এমন ব্যবস্থা রাখুন যাতে সম্মোহিত অবস্থা থেকে উঠে চোখ খুলে টেবিলের দিকে তাকালে দেখতে পান ম্যাকডাওয়েলস রামের বোতল আর গ্লাস ভর্তি রাম। রোগীকে এবার আপনি রাম পান করতে বলুন। দেখতে পাবেন রোগী গ্লাস তুলে ঠোঁটের কাছে এনে দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখবেন গ্লাস।

এই সাজেশনের ক্যাসেট করে দিয়ে রোগীকে প্রতিদিন নেশা করার সময়টার একটু আগে ক্যাসেটটা শুনতে বলুন। শুনবেন অবশ্যই একলা এবং সম্মোহিত হওয়ার মতো পরিবেশে। দারুণ কাজ হবে।

ভয় বা 'ফোবিয়া'

চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রায় তিনশ রকমের 'ভয়' বা 'ফোবিয়া'র উল্লেখ রয়েছে। কত মানুষ যে কত কিছুতে ভয় পায়, পুরো তালিকা হাজির করতে গেলে একটা গোটা বই হয়ে যাবে।

কেউ আরশোলায় ভয় পায়। কেউ টিকটিকিতে। কেউ বা কুকুর দেখলে সিঁটিয়ে যান। কারো বা ভয় বিড়ালে। কেউ উঁচু বাড়ির ছাতে উঠলে ভয় পায়। ভাবে—এক্ষুনি বোধহয় পড়ে যাবে বা লাফিয়ে পড়বে ছাদ থেকে। কারো রক্ত দেখলে ভয় হয়। এমনকি ভয়ে মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা হয়। কারো ভয় খোলা জায়গায়, কারো বা অন্ধকারে। কেউ ভিড় দেখলে ভয় পায়। কেউ ধারালো কিছু দেখলে আঁতকে ওঠে।

ভয় কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাবার পক্ষে সম্মোহন দারুণ কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু ফোবিয়াগ্রস্ত রোগীকে কী সাজেশন দিতে হয়?

সেই প্রসঙ্গে আসার আগে শুধু বলে দিতে চাই, রোগীকে প্রথমে সম্মোহিত করে 'রিল্যাকসেশন'-এর সাজেশন দিন।

এবার রোগীকে ভয় কাটানোর সাজেশন দেওয়া যেতে পারে অনেকটা এই গাইড-লাইন মেনে—

এখানে আমরা একটি ফোবিয়ার উদাহরণ টানছি। ধরে নিচ্ছি রোগী কুকুরে ভয় পান। সেক্ষেত্রে সম্মোহিত করার পর সাজেশন হবে এই ধরনের :

কুকুর দেখে ভয়

"আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আপনার চেয়ে অনেক কম বয়েসি একটি ছেলে (মেয়েদের সাজেশন দেওয়ার সময় ছেলের বদলে মেয়ে বলুন)। বলতে পারেন নেহাতই বালক। ও শিস দিল (শিস দিন)। আবার শিস্ দিল। একটা কুকুর দৌড়ে এলো। ছেলেটি কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরল। কুকুরটার সঙ্গে খেলতে লাগল। কুকুরটা মহাআনন্দে খেলছে। ওদের খেলা দেখতে আপনার একটু একটু করে ভালো লাগছে। আপনার ভয় লাগছে না। কুকুরটাকে দেখে ভয় লাগছে না।"

এক্ষেত্রে রোগী ভয় পায় এমন একটা পরিস্থিতিতে হাজির করা হচ্ছে রোগীর চেয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল অর্থাৎ বালক বা বৃদ্ধ কাউকে। সে ওই পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছে না। বরং পরিস্থিতিকে উপভোগ করছে। বারবার এই ধরনের সাজেশন দিয়ে রোগীর ভয়কে দূর করা সম্ভব।

অবস্থা বুঝে তারপর একদিন রোগীকে সম্মোহিত করে তাঁর ভয়ের পরিস্থিতিতে হাজির করুন এবং পরিস্থিতিকে উপভোগ করার সাজেশন দিন বা ভয়হীন করার সাজেশন দিন।

রক্ত দেখে ভয়

রক্ত দেখে ভয় বা 'হেমাটোফোবিয়া'র ক্ষেত্রে অবশ্য সাজেশনের মূলগত কিছু রকমফের হবে। কারণ রক্তপাত উপভোগ করার সাজেশন দিলে মানসিকভাবে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এইক্ষেত্রে সাজেশন এই ধরনের হতে পারে :

"রক্ত মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে খুবই জরুরি। আবারও সত্যি যে একটি সুস্থ মানুষ যদি মাসে-দুমাসে রক্ত দান করে আসে, তবে তার কোনোভাবেই অসুবিধে হওয়ার কারণ নেই। রক্ত তরল। আলতার মতো। লাল রঙের জলের মতো।"

"জল বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। কিন্তু আপনি জল দেখলে ভয় পান না। থামস্‌আপ বা পেপসি দেখলে ভয়ের কথা মনেই আসে না। বরং পান করে এক ধরনের তৃপ্তি পান।"

"আপনি লালেও নিশ্চয়ই ভয় পান না। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, কপালে লাল সিঁদুর বা গরদের লাল পাড় শাড়ি আপনার মনে কোনো ভয় সৃষ্টি তো করেই না, বরং ভালো লাগে। আপনার নিশ্চয়ই ভোরের আর গোধূলি বেলার লাল সূর্য দেখতে ভালো লাগে। ভালো লাগে লাল কৃষ্ণচূড়া, লাল টুকটুকে শিমূল। সুতরাং আপনার লালেও ভয় নেই।"

"আপনি ভাবতে থাকুন—ফুটবল খেলার একটি দৃশ্য। খেলা চলছে। একটি ছেলে বল নিয়ে এগুচ্ছে, অন্য দলের একজন তাকে ফাউল করল, বিশ্রী রকমের ফাউল। বুটের আঘাতে হাঁটু কেটে গেছে। যার কেটেছে তার কোনো ভয় বা কিছুই নেই। রক্ত পড়ছে দেখল। নির্বিকারভাবে খানিকটা দূর্বা ঘাস ক্ষতে লাগিয়ে আবার খেলায় মেতে গেল..." এইভাবে সাজেশন দিয়ে ভয় কাটানো সম্ভব।

বাসে যেতে ভয়

আমাদের পাড়ার এক চল্লিশ উর্ধ্বের প্রবীণের কথা বলছি। চাকরি করতেন কলকাতার কয়লাঘাটা রেল অফিসে। এক ছেলে, এক মেয়ে ও বউ। চারজনের সংসার। চারজনই শান্তশিষ্ট মানুষ।

কিছু মাস ধরে ভদ্রলোক অফিসে যাচ্ছেন না। বাড়ি থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে আসছেন। এটাই চলছিল নিত্যদিনের ঘটনা, দীর্ঘ সময় কাজে না যাওয়ার জন্যে একসময় মাইনে দেওয়া বন্ধ করল অফিস।

সমস্যা সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য চাইলেন। মূল সমস্যা—বাসে উঠলেই ভয়। দুর্ঘটনার ভয়। ভিড়ের মধ্যে শ্বাস নিতে কষ্ট। যতক্ষণ বাস চলে ততক্ষণ উদ্বেগ চলে। বাস থেকে নেমে গেলে উদ্বেগ থেকে মুক্তি মেলে।

বার চব্বিশেক রিল্যাকসেশন দেওয়ায় অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটে এবং বাসেই অফিস যাওয়া শুরু করেন।

লেখার আঙুল শক্ত হয়ে যাওয়া (Writer's Cramp)

পরীক্ষার সময় কিছু পরীক্ষার্থীর লেখার আঙুলে খিচুনি (Cramp) হয়। পরীক্ষা দিতে না চাওয়ার অবচেতন ইচ্ছে থেকে বা পরীক্ষার প্রস্তুতি ঠিকমতো না হওয়ায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে নিজের অজান্তে এই শারীরিক উপসর্গ তৈরি হয়।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অচিন্ত্য দাশগুপ্ত বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করেন। ঝক্‌ঝকে ছেলে। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন এক সুন্দরীকে। মেয়েটি অত্যন্ত নিম্নমেধার এক সুন্দরী।

অচিন্ত্যর ফোন পেলাম। জাহাজ থেকেই ফোনে জানালেন, তার স্ত্রীর কাল থেকে বিএ পার্ট ওয়ানের পরীক্ষা। একটু আগে খবর পেল, ওর তর্জনিতে ক্রাম্প হয়েছে। "তুমি ওর মোবাইলে ফোন করে সাজেশন দিয়ে ঠিক করে দাও প্লিজ," অনুরোধ করলেন।

ওর স্ত্রী উর্মিকে ফোনে ধরলাম। সমস্যার কথা ওর মুখ থেকে শুনলাম। ভরসা দিলাম, কোনো চিন্তা নেই। উর্মি রিলাক্স মুডে হালকা পোশাকে শুয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে আমার সাজেশন শুনতে লাগল।

আধঘণ্টা রিল্যাকসেশন দিলাম। তারপর সাজেশন বা নির্দেশ পাঠালাম। ডান হাতের তর্জনির ক্রাম্প সেরে যাচ্ছে। ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আঙুলের খিঁচুনি সেরে গেছে। আঙুল ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে।

পরের দিন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে আরো একবার রিল্যাকসেশন দিয়ে তারপর নির্দেশ পাঠালাম, আঙুল নরম হয়ে গেছে। ক্রাম্প সেরে গেছে।

অ্যাজমা (Asthma) বা হাঁপানি

হাঁপানি অনেক সময়ই মানসিক কারণে হয়। আমাদের মনের মধ্যে অনেকেরই এমন একটা ধারণা আছে যে—হাঁপানি বংশগত রোগ, হাঁপানি রোগীর সঙ্গে প্রায়ই চুমু-টুমু খেলে হাঁপানি হয়। এই মানসিক ধারণার কারণে হাঁপানি হতে পারে।

হাঁপানির প্রধান লক্ষণ শ্বাস-কষ্ট। সাধারণত বর্ষায় ও শীতে রাতে এই কষ্ট শুরু হয়। শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশি থাকে। বুকে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। কাশির সঙ্গে প্রচুর কফও বের হয়।

এই রোগের বিষয়ে সঠিক ধারণা এখনো চিকিৎসকদের নেই। তবে রক্তে যাদের ইমুনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin) আইজিই (IGE) বেশি থাকে তাদের হাঁপানির সম্ভাবনা বেশি।

হাঁপানির প্রধান কারণ অ্যালার্জি। ধুলো-ময়লা, ফুলের রেণু, পশুলোম।

খাবার ইত্যাদি থেকে অ্যালার্জি এবং এই অ্যালার্জি থেকে হাঁপানি হয়।

হাঁপনি কখনই ছোঁয়াছে নয়। ডায়াবেটিসের মতো বংশগত নয়। এই দুটি সত্যিকে বিশ্বাস করলে মানসিক কারণে হাঁপানি তাদের হবে না।

হাঁপানির চিকিৎসায় নানা ব্র্যান্ডের ইনহেলার বেরিয়েছে। ভালোই ফল পাওয়া যায়।

উদ্বেগ বা ভয় থেকে অ্যাজমা হয়। ভুল জানা থেকেও ভয় আসতে পারে।

আমার ছেলে তখন ফাইভ-সিক্সের ছাত্র। আমাকে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানের জন্য, বুজরুকি ধরার জন্য মাঝে-মাঝে বাইরে যেতে হত। বাড়িতে তখন স্ত্রী সীমা ও ছেলে পিনাকী থাকত। আমি রাতে বাইরে গেলে উদ্বেগ সীমার তখন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার সিম্পটম দেখা দিত। পাশের বাড়ির মল্লিকদাকে দৌড়তে হত ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার থরো চেক্ করে জানিয়ে দিলেন সীমা সাইকোসোমটিক রোগের পেশেন্ট অর্থাৎ মানসিকভাবে হাঁপানি রোগের শিকার হচ্ছেন।

আমার এক বান্ধবী হাঁপানি রোগে ভোগেন। তাঁর হাজবেন্ড হাঁপানি রোগী। সেখান থেকেই ওর হয়েছে, এটা ধরে নিয়ে ইনহেলারকে নিত্যসঙ্গী করেছেন। এক, দুই, তিন। তিনজন ডাক্তারই পরীক্ষা করে জানালেন, হাঁপানিটা তাঁর মানসিক কারণে হচ্ছে।

চিকিৎসার দুটি ভাগ। (এক) রোগীকে হাঁপানি রোগ বিষয়ে জানানো। তারপর বিশ্বাস উৎপাদন করা তাঁর হাঁপানি হয়নি। (দুই) এরই পাশাপাশি তাঁকে সেলফ রিল্যাকসেশন করতে শেখান। ভালো ফল পাওয়া যাবে।

উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)

উচ্চ রক্তচাপ বর্তমানের দ্রুততার যুগের একটি অন্যতম প্রধান অসুখ। হৃৎপিণ্ডের (Ventricle) যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়। হৃৎপিণ্ড সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে রক্ত পাম্প করে শরীরের নানা অংশে পাঠায়। যন্ত্রে সংকোচনকালীন রক্তচাপ (Systolic Blood Pressure) এবং প্রসারণকালীন রক্তচাপ (Diastolic Blood Pressure) ধরা পড়ে। সংকোচনকালীন রক্তচাপ কম এবং প্রসারণকালীন রক্তচাপ বেশি হয়।

তবে প্রধানত ধমনীতে স্নেহপদার্থ জমে ধমনী সরু ও শক্ত হয়ে গেলে সংকোচনশীল রক্তচাপ বেড়ে যায়।

যে যে কারণে রক্তচাপ বাড়ে

১) টেনশন, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ
২) ক্রোধ
৩) কিডনির অসুখ
৪) হরমনের অসুখ
৫) স্টেরয়েড ব্যবহার, জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি খাওয়া
৬) মহাধমনীর সংকোচন

লক্ষণ

উচ্চ রক্তচাপে ঘাড়ে ব্যথা, ঘাড় শক্ত হওয়া, মাথা ব্যথা, বুক ধড়ফড়, ক্লান্তি, নিশ্বাসের অসুবিধা, নাক দিয়ে রক্তপাত, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি হয়। উচ্চ রক্তচাপ থেকে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

চিকিৎসা

টেনশন, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ থেকে রক্তচাপ বৃদ্ধি হলে দেখতে হবে সমস্যার উৎপত্তি। আর্থিক কারণে, ঋণগ্রস্ততার কারণে দুশ্চিন্তা হলে তা চিকিৎসকের হাতের বাইরে। নতুবা রিল্যাকসেশন ও সেলফ রিল্যাকসেশন থেকে অবশ্যই উচ্চ রক্তচাপ কমান যায়।

তোতলামি

কথা বলার সময় মাঝে মাঝেই কোনো একটি শব্দে এসে শব্দের প্রথম অক্ষরই বেশ কয়েকবার বলতে থাকে তোতলারা।

তোতলামো শতকরা ৯৯ ভাগ নিউরো সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। মোদ্দা কথায় মানসিক রোগ। অল্প বয়সে কারো সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলে, অস্বস্তি পেলে তোতলামো দেখা যায়।

তোতলামো সারাতে রোগীকে রিল্যাকসেশন দিন এবং শেখান। কবিতা আবৃত্তি করান, গান করান, ধীরে ধীরে কথা বলতে অভ্যাস করান। দেখবেন কয়েক মাসের মধ্যেই তোতলামো সেরে গেছে।

তোতলাদের তোতলামোর জন্যে বকাবকি করবেন না। এতে আত্মবিশ্বাস আরো কমে যায় কথা বলার ব্যাপারে।

পরিবারের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক না থাকলে শিশুর তোতলামি দেখা যেতে পারে। তোতলাকে ভেঙাতে ভেঙাতে তোতলামি দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে মা-বাবাকে সচেতন থাকতে হবে।

অধ্যায় : চার

প্রাচীন আমল থেকেই মানসিক রোগ মানেই অশুভ শক্তির কালো হাত

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীরবিদ্যার আলোচনা করা হয়েছে আংশিকভাবে অথর্ববেদে ও পরিপূর্ণভাবে আয়ুর্বেদে। আয়ুর্বেদের আলোচনা আটভাগে বিভক্ত। তারই একটার নাম 'ভূতবিদ্যা'। যা আসলে মানসিক রোগ নিয়ে আলোচনা। **অথর্ববেদ ও আয়ুর্বেদে অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও ভেষজের পাশাপাশি মন্ত্র-তন্ত্র ও তাবিজের ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাই।**

এই সময়ে ও তার পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে সে সময়কার জ্ঞান–বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলোতেও মনোবিকারকে অশুভ শক্তির প্রভাব বলে মনে করা হত। গ্রিক, মিশর, চীন ও ভারতের মতো উন্নত দেশগুলোর জনগণ ধরে নিয়েছিল, 'মনোবিকার' আসলে ভূত, জিন, ডেভিল ইত্যাদির ভরগ্রস্ত অবস্থা। মানসিক রোগীকে আনা হত পুরোহিতের কাছে।

পুরোহিত জানিয়ে দিত রোগিণীর উপর অশুভ–আত্মা ভর করেছে। ওই আত্মাকে তাড়াতে রোগিণীর উপর নানারকম শারীরিক অত্যাচার চালান হত। চাবুক মারা, গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া, গু খাওয়ানো, অঙ্গচ্ছেদ, মাথার খুলিতে ফুটো করে ভর করা অশুভ আত্মার বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেওয়া—সবই চলত। তাতেও ভালো না হলে অশুভ আত্মাকে শেষ করার নামে রোগিণীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত।

গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রাটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৭) প্রথম বললেন, মানসিক রোগ আর পাঁচটা রোগের মতোই একটা রোগ। এর সঙ্গে ভূত বা অশুভ শক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। মস্তিষ্কই আমাদের চিন্তা করায়। বুদ্ধির উন্নতি ঘটায়। মস্তিষ্কের বিকারের ফলেই মানসিক রোগ হয়।

তিনি অবশ্য মনে করতেন যে কোনো রোগের কারণ রক্ত, পিত্ত, কফ। ভারতীয় চরক সংহিতাতেও বলা হয়েছে আমাদের রোগের কারণ বায়ু–পিত্ত–কফ এই তিনটি সমস্যা।

২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ থেকে ইউরোপে ডাকিনীতত্ত্ব বা আইনিতত্ত্বের রমরমা শুরু হয় এবং দ্রুত ব্যাপকতা পায়।

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে রেজিনাল্ড স্কট একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'The Discovery of Witchcraft'। বইয়ের মূল বক্তব্য ছিল—মানসিক রোগীদের সমাজ 'ডাইনি' বলে ঘোষণা করে মিথ্যেই অত্যাচার করছে।

স্কটের বক্তব্য প্রায় সর্বত্রই ধিকৃত হয়েছিল।

১৪৮৬ সালে পোপের নির্দেশমতো একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'The Witche's Hammer'। গ্রন্থটিতে মানসিক রোগীদের 'ডাইনি' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ডাইনিরা ব্ল্যাক-ম্যাজিকের সাহায্যে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের অসুখ সৃষ্টি করে, রক্ত শুষে নেয়, স্তনের দুগ্ধ টেনে নেয়, পুরুষকে ধ্বজভঙ্গ করে দেয় ইত্যাদি। ডাইনিদের 'ব্ল্যাক-ম্যাজিক' থেকে বাঁচার একটাই পথ—ডাইনিদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। এই গ্রন্থটির ফল হিসেবেই রেজিনাল্ড স্কট ধিক্কৃত হয়েছিলেন। আজ তিনি প্রণম্য।

তারপর দেড়শ বছর ধরে মানসিক রোগীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচারের পর তাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যাকে পোড়ান হয়েছে, তার নিকট আত্মীয়রাও কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করে ডাইনি হত্যায় অংশ নিয়েছে।

ইউরোপে ডাইনি পোড়ান এখন হয় না। কিন্তু ভারতে 'ডাইনি' বলে চিহ্নিত করে অত্যাচার এবং হত্যা বন্ধ হয়নি। 'ডাইনি' সমস্যাটা আদিবাসী সমাজে শিকড় গেড়ে আজো রয়েছে। আদিবাসী আবেগকে আঘাত করে ভোট হারাতে চায় না সরকার থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দল। এটা অবশ্যই দুর্নীতি। জানিনা সর্বগ্রাসী দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ভারতে কবে সুনীতি আসবে। কবে ডাইনি হত্যা বন্ধ হবে?

আশা রাখি সুনীতি আসবেই। আনবে আগস্ট বিপ্লবে সামিল ভারতের লক্ষ-কোটি মানুষের 'বিবেক' আন্নার আহ্বানে।

ভোরের আলো ফোটার আগে গাঢ় অন্ধকার দেশ জুড়ে।

কখন আপনার দরকার একজন মনোবিদ বা মনোরোগ চিকিৎসককে?

- √ পরিচ্ছন্ন ভাবনা-চিন্তা এবং রোজকার কাজকর্মে অসুবিধা
- √ পৌনঃপুনিক এবং অবাস্তব চিন্তাভাবনা
- √ অভ্যাস, মতিগতি এবং মনঃসংযোগে হঠাৎ পরিবর্তন
- √ যেখানে যা নেই তা দেখা ও শোনা
- √ বারংবার আত্মহত্যার চিন্তা এবং আত্মহত্যা করার মতো আচরণ
- √ রাগ, ভয়, আতঙ্ক, অপরাধবোধ বা শোক অথবা আনন্দের একটানা অনুভূতি
- √ অনুমোদিত ড্রাগ, সুরা বা তামাকের অতিরিক্ত ব্যবহার
- √ কোনো ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন
- √ সামাজিক মেলায় পরিবর্তন ও পেশাগত কাজকর্মে সমস্যা

যে কোনো সরকারি হাসপাতালে মনস্তাত্ত্বিক বিভাগে যোগাযোগ করুন।